ছন্দহারা

চার্বাক

দি গ্রেট্ ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১বি, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রকাশক—সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ
দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৩

মুদ্রাকর—
শ্রীহরিপদ ঘোষ
রামার প্রেস
১৯৯।এ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

মূল্য—সাড়ে তিন টাকা

আমাকে ভালবাসিয়া যাহারা দুঃখ পাইয়াছে যাহাদের ভালবাসা পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি—তাহাদের মধুর স্মৃতি উদ্দেশে—

১

চতুর্থ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিয়া সবে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছি, পিতৃদেবের এক চপেটাঘাতে এই কঠিন ধরিত্রী বক্ষে নব জন্ম লাভ করিলাম। ব্যাপারটা তুচ্ছ, আমি খাবার জলের গেলাসটি বাবার ভাতের থালায় উল্টাইয়া দিয়াছিলাম, পিতাপুত্রে একই সঙ্গে আহার করিতে-ছিলাম, জল খাইয়া গেলাস নামাইবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আমি কাঁদিয়া উঠিলাম আমার কান্না ও পিতৃদেবের ভৎসনার সহিত চপেটা-ঘাতের শব্দ শুনিয়া মাতৃদেবী ছুটিয়া আসিলেন এবং হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মাতৃদেবী এক চপেটাঘাত লাগাইয়া বলিলেন "হতভাগা ছেলে বলি ওঁর সঙ্গে খেতে বসবি না—তা আমার কথা শোনা হয় না, এখন বেশ হয়েছে।" এই বলিয়া পিতৃদেবকে অপর এক থালায় পুনরায় ভাত আনিয়া দিলেন। মাতৃদেবীর চপেটাঘাতে পৃথিবী যে এত সুন্দর তাহা আমি ঐ শৈশবেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ঐ চপেটাঘাত আমার পৃষ্ঠদেশে বেদনাদায়ক হইলেও, মনে কোন বেদনাই দেয় নাই কারণ

আমি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম পিতার ক্রোধ হইতে রক্ষা-মূলক ব্যবস্থা রূপেই আমার ঐ শাস্তি লাভ। আজ পর্যন্ত জীবনে কত চপেটাঘাতই না খাইয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই, কিন্তু সেদিনের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। পিতা বা মাতা কেহই ইহ জগতে নাই। কিন্তু উত্তরাধিকারী সূত্রে এই ধরিত্রী যে কত কঠোর এবং কত কোমল সেই দিনই জনক জননীর নিকট হইতে, শিক্ষা-লাভ করিয়াছি। এবং এই শিক্ষাই জীবনের প্রধান মূলধন হইয়া আছে। তাই কঠিন আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ি না অল্প আঘাতকেও উপেক্ষা করিনা।

আমি একদিনেই সমগ্র বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ব করিতে সমর্থ হই। গ্রামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, এইরূপ ছেলে বহু ভাগ্যে জন্মলাভ করে, যে গর্ভে জন্ম সে গর্ভ সার্থক। এইরূপ প্রশংসাবাক্য সন্তানের উপর প্রযুক্ত হইলে কোন মাতৃহৃদয় না আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। সেদিন মা নূতন ধুতি ও চাদর দিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আসিলেন। বাংলা দেশের পাঠশালা যেরূপ দেখা যায় এই পাঠশালাটি তাহা অপেক্ষা একটু অন্য ধরণের। পণ্ডিত মহাশয়ের পদদ্বয় খঞ্জ থাকায় তাঁহাকে সকল সময়েই পাঠশালায় থাকিতে হইত। পাঠশালাটি পণ্ডিত মহাশয়ের নিজস্ব গৃহ। ইহার মধ্যে একটি কক্ষে পাঠশালা বসিত এবং তৎসংলগ্ন কক্ষে পণ্ডিত মহাশয় নিজে থাকিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের কক্ষে যাইয়া ছাত্রদের পড়া দিতে হইত। পাঠশালার ছুটি হইলে ঐ কক্ষে গ্রামের যুবকদের আড্ডা বসিত বা ঐ কক্ষটি তাহাদের club বলা যাইতে পারে এবং সময়ে সময়ে ঐ কক্ষে বয়ঃবৃদ্ধেরাও আসিতেন। তখন ঐ ঘরটী গ্রামের পার্লামেণ্ট রূপে ব্যবহৃত হইত। যত কিছু সামাজিক নিয়ম কানুন বা গ্রাম্য বিবাদ বিসংবাদ ঐ স্থানেই তৈরী বা মীমাংসা হইত।

একটি টবের বাক্সে চাকা লাগাইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের জন্য যানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অবশ্য গ্রামের যাত্রা প্রভৃতি উৎসবের দিনেই

ইহার প্রয়োজন হইত। পাঠশালার ছাত্রেরা পণ্ডিত মহাশয়কে ঐ টবে বসাইয়া টানিয়া উৎসবক্ষেত্রে লইয়া যাইত। একবার একদল ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়কে রাত্রে মধ্য পথে ফেলিয়া পলায়ন করে, ফলে পণ্ডিত মহাশয়কে পথেই রাত্রি যাপন করিতে হয়। সেই হইতে এই ছাত্রবাহিত যানে পণ্ডিত মহাশয়ের আস্থা কমিয়া যায়। অবশ্য ঐ দলের যাহারা নেতা ছিল তাহাদের পঠদ্দশার ঐ দিনই পরিসমাপ্তি ঘটে। পণ্ডিত মহাশয়ের জন্য প্রত্যেক উচ্চবর্ণের ছাত্রদের বাড়ি হইতে পালাক্রমে আহার্য আসিত এবং নিম্ন বর্ণের ছাত্রদের নিকট অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করা হইত। বেতন দুই চার আনার বেশী লাগিত না এবং তাহার তাগাদাও ছিল না, কারণ পণ্ডিত মহাশয়ের আর কোন পোষ্য ছিল না সেইজন্য প্রয়োজন ছিল কম। পণ্ডিত মহাশয় বহু বিভিন্ন গুণের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ছাত্রের সে সব গুণ দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। তিনি উৎকৃষ্ট ঘড়ি মেরামত করিতে পারিতেন কিন্তু তখনকার দিনে দশ মাইলের মধ্যে কাহারও ঘড়ি না থাকায় এই শিল্প কেন্দ্রটী অচল হইয়া পড়িয়াছিল। শুনিয়াছি তিনি অত্যন্ত উঁচুদরের গায়ক এবং বাদক ছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত এবং হস্তদ্বয় প্রায় অচল ছিল। অতএব তাঁহার এই শিল্প জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিত মহাশয় সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম এই জন্য যে একজন গুণী শিল্পী যাঁহাকে প্রথম জীবনে আমাদের শিক্ষা গুরু রূপে পাইয়াছিলাম তাঁহার যেমন সকল গুণ ব্যর্থ হইয়াছিল—অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে এই মহান গুরুর শিষ্যের জীবনেও অভাবনীয়রূপে এইরূপ পরিণতি ঘটে। তাই ক্ষুদ্র অংশের অবতারণা।

একটী অখণ্ড জীবনের ইতিহাস রচনা করা যায় না। একটি জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলি একত্র জোড়া লাগাইয়া যে জীবন রচনা করা যায় তাহাতে দেখা যায় যাহার জীবন রচনা করিলাম তাহাতে এবং

সেই ব্যক্তিতে অনেক তফাৎ। খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলী লইয়াই ত জীবন, অথচ তাহার একত্র সমাবেশ কি অদ্ভুত ভাবেই না পৃথক, এমন কি, বিভিন্নরূপেই না প্রতীয়মান হয়! আমার ধারণা লেখনীর সাহায্যে পৃথিবীর সব কিছুকেই রূপ দেওয়া যায়, যায়না কেবল মানব চরিত্রের। আজ পর্যন্ত যত মানব চরিত্র লিখিত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যাহার চরিত্র রচিত হইয়াছে সে ব্যক্তি এই লিখিত রচনার নায়ক নহে। এমন কি সম্পূর্ণ অন্য লোক হইতেও পারে। যে সব ঘটনাবলীর সমাবেশে আজ আমি আমার জীবন কাহিনী অঙ্কিত করিব তাহার নায়ক হয়ত আমি নাও হইতে পারি তাই বলিয়া এই ঘটনাও মিথ্যা নহে এবং এই জীবনীও মিথ্যা নহে।

এই খঞ্জ পণ্ডিতকে যে, দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গ্রামের লোক দেখিয়াছিল আমি তাঁহাকে সে দৃষ্টিকোন দিয়া দেখি নাই। আমি দেখিয়াছিলাম বিরাট একটা সম্ভাবনা কেমন জড়বৎ অচল হইয়া আছে। কত আশা কত সম্ভাবনার পিছু ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে সার্থকতার দুয়ারে আসিয়া হুঁচোট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়াছিলাম ছাত্র হিসাবে এই পণ্ডিত মহাশয় খুবই ভাল ছিলেন এমন কি বরাবর বৃত্তি লইয়া পাশ করিয়াছেন। গায়ক হিসাবে এই ব্যক্তি বহু সভাক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বহু পদক লাভ করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য সম্পদ হিসাবে গ্রামের কোন যুবকই ইহার সমকক্ষ ছিল না, যৌবনে এত সুন্দর তাহার দেহ শ্রী ছিল যে সাক্ষাৎ মদনও নাকি লজ্জা পাইত। কি বিরাট সম্ভাবনা, কি ভয়াবহ পরিণতি!

এই পাঠশালায় বছর তিন পড়িবার পর একদিন পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুমাকে ডাকিয়া বলিলেন "এ ছেলেকে এখানে রেখে নষ্ট করো না খুড়ি. ও যেরূপ বুদ্ধিমান ওকে কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করে দাও এখানে থাকলে নষ্ট হ'য়ে যাবে।" ঠাকুমা উত্তর করিলেন "তোমার চেয়ে আর

ভাল মাষ্টার কোথায় পাব ?" কিন্তু ঠাকুরমার এই যুক্তি পণ্ডিত মহাশয় গ্রহণ করিলেন না আমাকে জোর করিয়া পাঠশালা হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয়ের চক্ষে জল। আমাকে আশীর্বাদ করিলেন—বলিলেন "জোর ক'রে ছাড়িয়ে দিলুম কেন জানিস্? একটা ছেলেও এ পাঠশালায় মানুষ হল না, তোর মত বুদ্ধিমান ছেলে যদি অন্য কোন ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় আমি জোর করে বলতে পারি তুই হাকিম হুকুম হ'তে পারবি। অন্ততঃ লোকে বলবে এই পণ্ডিতের কাছে হাতে খড়ি হয়েছে। কোন ছেলেই ত আমার নাম রাখতে পারল না এখন দ্যাখ তুই যদি পারিস!" অত কথা বুঝিবার বয়স আমার হয় নাই। তবে আমার চোখেও জল আসিয়াছিল আমার মধ্যে এক সুপ্ত বৃহৎ সম্ভাবনা দেখিয়াই বুঝিবা আমাকে আর ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন না।

মা ও ঠাকুমা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন আমাকে আমার মামা বাড়ীতেই রাখিয়া আসা উচিত, কারণ সহরে ভাল ভাল স্কুল আছে। বাবা কর্মস্থলে থাকিতেন তাঁহাকে পত্র দেওয়া হইলে তিনিও সম্মত হইলেন। আমি, মা ও আমার ছোট বোন মামার বাড়ী রওনা হইলাম। মায়ের এক দূর সম্পর্কিয় কাকা আসিয়া আমাদের লইয়া গেলেন। রাজসাহীতে আমার মামার বাড়ী। ঠিক পদ্মার ধারে একটি বাংলোর মত বাড়ীতে আমার মাতামহ সপরিবারে থাকেন। আমার দিদিমা পূর্বেই মারা গেছেন। বাড়ীতে আমার এক বিধবা মাসিমা ও মাত্র এক মামা। তাছাড়া বহু আত্মীয়-স্বজন ও চাকর বাকর লইয়া এই পরিবার। ইহার কয়েক মাস আগে আমার এক মাসীমা মারা যান তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাদের আসিবার অল্প কয়েকদিন আগে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে মামার বাড়ী আসিয়াছি, কিন্তু এখন স্থায়ীভাবে আসিলাম। মাতামহ ঠিকাদারী করেন এবং অবস্থাও ভাল, আমি

এখানে থাকিয়া স্কুলে পড়িব শুনিয়া তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

শৈশবে যাহাদের মাতৃবিয়োগ হইয়াছে তাহাদের দুর্ভাগ্যের জন্য সকলে সহানুভূতি দেখায়, কিন্তু মা থাকিতে যাহারা মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহাদের বিষয় কেহ কোনদিন ভাবিয়াছে বলিয়া জানিনা। শৈশবে যে মাতৃস্নেহের অধিকারী হয় নাই তাহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কে আছে। যাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে তাহারা মাতৃস্নেহরূপ অমৃতের আস্বাদ আর কেমন করিয়া পাইবে, কিন্তু যে হতভাগ্য শৈশবে মা থাকিতেও মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত তাহার দুঃখের কে হিসাব রাখিবে? মা আমাকে যেদিন রাজসাহীতে রাখিয়া চলিয়া গেলেন সেদিনের স্মৃতি আজও জাগরূক আছে। আমি তখন স্কুলে ভর্তি হইয়াছি। আগের দিনে শুনিয়াছি মা আমাকে এখানে রাখিয়া চলিয়া যাইবেন, তাই সেদিন স্কুলে যাইতে রাজী হই নাই। মায়ের বিদায় কালে পাছে আমি কাঁদাকাটা করি তাই মা বলিলেন—"বাবা তুমি যে লক্ষী ছেলে! তুমি এখন স্কুলে যাও—আমিত ঐ পথেই ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া ষ্টেশনে যাইব, তখন তোমার সহিত দেখা করিয়া যাইব।" 'লক্ষী ছেলে' কথাটী ছেলেদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক বাক্য! কতছেলেই না এই বাক্য সার্থক করিবার জন্য লক্ষীছাড়া হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি যদি সেদিন লক্ষী ছেলে না হইয়া দুষ্টু ছেলে হইতাম তবে হয়ত আমার জীবনের অধ্যায় অন্যরূপে রচিত হইত। মা আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন। সেই দিনের প্রত্যেকটি ঘোড়ার গাড়ী আমার দৃষ্টি পথকে বাষ্পাকুল করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু যে গাড়ীতে আমার মা ছিলেন সেই গাড়ীটির জন্য একটি অষ্টম বর্ষীয় বন্দী বালক কি ব্যাকুল আগ্রহে না পথ পানে চাহিয়াছিল! স্কুলের মাষ্টার মহাশয় বারংবার আমার ঘোড়ার গাড়ী দেখিবার আগ্রহ দেখিয়া ডাকিয়া লইয়া এক চপেটাঘাত দিলেন, সেই

চপেটাঘাতের বিরতিকালে একটি ক্ষুদ্র শিশুকে ফাঁকি দিয়া কোন ফাঁকে তাহার মা চলিয়া গেল, পড়িয়া রহিল কঠিন সড়কে অঙ্কিত চাকার চিহ্ন। সড়কের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

বাড়ী ফিরিলাম, এত লোক থাকিতেও সমগ্র বাড়ী যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগিতে লাগিল। আমার জন্য মা নিজ হস্তে বহুবিধ খাবার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সব খাবার আমাকে ও আমার মাসতুত ভাই পরাণদাদাকে দিলেন এবং মাসিমা বলিয়া দিলেন "মাণিক তুই যত খুশী খা।" দাদাকে হীরা এবং আমাকে মাণিক, এই নামেই আমাদিগকে ডাকা হইত। মাতৃহস্তের অমৃত এমন বিস্বাদ আর কখনও লাগে নাই। আমি যেন অসহায় বোধ করিলাম, কাঁদিলাম না, কিন্তু অবরুদ্ধ অশ্রু চক্ষুদ্বয়কে বারংবার বাষ্পাকুল করিয়া আমার দৃষ্টিকে কুয়াসাচ্ছন্ন করিয়াছিল। মাসীমা বলিলেন "ছিঃ কাঁদতে আছে তুমি যে লক্ষী ছেলে।" লক্ষীছেলের কাঁদিতে নাই এই বেদবাক্য অবধারিত জানিয়া কোনরূপে খাবারগুলি গলধঃকরণ করিয়া আমি ও পরাণদা পদ্মার তীরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। একটি বালক মাতৃহীন, অন্যজন মাতৃস্নেহ বঞ্চিত। সহজেই একের দুঃখ অপরে বুঝিতে পারিতাম। পদ্মার ধারে বেড়াইতে যাইবার কারণ ঐ পথেই ষ্টীমার যায় এবং যদি ঐ ষ্টীমারে আমার মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। একখানা, দুইখানা, তিনখানা ষ্টিমার গেল কিন্তু মাকে আর দেখিতে পাইলাম না। বাড়ীর কথা মনে পড়িল। মা ঠাকুমাকে মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেছেন, আমি আমার ছোটবোনের চুল ধরিয়া কাঁদাইতেছি মা মধ্যে মধ্যে "পোড়া ছেলের মরণ হয় না" বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন এবং হাতের কাছে পাইলে এক আধচাপড় লাগাইতে ত্রুটী করিতেছেন না অবশেষে বিরক্ত হইয়া মহাভারত ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন "বড় দুষ্টু হয়েছিস তুই, নিশ্চিত হয়ে যে একটু মাকে মহাভারত পড়ে শোনাব তার উপায় নাই"

—এই বলিয়া সজোরে পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন। ঠাকুমা বলিলেন "মার কেন বউমা ওর বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে" মা বলিলেন "চল্ পিণ্ডি গিলবি - চল্—জ্বালাতন!" এই বলিয়া একটি থালায় মুড়ি গুড় ও দুধ বাহির করিয়া দিলেন। সত্যই এই পিণ্ডির জন্য প্রাণপুরুষ অস্থির হইয়াছিল, তাই পিণ্ডদানে পুলকিত হইয়া বলিলাম "দে মেখে দে।"

এমনি কত কথাই সেদিন মনে হইয়াছিল তাহার হিসাব ছিল না। পরাণদা বলিল তুই ভাবিস না এমন ব্যাটাছেলে আছে যে তোর পূজার সময় বাড়ী যাওয়া আটকায়? এত বড় আশ্বাস বাক্য পাইলে কোন শিশুচিত্ত না খুসী হইয়া উঠে। যদিও তখন মাঘ মাস তবুও পূজাতে বাড়ী যাইবার আনন্দে সেদিনের দুঃখ ভুলিয়াছিলাম।

পরাণদা ও আমি একই ক্লাসে পড়িতাম। যে স্কুলে পড়িতাম তাহা একটি প্রাথমিক পাঠশালা। তাহার উচ্চ শ্রেণীতেই আমরা ভর্তি হইয়াছিলাম। যে ভাল স্কুলে পড়িবার জন্য এখানে আসিয়াছি, সেই সব স্কুল আমাদের বাড়ী হইতে তিন চার মাইল দূরে। আমাদের বাড়ী শহরের উপকণ্ঠে। বাড়ীর নিকটে কোন ভাল স্কুল না থাকায়—আর স্কুল ত জামা জুতা নয় যে ছেলেদের পচ্ছন্দমত স্কুলে ভর্তি করা হইবে—তাই নিকটে যে স্কুলটি ছিল তাহাতে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তবুও স্কুলটি অনেক দূরে ছিল। প্রায় এক মাইল। স্কুলে একটি মাত্র ঘর, ঘরটি বড় একটি হলঘরের মত। তাহাতেই বেঞ্চগুলি সাজাইয়া তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগে একজন করিয়া শিক্ষক বসিতেন। নীচের দুইটি শ্রেণী একত্র বসিত। এবং সব চেয়ে যিনি কম বেতন পাইতেন তাঁহার উপরেই দুইটি শ্রেণীর ভার ছিল। আমরা একশত জনের অধিক সেই স্কুলে পড়িতাম। পড়িতাম বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, গোলমাল করিতাম।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় মুসলমান ছিলেন সাম্প্রদায়িক হারে তিনি

নিযুক্ত হন নাই তাঁর যোগ্যতা বলেই তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে সিক্সথ ক্লাস পর্যন্ত পড়িতে পারিলেই শিক্ষকের যোগ্যতা লাভ করা যাইত। প্রধান শিক্ষকের এই পদলাভ করিবার পিছনে যে অধ্যবসায় এবং যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল তাহা পাঠকেরা জানিতে পারিবেন। তাঁহার নাম কি ছিল জানি না। আমরা তাঁহাকে বড় সার বলিতাম। বড় সার যখন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর চৌকাঠ পার হইতে কিছুতেই পারিলেন না, তখন বড় সারের বাবা বলিলেন 'আর প'ড়ে কি হবে? ও একটা স্কুল করুক।' তারপরে বড়সার পিতাপুত্রে নিজের জায়গায় বাঁশ কাটিয়া ও জমির খড় লইয়া ঐ বিদ্যায়তনটী গড়িয়া তোলেন। সেই সময়ে সহরের এই অংশে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছিল। দুচার জন ছাত্রও জুটিয়া গেল। ক্রমে বসতি জনবহুল হওয়ায় বহু ছাত্র ভর্তি হইল। একজনের স্থানে আরও দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত হইল। কিন্তু সর্বসত্ব বড়সারের সংরক্ষিত ছিল। অন্য সারেরা তাহার বেতনভূক চাকরের মত ছিলেন। অর্থাৎ পড়াইবার জন্য ত দুইজন লোক রাখা হইয়াছে। সেইজন্য বড়সার উচ্চশ্রেণীর চেয়ারটী দখল করিয়া বসিয়া থাকিতেন আর ঘুমাইতেন, এবং ছোটসারেরা বেঞ্চ টপকাইয়া এ শ্রেণী ও শ্রেণীর তত্ত্বাবধান করিতেন। বড়সারের মত এরূপ নিদ্রাশীল ব্যক্তি আমি জীবনে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি নাই। বেলা দশটা হইতে বেলা চারিটা পর্যন্ত সমানে নাসিকাধ্বনি সহকারে নিদ্রা দিতেন। এতগুলি ছেলের উচ্চৈঃস্বরে পাঠ বা টিফিনের হুটোপাটিতে তাহার নিদ্রায় ব্যাঘাত হইত না। তাহার পিতা গণিমিঞা হুকা টানিতে টানিতে আসিয়া অপর দুই শিক্ষক ফাঁকি দিতেছে কিনা তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। মিঞা সাহেব অবশ্য লেখাপড়া জানিতেন না তাহাতে কি যায় আসে "খেটে খাটায় দুনো পায় তার অর্দ্ধেক ছাতি মাথায়" এই আপ্তবাক্য তিনি প্রায়ই প্রয়োগ করিতেন এবং বলিতেন লোক দুটোকে

যে মাসে মাসে মাইনে গুঁজছি তা কাজটি ত বুঝে নিতে হবে, এবং পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কা প্রকাশ করিয়া এবং নিজের বুদ্ধির তারিফ করিয়া ছোটসারদিকে প্রায়ই বলিতেন "ভাগ্যিস্ তখন বুদ্ধি করে স্কুল করে দিয়েছিলুম, নতুবা ঐ ছেলে যে মাঠে যাইয়া জন খাটাইয়া খাইতে পারিত তাহা বিশ্বাস হয় না।

স্থানীয় গির্জার ঢং ঢং করিয়া ৪টা বাজিলে ছেলেরা স্কুল ছাড়িয়া দৌড় মারিত। আমরাও ছুটি হইলে দৌড় দিতাম। প্রায় পক্ষকাল পরে একদিন পরাণদাকে ছুটি দেওয়া হইল না এবং দেখিলাম আরও কয়েকটি ছেলের যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। গীর্জার ঘড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বড় সারের নিদ্রাভঙ্গ হইল তিনি গা মোড় দিয়া বসিয়া বলিলেন 'কই খাতা দেখি।' চতুর্থ শ্রেণীর একজন সহপাঠি সুবোধ নামে একটি বালক খাতাটি লইয়া উচ্চৈস্বরে পড়িতে লাগিল—রামচন্দ্র পাঠক ৮৫, সুধীর গুহ ৫৫, আবদুল লতিফ ১২৫, তিনকড়ি প্রামাণিক ৭৫ এইরূপে প্রায় ৪০।৫০টী ছাত্রের নম্বর বলিল। আমরা ভাবিলাম বোধ হয় পরীক্ষার নম্বর বলিতেছে কিন্তু যখন সর্বশেষে পরাণদার নাম ধরিয়া বলিল প্রাণকৃষ্ণ তালুকদার ১৫ তখন ব্যাপারটা সত্যই দুর্বোধ্য মনে হইল। তালুকদারের মুখের দিকে চাহিলাম সে এই ১৫ নম্বর কি ভাবে অর্জন করিল ইহার মধ্যে ত সে কোন পরীক্ষা দেয় নাই। বড়সার ধ্যান ভঙ্গ মহাদেবের মত বলিলেন কি বল্লি প্রাণকৃষ্ণ তালুকদার পনের! এত কম কেন?

সুবোধ উত্তর করিল সার ও নূতন ছেলে ওর পূর্বের কিছু জমা নাই।

বড়সার বলিলেন কিসে এত কম নম্বর পাইল। সুবোধ বলিল সার হরিদাসকে ষ্টুপিড বলিয়াছিল।

অ্যাঁ ষ্টুপিড বলিলে ১৫ নম্বর! নম্বর পাইবার এমন সুলভ ব্যবস্থা ইতিপূর্বে শুনি নাই। একবার ষ্টুপিড বলিলে যদি ১৫ নম্বর পাওয়া যায় তবে শতকরা ১০০ নম্বর আমি অনায়াসে রাখিতে পারিব। এতদিন

কেন যে কাহাকেও ষ্টুপিড বলি নাই তাই নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিলাম। এরপর নম্বরের কাজ শুরু হইল।

সুবোধ বলিল সার "আমার নম্বর খুব বেশী হয়ে গেছে, আজ তিন দফায় কতকটা উশুল ক'রব।" সুবোধের নম্বর ২৭৫। সুবোধ বড়সারের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল, বড় সার সুবোধের ডান হাতে দশ বেত এবং বাম হাতে দশ বেত জোরে প্রহার করিলেন। তারপর অপর ছাত্রেরা পর্যায়ক্রমে বেত খাইতে লাগিল। সুবোধ পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ মুখে হাওয়া দিয়া গরম করিয়া হাতে সেক দিতে লাগিল এবং আরও দুইবার বেত খাইয়া ৬০ নম্বর উশুল করিল। কেহ কেহ টেবিলের উপর পয়সা দিয়াও প্রস্থান করিল। ব্যাপারটা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না এরূপ তাজ্জব ব্যাপার সাধারণতঃ বয়স্ক লোকেই ধারণা করিতে পারে না। আমরা ত তখন বাল্যকাল অতিক্রম করি নাই। আমরা ভয় বিমূঢ় চিত্তে এই বেত্রাঘাতপর্ব দেখিতেছিলাম অবশেষে আমার দাদা প্রাণকৃষ্ণের ডাক পড়িল প্রাণকৃষ্ণর ত প্রাণপাখী খাঁচাছাড়া হইবার উপক্রম। আমিও পরাণদার অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলাম।

বড় সার গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন এ দিকে আয়। পরাণদা যথাসাধ্য দূরত্ব রাখিয়া অগ্রসর হইল। বড় সার বলিলেন "ব্যাঁত খাবি না পয়সায় উশুল দিবি"? পরাণ দা 'হাঁ' করিয়া রহিল। বড় সার বুঝিলেন পরাণ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই সুবোধকে বলিলেন 'সুবোধ বুঝিয়ে দে ত।' সুবোধ যাহা বুঝাইল তাহার মর্ম এই যে স্কুলে দোষ করিলে দোষের মান হিসাবে বেতের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাণকৃষ্ণ হরিদাসকে 'ষ্টুপিড' বলায় ঐ স্কুলের পিনাল কোড অনুযায়ী ১৫ঘা বেত্র দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল। ক্রমে আরও পরিষ্কার বুঝিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। এই দণ্ডবিধির আবিষ্কার কর্তা আমাদের বড় সার।

তিনি নিজেই আইনকর্তা, জজ এবং জেলারও বটে। অন্য শিক্ষকদের ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার উপায় নাই। কারণ ভদ্রলোকের ছেলেরা ঐ সব বেতনভুক লোকের হাতে শাস্তিভোগ করিলে, ছেলের বাপ মা ছেলেদের স্কুলে পড়িতে দিবে কেন? সেইজন্য বড় সার স্বহস্তে দণ্ডবিধান করিতেন। পয়সা লওয়ার ব্যাপার খুব সম্ভব তাহার পিতৃদেবের আবিষ্কার, এক পয়সায় পাঁচ বেত মকুব। হিসাবরক্ষক এই সব বেতের হিসাব রাখিবার জন্য তাহার মোট শাস্তি হইতে শতকরা ২৫ বেত বাদ পাইত।

এই বেত্রপর্ব ব্যাপারে আমি দুইটী জিনিব বড়সারের চারিত্রিক বিষয়ে লক্ষ করিয়াছিলাম। বড় সারকে কখনও অন্য সময়ে অন্য কারণে ছাত্রদের প্রহার করিতে দেখি নাই। একবার টিফিনের সময় হুটোপাটি করিতে করিতে বড়সারের চেয়ারে ধাক্কা দিই। বড় সার ঈষৎ দৃষ্টি উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, যথাসময়ে স্কুল বসিলে বড়সার বলিলেন "কুড়ি ব্যাত ল্যাখ—" সুবোধ পিনাল কোডের বিশেষজ্ঞ থাকায় বলিল "মাণিক বুঝি ধাক্কা মেরেছিল সার?" যাহা হোক বড়সারকে কখনও ক্রোধ করিতে দেখি নাই, প্রহার করিবার সময়েও কখনও ক্রোধান্বিত হইতে দেখি নাই। ছাত্ররা ইচ্ছামত বেত্রাঘাত খাইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে পারিত। একবার পাঁচ বেত খাইয়া, আবার দুজন ছাত্রের পর আর পাঁচ বেত খাইতে পারিত, পয়সায় পাঁচ বেত উশুল দিতে পারিত। হস্তদ্বয় ছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আব কোথাও আঘাত করা হইত না। কোন ছাত্র যদি বলিত "সার আমি আজ আর মার খাব না" বড় সার বলিতেন "আমার কি! না খেলি না খেলি! আমার ভারি ব'য়ে যাবে, তোরই উশুল হবে না?" অর্থাৎ ঋণমুক্ত হইতে যদি কোন অধমর্ণ ছাত্র অনভিপ্রায় প্রকাশ করিত, তাহাতে বড়সারের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকিত না, এইরূপ অপগণ্ড ছাত্র না হইলে কি ঋণভার মাথায় লইয়া বিদ্যালয় গৃহ হইতে যাইতে পারে? কিন্তু কাহাকেও কোনদিন এক বেত মকুব করিতে

দেখি নাই; বেত্র সংখ্যা বেশী হইলে বড়দারের দুশ্চিন্তার কপোল কুঞ্চিত হইতে দেখিয়াছি, বলিতে শুনিয়াছি "তাই ত! তোর যে বড় বেশী হ'ল রে, শুধ্‌বি কি ক'রে?" অর্থাৎ ছাত্র যে ঋণভার মাথায় লইয়া নিশ্চিন্তে ঘুরিয়া বেড়াইবে, যদি শেষকালে দেনা শোধ করিতেই না পারে! দুশ্চিন্তার কথা বই কি! এই ঋণ শোধ করিতে কত ছাত্রের হাতে কড়া পড়িয়াছে এবং অভিভাবকদের পকেট হইতে কত যে পয়সা উধাও হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক পয়সায় যদি পাঁচ বেত উশুল হয় কে এমন সাধুপুরুষ আছে পয়সা চুরি না করিয়া বেত খায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে যত পয়সা দিত তাহার বেত্র সংখ্যা কমা হওয়া ত দূরের কথা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইত। আমার ও দাদার জলখাবারের সকল পয়সাই দেনা শোধ করিতে ব্যয়িত হইত, তাহাতে না কুলাইলে দাদামহাশয়ের পকেট হইতেও কিছু সংগ্রহ করা হইত। এইরূপে আমরা উভয় ভ্রাতায় বিস্থ এবং বড় বিদ্যা অর্জন করিতে লাগিলাম।

২

আমি ও পরাণদা বাড়ীতে যে ঘরে পড়িতাম তাহার এক পাশের ঘরে মামা ও অপর পাশের ঘরে দাদামহাশয় থাকিতেন, দক্ষিণে ও বামে দুই মাতৃপুরুষের অবস্থান যে আমাদের পক্ষে কিরূপ ত্রিশঙ্কুর অবস্থা ঘটিয়াছিল আজও তাহা মনে হইলে, হাসি সম্বরণ করিতে পারা যায় না। কিন্তু সেদিন এটা ঠিক হাসির ব্যাপার ছিল না। সকাল বেলায় আমরা পড়িতে বসিতাম। ছেলেরা যেমন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে আমরাও সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতাম। তাহাতে মাতুল মহাশয়ের ঘুমের ব্যাঘাত হইত; তিনি নিদ্রা হইতে বেলা নয়টার পূর্বে উঠিতেন না। একদিন পাঠাভ্যাসে রত আছি মাতুল মহাশয় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা দুই

ভাইয়ে গেলাম। মাতুল মহাশয় নিদ্রাজড়িত অথচ রাগতস্বরে বলিলেন, "ষাঁড়ের মত না চেঁচালে কি পড়া হয় না?"—এই বলিয়া দুই ভাইয়ের কর্ণযুগল এমন সজোরে মর্দন করিয়া দিলেন মনে হইল কর্ণযুগল বুঝি মাতুলের হস্তে রহিয়া গেল। কান মলা খাইয়া পুনরায় পড়িতে বসিলাম এবং আস্তে আস্তে পড়িতে লাগিলাম এমন সময়ে দাদামহাশয়ের ডাক্। আমরা দুই ভাইয়ে দাদামহাশয়ের কাছে গেলাম—দাদামহাশয় প্রশ্ন করিলেন "বলি পড়া হচ্ছে?" আমরা উত্তর করিলাম "হ্যাঁ পড়িতেছি"—

"তবে শোনা যাচ্ছে না কেন?"

উত্তর করিলাম "আমরা মনে মনে পড়িতেছি।" দাদামহাশয় আমাদের উভয় ভ্রাতার কর্ণ যুগল ধরিয়া বলিলেন—

"বলি—বি, এ, দিচ্ছ না, এম, এ, দিচ্ছ যে মনে মনে পড়া হ'চ্ছে?

সর্বনাশ, এগুলেও নির্বংশ পেছুলেও নির্বংশ। চেঁচিয়ে প'ড়লে মামার হাতে কাণ, আবার আস্তে প'ড়লে দাদামহাশয়ের হাতে কাণ। এখন কি করা যায়? সে কালে কাণের সহিত মানের কোন নিকট সম্বন্ধ ছিল না অর্থাৎ বয়োজেষ্ঠ হইলে তাহাদের বয়োকনিষ্ঠের কাণ মলার অধিকার থাকিত। তখনকার দিনে কাণ মলার মত লঘু দণ্ড মনু হইতে আমার মাতুল শাস্ত্র পর্যন্ত সমান প্রচলিত ছিল। প্রায় শুনিতাম "কিছু বল্লুম না কাণ ম'লে ছেড়ে দিলুম" বা "যাক্ কিছু ব'লে কাজ নাই কাণ মলে ছেড়ে দে।" তখনকার দিনে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলিতে কাণ মলার অধিকার বোঝাইত। এইরূপে আমরা আমাদের কাণের টাগ-অব-ওয়ার (**tug of war**) এর মধ্যে আমাদের পাঠ সমাপ্ত করিতাম। আমরা মামাকেই বেশী ভয় করিতাম সেইজন্য বেশী সময় আস্তে আস্তে পড়িতাম কারণ মামা কাণ মলিলে কখনও আস্তে মলিতেন না, কিন্তু দাদা মহাশয়ের আঘাত সব সময়েই মৃদু ছিল। আমরা মনে মনে পড়ায় দাদামহাশয় মনে করিলেন আমরা ফাঁকি দিতেছি তাই তিনি এক গৃহশিক্ষক

নিযুক্ত করিলেন। আমরাও কর্ণ বিভ্রাট হইতে রেহাই পাইলাম।

দরিদ্র লোক না হইলে গৃহ শিক্ষক হয় না। আমাদের গৃহশিক্ষকও দরিদ্র ছিলেন। টিউসানি করিয়া তিনি তাঁহার খরচ চালাইতেন। সেইজন্য তিনি আমাদিগকে পড়াইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। যখন তিনি আমাদের পড়াইতেন তখন তাঁর বয়ক্রমঃ কুড়ি কিম্বা একুশ। তাঁহার মত ভালমানুষ ও দুঃখজীবি লোক সচরাচর দেখা যায় না। পড়াশুনায় তিনি ভাল ছেলে ছিলেন, অর্থাভাব না থাকিলে হয়ত একজন কৃতিব্যক্তিরূপে ভবিষ্যতে তাহাকে দেখিতে পাইতাম কিন্তু কঠোর দারিদ্র নিবন্ধন তাহার কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার নাম ছিল ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। আমরা তাঁহাকে ফণীদা বলিতাম। ফণীদা অতি সহজেই আমাদের আপন জন হইয়া গেলেন। আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার বিধবা বৌদি ও এক অবিবাহিতা ভগিনী ছাড়া আর কেউ ছিল না। ফণীদার বৌদিকে আমরা বৌদি ডাকিতাম এবং ভগিনী মনোরমাকে 'মনোদি' বলিতাম। মনোদির বয়স তখন আঠার উনিশ হইবে, বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে বলা চলে, কিন্তু তখনকার দিনে কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে এরূপ অবিবাহিতা কন্যার অভাব ছিল না। তথাপি ফণীদা তাঁহার বিবাহের জন্য সব সময়েই চিন্তাভারগ্রস্ত থাকিতেন। মনোদি অত্যন্ত শান্ত-প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন, সকলে তাহাকে প্রশংসা করিত, বলিত "এমন মেয়ে দেখা যায় না।" সুন্দর স্বাস্থ্য, চমৎকার দেহের গঠন ও মুখশ্রী সব মিলিয়া তাহাকে মনোরমাই মনে হইত। কঠোর দারিদ্রের মধ্যেও এমন সুন্দর করিয়া গৃহস্থালির কাজ করিতে আমি কাহাকেও কোন দিন দেখি নাই। তাঁহাকে দেখিলে তাহাদের কোনরূপ অভাব আছে বলিয়া মনে হইত না। বৌদি সাধাসিধা সরল মানুষ, পূজা অর্চনা লইয়াই

এবং মনোদির ফরমাস খাটিয়া তাহার সমস্ত দিন অতিবাহিত হইত। যদিও তখন তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ পার হয় নাই, তথাপি তাহার কাজ কর্ম ও আচার-ব্যবহার একজন বৃদ্ধার সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। আমরা মধ্যে মধ্যে মনোদিকে খুব বিব্রত করিতাম, প্রায়ই বলিতাম অমুক জিনিষ খাইব। আমাদের তখন এমন বুদ্ধি হয় নাই যে সে সব জিনিষ খাওয়াইবার সামর্থ তাঁহার আছে কি না? আমরা খাইতে চাহিলে মনোদি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া যাইতেন, যাহা হোক সামান্য কিছু খাইতে দিতেন, কিন্তু দেখিতাম মনোদির চোখে জল। আমরা মনে করিতাম মনোদি আমাদের খাইতে দিতে পছন্দ করেন না সেইজন্যে পরে খাইবার জন্য আর ইচ্ছা প্রকাশ করিতাম না, কিন্তু তবুও মনোদি আমাদের কিছু না কিছু খাইতে দিতেন।

এই মনোদির কথা আজও মনে হইলে অশ্রু সম্বরণ হয় না। শৈশবে যদি কিছু মাধুর্য উপভোগ করিয়াছি তবে এই মনোদির কাছেই। কত স্নেহ কত সেবা তাঁহার নিকট পাইয়াছি তাহা ক্ষুদ্র লেখনীতে প্রকাশ করা যায় না। আগেই বলিয়াছি মামা আমাদের প্রহার করিতেন, সময় সময় অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রহার করিতেন। মার খাইয়া আমরা মনোদির কাছে পালাইয়া যাইতাম। মনোদি তেল গরম করিয়া আমাদের আহত স্থানে লাগাইয়া দিতেন আমরাও কাঁদিতাম মনোদিও কাঁদিতেন। আজও যদি কোথাও মনোবেদনা পাই, সেই করুণাময়ী কিশোরীর তৈল নিষিক্ত হস্তের সেবা মনে জাগিয়া উঠে। এইরূপে মনোদি আমাদের একজন আপন জন হইয়া উঠিলেন, সব কিছু দুঃখ কষ্ট তাঁহার কাছে গেলে ভুলিয়া যাইতাম। মনোদিরা যে গরীব এ কথা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তখন আমরা দুই ভাইয়ে তাঁহার দারিদ্র মোচনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। আমাদের জলপানি পয়সা যাহা পাইতাম তাহা মনোদিকে দিবার সিদ্ধান্ত করিলাম।

এমন কি বড়সারের কাছে পয়সা না দিয়া মার খাইব সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলাম। একদিন চারি আনা পয়সা গোপনে মনোদির বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিলাম মনোদি কিছুই জানিতে পারিলেন না কিন্তু সন্দেহ করিলেন উহা আমাদেরই কাজ। মনোদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে মাণিক তুই আমার খুঁটে পয়সা বেঁধে দিয়েছিস্?" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম "না আমরা পয়সা কোথায় পাব যে দেব!" মনোদি আর কিছু বলিলেন না। ইহার পরেরদিন মনোদি আমাদিকে ডাকিয়া খাবার খাইতে দিলেন। একটী ডিসে কয়েকটি রসগোল্লা ও কিছু বাড়ির তৈরী সন্দেশ গুণিয়া দেখিলাম রসগোল্লা চারি আনার আমাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে মনোদি আমাদের পয়সা গ্রহণ করেন নাই। রসগোল্লাও যে এত বিস্বাদ লাগিতে পারে তাহা জানিতাম না, আমরা খাওয়া বন্ধ করিলাম মনোদি জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে খাচ্ছিস্ না যে—বাবুদের বুঝি রাগ হয়েছে?" আমরা উত্তর করিলাম না, দেখিলাম মনোদি চোখে জল আমরাও কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম।

কান্না যে এত মধুর আমি সেইদিন প্রথম উপলব্ধি করি।

মনোদি বলিলেন "আমরা গরীব তাই বুঝি রাবুদের সাহায্য করা হয়েছে। তা চার আনা পয়সায় আমার কি দুঃখ ঘুচবে রে।"

আমরা ইহার কোন জবাব দিলাম না, আর কিই বা জবাব দেব?

মনোদি বলিলেন—"তোরা বড় হ'য়ে যখন রোজগার করবি তখন তোদের পয়সা নেব এখন কোথায় পাবি তোরা—আর বড় হ'য়েও কি তোদের আমাকে ম'নে প'ড়বে?"

আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলাম—"কি মনে প'ড়বে না? নিশ্চয়ই মনে প'ড়বে।" পরাণদা কোন জবাব করিল না। সাধারণতঃ পরাণদা রাগিয়া গেলে কম কথা বলে।

মনোদি বলিলেন—"দেখিস মনে প'ড়বে না।" মনোদি ব'লে কি!

বড় হইলে আমরা তাহাকে ভুলিয়া যাইব! ইহা কি হইতে পারে? তাই বলিলাম "কালীর দিব্বি ভুলবো না তোমাকে মনোদি।" মনোদি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "তোরা যে ভুলবি না তা কি ক'রে বুঝবো?" —সত্যই মনোদিকে কি করিয়া বোঝাইব যে, আমরা কখনও মনোদিকে ভুলিব না। আমি বলিলাম "বল কি করলে তোমার বিশ্বাস হয়?"

মনোদি বলিলেন—"রসগোল্লাগুলো খেয়ে নে, তবে বুঝব আমাকে ভুলবি না।"

এত সহজে এত বড় গুরুতর সন্দেহজনক ব্যাপার মিটিয়া যাইতে পারে তাহা চিন্তার অতীত তাই সানন্দে আমরা উভয় ভ্রাতায় রসগোল্লাগুলি খাইয়া ফেলিলাম।

সেদিন বুঝিতে পারি নাই মনেদি আমাদিগকে ভুলাইয়া রসগোল্লা খাওয়াইয়াছে—কিন্তু তার সঙ্গে যে মনোদিকে না ভুলিবার প্রতিজ্ঞা ছিল তাহা যে এমন স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিন সঞ্চিত থাকিবে তাহা কী আমরা ভাবিয়াছিলাম? আমাদের ত সে বয়সে অত গভীর করিয়া কোন জিনিষ ভাবিয়া দেখার মত মানসিক পক্বতা গড়িয়া উঠে নাই। সেইদিন হইতে মনোদির এবং আমাদের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান ছিল তাহা ঘুচিয়া গেল। মনোদি আর আমাদের কোন সাহায্য লইতে সঙ্কোচ বোধ করতেন না আর আমরাও মনোদির কোন কাজে লাগিতে পাইলে পরম কৃতার্থ বোধ করিতাম।

মনোদির বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল কিন্তু কোথাও পাকা কথা হইতেছিল না। একদিন মনোদি আমাকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিলেন—"ছাখ্ মাণিক এই চিঠিটা বিপুলদাকে দিয়ে আয় ত?" আমি পত্রখানি লইলাম মনোদি সাবধান করিয়া দিলেন আমি যেন ছিরুকে পত্রের কথা না বলি। আমার মন আনন্দে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, তা হ'লে মনোদি পরাণদার চেয়ে আমাকে বেশী

ভালবাসে, আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম "কখনও না, কালীর দিব্বি পরাণদাকে ব'লব না।"

আমি পত্র লইয়া ছুটিলাম, পথে দেখি পরাণ দা—পত্রটী যথাসাধ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পরাণদার দৃষ্টি এড়াইতে পারিলাম না। পরাণদা বলিল—"মাণ্‌কে কি নিয়ে যাচ্ছিস রে—"

আমি বলিলাম "আমি যা নিয়ে যাচ্ছি তা ব'লতে মনোদি বারণ করেছে।"

পরাণদা বলিল "কি আমাকে বারণ ক'রেছে মনোদি?"

হ্যাঁ, বলে দিয়েছে হীরুকে দ্যাখাস্ নে?"

"বটে? দেখাচ্ছি মজা আজ মনোদিকে।"

পরাণদা মনোদিকে কি মজা দেখাইবে বুঝিতে পারিলাম না। পরাণদা খুবই বদরাগী যদি মনোদির ঢিল মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দেয়—ভয়ে আমার অন্তর শিহরিয়া উঠিল বলিলাম "পরাণদা ও একটা চিঠি দ্যাখ্ না তুই ও আমি মনোদিকে বলব না।"

পরাণদা ও আমি পত্র খুলিলাম, পত্রটি খামে মোড়া ছিল না। পত্র খুলিবার সময়ে মনে হইয়াছিল মনোদির উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছি, কিন্তু কি করিব দাদার ঢিল হইতে ত মনোদিকে বাঁচাইলাম। পত্রে যাহা লেখা ছিল তখন তাহার মর্ম বুঝিবার মত বয়স আমাদের হয় নাই। এখন স্মরণ করিয়া সেই পত্রের কথা উল্লেখ করিলে ঠিক পত্রে যাহা লেখা ছিল তাহা উল্লিখিত হইবে না, তবুও পত্রটি আমার জীবনে মস্ত বড় একটী দাগ কাটিয়া বসিয়া আছে। কারণ একজন স্নেহের পাত্র প্রথম বিশ্বাসহন্তার কাজ করিয়া যে বেদনাময় চিত্রের পরিচয় লাভ করিয়াছিল তাহার অর্থ সেদিন বুঝি না বুঝি আজ বুঝিতে বাকি নাই। তাই যতদুর স্মরণ করিতে পারি তাহাই বলিতেছি।

বিপুলদা,

আপনি আমাকে কেন পত্র দেন? আপনি ত দাদার বন্ধু, প্রায়ই আসেন আমাদের বাড়ীতে, তখন ত আমার সঙ্গে কথাও বলেন আমিও কথা বলি। কিন্তু পত্রে আপনি যে কথা লেখেন সে যেন মনে হয় আপনি লেখেন না। প্রথম যেদিন আপনার নিকট দশটা টাকা ধার করিয়াছিলাম সে দিন সে টাকা ফেরৎ দিতে পারিব মনে করিয়াই ধার করিয়াছিলাম। সে টাকা শুধিতে না পারিয়াও আবার ধার করিয়াছিলাম আপনি দ্বিধাহীন চিত্তে সে টাকা দিয়াছিলেন। এইরূপে বহু সাহায্যই আপনি করিয়া আসিয়াছেন। তখন জানিতাম না আপনার ধার আমার কাছে এতখানি বোঝা হইবে।

আপনি লিখিয়াছেন—আপনি আমাকে ভালবাসেন এবং আমি ভালবাসি কিনা তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। এর কোন জবাব দিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু বারংবার গোপনে পত্র দিয়া আমার অবস্থা অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। খুব সম্ভব আপনার পত্র দেওয়ার ব্যাপার বৌদি জানিতে পারিয়াছেন আজ আমাকে ডাকিয়া আকারে ইঙ্গিতে তাহা জানাইলেন এবং আমিও যে যথারীতি আপনার সহিত পত্র ব্যবহার করি এই তাঁহার ধারণা। আমি মনে করিয়াছিলাম আড়ালে ডাকিয়া আপনাকে নিষেধ করিব, যে আপনি, যেন আর আমাকে পত্র না লেখেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে আড়ালে দেখা করার মত সাহস আমি হারাইয়াছি। আপনাকে আমার ভয় হইতেছে যে আপনি উন্মাদের মত কিছু না করিয়া বসেন। আমরা দরিদ্র বলিয়া আপনার কাছে সাহায্য লইয়াছি। মনে করিয়াছি আপনি উদার তাই সাহায্য করেন, এখনও সেই ধারণা আমার বদলায় নাই। কিন্তু দারিদ্রের সুযোগ লইয়া আপনি যে এমন হীন প্রস্তাব করিবেন তাহা ভাবিতে পারি নাই। আপনার অনেক টাকা আছে, আমরা টাকা শোধ না দিলেও আপনার

ক্ষতি নাই। টাকাও আপনি ফেরৎ চাহেন নাই বরং বেশী করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, বিনিময়ে আমাকে চাহিয়াছেন। শেষের পত্রে আপনি কয়েকখানা দশটাকার নোট দিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন আমি যেন ঐ টাকা লইতে অস্বীকার না করি তাহা হইলে আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন। আপনাকে টাকা ফেরৎ দিলাম না। কারণ আগের টাকা ফেরৎ না দিয়া অনাবশ্যক দাম্ভিকতা দেখাইবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনি আমার দাদার বন্ধু আমাদের অতি আপনজন তাই অনুরোধ করি পত্র লিখিয়া আমাকে বিব্রত করিবেন না, আপনি আমাকে ভালবাসেন তাই কি আমাকে এমনি বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া ভালাবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছেন? আমি ভালবাসি কিনা জানিতে চাহিবেন না। দারিদ্রের সুযোগ লইয়া যিনি এরূপ কথা বলিতে পারেন তাঁহাকে ভালবাসিতে পারা যায় কিনা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। পত্র লিখিবেন না, আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

মনোরমা।

পুঃ পত্রখানি পড়িয়া ছিঁড়িয়া দিবেন।

"মারব গাঁট্টা—"

"কাকে পরাণ দা?"—

"কাকে আবার ঐ বিল্লুকে!"

বিপুলদাকে বিল্লু নামে সকলে ডাকিত। আমি বলিলাম "সে কি দোষ ক'রলে?" পরাণদা উত্তর করিল "দোষ করে নাই? নিশ্চয়ই ক'রেছে—সুন্দর গাধার আমার হাতে মরণ আছে দেখছি।" পরাণ দা দেখিতে ফর্সা ছিল তাই দাদামহাশয় তাঁহাকে ভৎসনার সময় কখনও কখনও সুন্দর গাধা বলিতেন। পরাণদাও ফর্সা লোককে সেই বাক্য প্রয়োগ করিত। বিপুলদা ফর্সা ছিলেন। বিপুলদা অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু পরাণদা যেরূপ উত্তেজিত তাহাতে ধরিয়া

লইলাম বিপুলদা কিছু বড় রকমের দোষ করিয়াছে। তাই পরাণদাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম-কি দোষ ক'রেছে বিপুলদা ?"

পরাণদা বলিল—"দেখছিস্ না গাধা বিল্লেটা চিঠিতে লিখেছে "মনোদি"কে ভালবাসে।" এতক্ষণে পরাণদার ক্রোধের কারণ বোঝা গেল। বিপুলদা মনোদিকে ভালবাসে জানিয়া আমিও ক্রুদ্ধ হইলাম। মনোদিকে আমরা দুই ভাই ছাড়া আর কেহ ভালবাসিতে পারে ইহা আমাদের কল্পনার অতীত। কিন্তু বিপুলদা ভালবাসিলে আমরা কি করিয়া বাধা দিব ভাবিয়া পাইলাম না। অনেক চিন্তার পর বলিলাম "আচ্ছা পরাণদা মনোদি ত ভালবাসে না ?"

পরাণদা বলিল—"হুঁ ঐ সুন্দর গাধাটাকে ভালবাসতে যাবে, আমাদের রাগ হয় ত মনোদির—।" হৃদয় সংশয় মেঘমুক্ত হইয়া গেল যাহাকে আমাদেরই দেখিলে রাগ হয় তাহাকে মনোদি কেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে ? বিপুলদার প্রতি আমাদের যে খুব রাগ ছিল তাহা নহে মাত্র পত্র পড়িয়া সেই দিনই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই। কিন্তু সেদিন আমার মনে হইয়াছিল এই বিপুলদার উপর আমরা যেন যুগযুগান্ত ধরিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া আছি। মনোদিকে যে ভালবাসে তাহাকে আমরা ক্ষমা করিতে পারি না। তবে সান্ত্বনা এই যে মনোদি বিপুলদাকে ভালবাসে না।

পরাণদা বলিল "দ্যাখ্ মাণকে এরপর বিল্লে যখন মনোদির বাড়ী যাবে তখন নজর রাখিস্"—নজর যে রাখা উচিৎ সে কথা স্বীকার করিলাম।

সেদিন ছিল ভাতৃদ্বীতিয়া, তাহার আগের দিন মনোদি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আমরা দুই ভাইয়ে যুক্তি করিলাম মনোদিকে একখানা কাপড় কিনিয়া দিব। আমরা দুই ভাই ছয় আনা পয়সা লইয়া পদব্রজে সহরে গেলাম। কত দোকানের সন্মুখে কাপড় কিনিবার জন্য দাঁড়াইলাম। কিন্তু হায় কাপড় ত আর রসগোল্লা নয় যে ছেলে দেখিলেই আগাইয়া আসিয়া ঠোঁঙ্গা বাঁধিবে? কোন দোকানদারই আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। প্রত্যেকটী বস্ত্রের দোকানের মালিক আমাদের কথা শুনিয়া হাসিল কিন্তু ছয় আনার একখানি কাপড় কেহ দিল না। অবশেষে একটী ছোট দোকানদার ছয় আনা পয়সা লইয়া একটী বড় গামছা আমাদের হাতে দিয়া বলিল—উহাতেই আমাদের কাজ চলিবে। আমরা সানন্দে গামছাখানি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

গৃহে ফিরিতেই 'এই যে এই যে' রব উঠিয়া গেল। মাসীমা আসিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চাপড় কসিয়া দিলেন। দাদামহাশয়ও কাণ ধরিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ ছিলি কোথায় গাধারা"—এই বলিয়া মৃদু দুই এক চাপড় মারিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমরা নিস্তার পাইলাম মনে করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গামছাটি গোপনে আর একবার দেখিয়া আসিলাম। বলাবাহুল্য গৃহে প্রবেশের পূর্বে গামছাটি গোপন স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। এমন সময় মামা ফিরিয়া আসিলেন, তিনি নাকি আমাদের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। আমাদিগকে গৃহে দেখিয়াই একেবারে জুতাশুদ্ধ লাথি, কিল ও চড় চালাইতে লাগিলেন। দাদামহাশয় ছুটীয়া আসিয়া আমাদের প্রহারের কবল হইতে মুক্ত করিলেন। একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি সেদিন দাদামহাশয় মুক্ত না করিলে যম আসিয়া আমাদের মুক্ত করিত। মামা যখন মারিতেন তখন তাঁহার জ্ঞান

থাকিত না। দুর্বলকে সবল যখন মারে তখন তাহার জ্ঞান থাকে না, ইহা হইল বাস্তব সত্য, তা যে কোন 'মারের' জগতে বিচার করিলেই দেখা যায়। দিল্লীর শেষ বাদসাহ বাহাদুর সাহেবের পুত্রদ্বয়কে যখন দিল্লীর রাজপথে বিনাবিচারে গুলি করা হইয়াছিল অথবা রাশিয়ার জার বংশের ছয় মাসের শিশুটিকে পর্যন্ত হত্যা করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তখনও ন্যায় নীতির কোন প্রশ্ন উঠে নাই। সবল দুর্বলকে মারিবে ইহাতে অন্যায় কোথায়? একটী অসহায় শিশুকে একজন গুরুজন নির্মম ভাবে প্রহার করার অভিযোগে কাহাকেও কোন দিন কোন আদালতে অভিযুক্ত হইতে দেখি নাই।

আমাদিগকে ঐ দিন যে মারা ঠিক হইয়াছিল একথা সকল গুরুজনেই একবাক্যে স্বীকার করিল, তবে মারের ডিগ্রী লইয়া অবশ্য কিছু মতভেদ ছিল। মাতুল মহাশয়ের একটি গুণ ছিল যখনই তিনি আমাদের দৈহিক শাস্তি দিতেন তখনই আমাদের কিছু কিছু খেসারত করিতেন। খুব সম্ভব অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তাহা করিতেন। কখনও থিয়েটার দেখাইতেন কখনও সার্কাস, যখন ঐ সব যোগাযোগ না ঘটিত তখন ভরপেট মিষ্টান্ন দিয়া আমাদের সন্তোষ বিধান করিতেন। সেইজন্য মার যতই গুরু হোক মধুরেণ উহার সমাপ্তি ঘটিত বলিয়া মার ব্যাপারটা পরে লঘু ঠেকিত। মামা ডাকিয়া বলিলেন, "কোথায় গিয়েছিলি বল্—মিথ্যা ব'ললে আবার মারব।" আমরা জানি সত্য মিথ্যার প্রশ্ন নয়, মামার মনের মত কিছু বলিতে হইবে নতুবা আবার প্রহার আরম্ভ হইবে। হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি খেলিয়া গেল—বলিলাম "মনোদি একটী দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলেন কিন্তু ঐ নোটটি হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহাই খুঁজিতে এত দেরী হইয়াছে।

মামা জিজ্ঞাসা করিলেন "নোট পাওয়া গেছে?" অম্লান বদনে উত্তর করিলাম—না।

মামা বলিলেন, "ওঃ খুব লায়েক্ হ'য়েছ দেখছি—" ড্রয়ার হইতে একটী দশটাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন, "এই নে তাকে দিয়ে দিবি গরীব লোক তারা কোথায় পাবে যে তাদের নোট হারিয়ে দিলি ?" এই বলিয়া আরও দুই টাকা আমাদের দুই ভাইকে দিয়া বিদায় করিলেন। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলাম এবং মামা দীর্ঘজীবি হইয়া আমাদের 'মারিতে থাকুন' এই কামনা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

পরের দিন ভোরে আবার দুই ভাইয়ে সহরে গেলাম। যাওয়ার সময় এক্কা করিয়া গেলাম। এক্কাওয়ালাকে আশাতীত ভাড়া দিয়া তাহাকে দিয়াই এক জোড়া ভাল সাড়ী কিনিয়া একবারে মনোদির বাড়ীতে ফিরিলাম। মনোদি ইতিপূর্বেই আমাদের বাড়িতে খোঁজ লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন আমাদের দেখিয়া তাঁহার কি আনন্দ, এত আনন্দ আর কখনও দেখি নাই। মনোদি বলিলেন—"তোরা কোথায় ছিলি তোদের যে খুঁজে খুঁজে বাড়ীর লোক হয়রাণ হ'য়ে গেল।" 'বাড়ির লোক হয়রাণ হ'য়ে গেল' এই কথা শুনিবামাত্র অন্তরাত্মা পুরুষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আমরা কাপড় জোড়াটি দিদির পায়ে ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ফিরিলাম। মাসীমা আমাদের দেখিয়াই বলিলেন "কাল মার খেয়েছিস্ লজ্জা নাই, যা পোড়া ছেলে শিগ্‌গিরি চান্ ক'রে ভাল কাপড় পোরে ফোঁটা নিয়ে আয়। মনোরমা কখন লোক পাঠিয়েছে তার ঠিক নাই।" আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, এত বড় অন্যায় করিয়া এমন নিষ্কৃতি লাভ জীবনে এই প্রথম উপভোগ করিলাম। সেই দিন সব কিছু মধুর লাগিয়াছিল, একজন শিশুর যতখানি মাধুর্য বোধ থাকা উচিৎ তার সবটুকু পূর্ণরূপে সেদিন ভোগ করিয়াছিলাম।

ভাইফোঁটা দিয়া মনোদি আমাদিগকে পরিতোষ পূর্বক আহার করাইলেন। আহারের পর পরাণদা সঙ্কোচে বলিলেন, "দিদি আমরা কাপড় এনেছি তোমাকে প্রণাম ক'রব বলে।" মনোদি হাসিয়া বলিলেন,

"তাই বুঝি কাপড় জোড়াটী ফেলে দৌড় দিয়েছিলি ? কাপড় কেনার টাকা কোথায় পেলি ?"

আমি বললাম, "আমাদের আবার টাকার অভাব ? অনেক টাকা আছে ! কিন্তু কাপড় তোমাকে নিতেই হবে মনোদি।" কেন জানি না মনোদি সেদিন কোন আপত্তি করেন নাই, কাপড় জোড়াটী আনিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিলেন এবং পুনরায় আমাদের হাত হইতে লইলেন। আমাদের দেওয়া কাপড়ের কাছে মনোদির পরিধেয় বস্ত্র ম্লান দেখাইতেছিল। মনোদির পরিধেয় বস্ত্রের বহুস্থানে সেলাই করা। মনোদি সেদিন আমাদের দেয় বস্ত্র প্রয়োজন বোধেই লইয়াছিলেন সে কথা আজ বুঝিতে পারি, কিন্তু সেদিন বুঝিবার মত বয়স হয় নাই। যাহা হোক সেদিন আমরা খুশীই হইয়াছিলাম।

মনোদিকে মধ্যে মধ্যে দেখিত আসিত। কিন্তু কেন জানি না কেহই তাঁহাকে পছন্দ করিত না। পাত্র পক্ষ যেদিন অপছন্দ করিয়া যাইত সেইদিন সমস্ত বাড়িখানা বিষাদময় দেখিতাম। মনোদি সেদিন আমাদের সহিত কথা বলিতেন না। বৌদিকে নানারূপ দুঃখ করিতে দেখিতাম। ফণীদার অবশ্য কোনরূপ পরিবর্তন দেখি নাই। মনোদি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন যতদূর মনে হয় তাঁর মত সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। আমি কবি নই যে মনোদির রূপের বর্ণনা দিব। অতসী পুষ্পের সহিত কিম্বা এক গুচ্ছ চাঁপার সহিত তাহার তুলনা করা চলে কিনা জানি না তবে পুষ্পের সুষমার যদি কোন মূল্য থাকে তবে মনোদির সুষমাময় শ্রী, যে কোন লোকের নয়ন মন মুগ্ধ করিবে। তখন বালক ছিলাম নারীর রূপকে শিল্পীর চোখ লইয়া দেখিবার মত বয়স আমার হয় নাই। মনোদির সৌন্দর্য আমাদিগকে আকৃষ্ট করার মত বয়সও আমাদের হয় নাই, তাঁহার অন্তরের স্নিগ্ধ মনোরম মাধুর্যের পরিচয় পাইয়াই আমরা তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। ফুল যেমন ঝরিয়া পড়িলে

তাহার সুষমাটুকু হারায় কিন্তু তাহার গন্ধটুকু তখনও রহিয়া রহিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তেমনি মনোদি আজ নাই কিন্তু তাহার মনোমুগ্ধকর অন্তরের সৌরভ আমাদের মনোজগতের চারিপাশে এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মনোদির বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইত মনোদিকে অপছন্দের জন্য নহে। আসল কারণ ফণীদার বরপণ দেবার মত অর্থানুকুল্য ছিল না। মনোদির বিবাহ হউক আমরা দুই ভাই ইহা চাহিতাম না। বিবাহ হইলে মনোদি শ্বশুর বাড়ি চলিয়া যাইবে তখন আমাদের বিদেশ বাসের সুখনীড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু একটী বিষয়ে আমারা কৌতুহল বোধ করিতাম, মনোদি বোধহয় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। কারণ বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেলে সে দুঃখ পায় কেন? আমরা মনোদিকে স্বার্থপর ভাবিতাম সে বিবাহ করিতে চায়। বিবাহ করিলে মনেদির কি লাভ? এইরূপে মনোদির বিবাহ লইয়া আমরা খুবই ভাবিতাম। বিবাহ দেখিতে সকল বালকই চায়, আমরাও চাহিতাম। কিন্তু মনোদির বিবাহের কথা শুনিলে আমাদের সকল আনন্দ নিভিয়া যাইত। আমরা মনোদির একটী কাল্পনিক বর ঠিক করিয়াছিলাম এবং সেই বরকে আমরা দুই ভাই গোপনে অশেষবিধ গালাগালি করিতাম। এইরূপে মনোদি এবং মনোদির বরকে লইয়া আমাদের বহু সময় অতিবাহিত হইত। খুব সম্ভব সেই সময় হইতেই আমি কল্পনাবিলাসী হইয়া উঠি।

একদিন মনোদিকে বলিলাম—"তুমি বিয়ে ক'রলে তোমার বরকে ছেড়ে কথা কইব না কিন্তু মনোদি—এমন মার দোব—তখন বুঝতে পারবে?"

মনোদি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন, কোনরূপে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"সেকি ভাই আমার বরকে মারতে আছে? সে যে তোদের গুরুজন হয়?"

বলাবাহুল্য সেদিন গুরুজনকে যথেষ্ট কটুকাটব্য করিয়াছিলাম এবং মনোদি কৌতুকভরে কত কথাই না বলিয়াছিলেন সে কথা আজও মনে পড়ে।

মনোদি—আমার বরকে মারতে দেব কেন?

আমি—দেবে না! সে তোমার কে?

মনোদি—সেকি সে যে আমার বর।

আমি—বর না ছাই। বেশ ক'রবো তাকে মারবো।

মনোদি—বেশ মারলে আমার তোদের সঙ্গে আড়ি।

আমি—আড়ি ক'রবে? কেন তুমি আমাদের ভালবাস না?

মনোদি দাঁতে কাপড় চাপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আমার বরের চেয়ে কি তোদের বেশী ভালবাসতে পারি?

মনোদির মুখে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শুনিব আশা করি নাই। আমি ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। মনোদির চুল ধরিয়া টানিয়া খামচাইয়া কামড়াইয়া মনোদিকে বিব্রত করিয়াছিলাম। মনোদি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—"না মাণিক কাঁদিস না, বরকে আবার কেউ কখনও ভালবাসে? বর কি আমার সাত পুরুষের লাউ খোলা যে তাকে ভালবাসতে যাব? সে ত শুধু বর, তোরা আমার ভাই। তোদিকে ছেড়ে বরকে ভালবাসতে যাব কেন? নে চুপ কর্ কাঁদলে লোকে কি বলবে।" আমি মনোদির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না। পরাণদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে আমার মত অভিভূত হয় নাই তাই ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"কাঁদিস না মাণ্‌কে—আসুক না বর দেখি, এক গাঁট্টায় মাথাটা ফাটিয়ে দেব না?"—মনোদির বরের অবশ্য গাঁট্টা খাইবার সৌভাগ্য হয় নাই এবং যদি গাঁট্টা খাইবার সৌভাগ্য হইত তবে দাদার গাঁট্টার দরকার হইত না আমার গাঁট্টাতেই তাহাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইত।

আমার শৈশব জীবনে মনোদি অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল। আজ বার্দ্ধক্যের দুয়ারে দাঁড়াইয়াও মনোদিকে ভুলিতে পারি নাই। জীবনের অল্প কয়েক দিন মাত্র মনোদির সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল কিন্তু সেই অল্প কয়দিনই আমার জীবনে মনোদি এমন প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন যে সব কিছু ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব তবুও মনোদিকে ভোলা অসম্ভব। জীবনে বহু নারীর সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে। কত কিশোরী, কত তরুণী যৌবনের স্বভাব-সুলভ কামনার দুয়ারে আসিয়া বার বার ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকেও ভালবাসিয়াছি একজন যুবক একজন যুবতীকে যতখানি ভালবাসিতে চায় হয়ত ততখানিই তাহাদিগকে ভালবাসিতে চাহিয়াছি। কিন্তু মনোদির মত ত কাহাকেও ভালবাসিতে পারিলাম না। জীবনের অবশিষ্ট কালে যে কোন নারীর সংস্পর্শে আসিয়াছি তাহাকেই মনোদির সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়াছি অমুকের চেহারা মনোদির মত নহে। অমুক হ্যাঁ মনোদির চেয়ে দেখতে অনেক ভাল কিন্তু চোখ দুটী ঠিক মনোদির মত নহে। কৈশোরে মনোদির ভালবাসা মাতৃস্নেহকেও যেন ছাড়াইয়া গিয়াছিল। মনোদি না থাকিলে আমি রাজসাহীতে থাকিতে পারিতাম না। কি আশ্চর্য্য যৌবনে যখন সব কিছু বাসনা রঙীন হইয়া কানায়-কানায় উপচাইয়া পড়িতেছে তখন দেখি আমার মনোদি তাহার সংযত, শান্ত, পবিত্র মাধুরী লইয়া যেন প্রিয়ারূপে অপেক্ষা করিতেছে। বিপদে দুঃখে, রোগে, যখন জীবনকে লইয়া বিব্রত বোধ করিয়াছি তখন দেখি মনোদি বন্ধুরূপে, সাথীরূপে যেন সমস্ত দুঃখকে ভাগ করিয়া লইতেছে। আজ জীবন সায়াহ্নেও দেখি মনোদি বলিতেছেন "তুই বুড়া হ'য়ে গেলি মাণিক্ এই গ্যাখ্ এখনও আমি ঠিক তেমনি আছি।" মনোদির আহ্বান আমাকে ভুলাইয়া দেয় যে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। যখন জীবনের সব কিছু হারাইতে বসিয়াছি তখন মনোদি যেন সব কিছু হারাণ জিনিষের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। আমিও

তখন আমার দীর্ঘ জীবনের সব কিছু বঞ্চনাকে উপেক্ষা করিয়া সঞ্চয়ের থালি লইয়া ফিরিতেছি। যখনই মনে হয় সব কিছু হারাইয়াছি মনোদি যেন বলে 'না সব কিছু আছে।' আমি হারাইলেও মনোদি হারায় নাই, আমার মধ্যেই মনোদি আজ বাঁচিয়া আছেন।

আর মাত্র দুইটি ঘটনা বলিয়া মনোদির কাহিনী শেষ করিব। মনোদির আমরা দুই ভাই ছাড়া আর কোন সাথী ছিল না। তাহাকে কখনও বাড়ীর বাহির হইতেও দেখি নাই। দেখিতাম বাড়ীর বাহির হইতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন। অনূঢ়া কন্যা আমাদের সমাজে অভিশপ্ত। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও তাহার রেহাই নাই। মনোদির বিবাহ না হওয়ার জন্য অনেকে সমালোচনা করিত। মাসিমাকেও সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি। মনোদির কানেও যে সে সব কথা না যাইত তাহা নহে। আমরা যেখানে যাহা শুনিতাম মনোদিকে বলিতাম। আমাদের কথা শুনিয়া মনোদি আরও বিব্রত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। কত লোকে কত কথাই বলিত। কেহ বলিত "কটা ছুঁড়িটা কি আর বিকুবে? বিয়ে দিলে আজ তিন ছেলের মা হ'ত। কেহ বলিত "পয়সা নাই ত রাখাল-বাগাল দেখে বিয়ে দে না বাপু? অত পছন্দর বালাই কেন?" যদি বা কেহ সমবেদনায় আহা করিত তথাপি মনোদির বিবাহ না হওয়া তাহারাও পছন্দ করিত না তাহারা বলিত "তা যখন পয়সা দিতে পারবে না তখন যেমন জোটে তেমনই ধ'রে দেওয়া উচিত, মেয়ে-মানুষের আবার রূপ তাই দেখে আবার পছন্দ ক'রে লোকে বিয়ে করবে! ফণীর যেমন আক্কেল।" মনোদি এই সব কারণে বাড়ীর বাহিরে যাইতে লজ্জা পাইতেন। কোন্ লজ্জায় সে বাহির হইবে? তাহার অপরাধের যে সীমা নাই। কুলীন ব্রাহ্মণঘরে জন্মিয়া সে যে অপরাধ করিয়াছে তাহার ত আর সংশোধন করিবার উপায় নাই। তাহার উপর তাহার সৌন্দর্য, নিটোল স্বাস্থ্য

অপরাধের মাত্রাকে আরও গুরু করিয়াছিল। চাটুয্যেদের শিবানি মনোদির চেয়ে বয়সে বড় হইলেও তাহার আরও দুই বছর বিবাহ না দিলেও চলে—সেইজন্যই ত তার বাবা এখন পাত্রের সন্ধান করিতেছে না" এই সব কথা বৌদিকেও মধ্যে মধ্যে বলিতে শুনিতাম। এই মনোদি সব কিছু লজ্জা ভুলিয়া আমাদের জন্য একদিন বাড়ীর বাহির হইতেও দ্বিধা করেন নাই। সেদিন ছিল মহরমের পরের দিন। মহরমে রাজসাহীতে খুব ধূম হয়। লাঠি খেলা, তরোয়াল খেলা লাঠির দুই প্রান্তে ন্যাকড়া জড়াইয়া আগুন দিয়া ঘোরান প্রভৃতি খেলা দেখান হইত। আমরা ছেলের দল মহরমের পর ঐ সব খেলার অনুকরণ করিতাম। সেদিন বাড়ীতে দাদামহাশয় বা মামা কেহ নাই দেখিয়া পরাণদা ও আমি একটি লাঠির উভয় প্রান্তে ন্যাকড়া জড়াইয়া কেরোসিন দিয়া আগুন জ্বালিয়া ঘুরাইতে লাগিলাম। লাঠির দুই প্রান্তে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল—মহা উল্লাসে পরাণদা লাঠি ঘুরাইতে প্রবৃত্ত হইল, এমন সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। জলন্ত লাঠির এক প্রান্ত হইতে একটি অগ্নি গোলা ছুটিয়া আসিয়া বাহিরে একটি ঘরের চালে পড়িল। নিমেষে ঘরটি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের বসতবাটী হইতে ঘরটি দূরে ছিল এবং তাহাতে ঠিকাদারীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি থাকিত। আমাদের বাড়ীটি ইষ্টক নির্ম্মিত থাকায় তাহাতে আগুন লাগিবার কোন আশঙ্কা না থাকিলেও যে ঘরে আগুন লাগিল তাহাও কম ক্ষতিকর নয়। আমরা দুই ভাইয়ে ভয়ে দৌড় দিলাম। জানিতাম আমরা থাকিলে ঐ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে মামা আমাদের সমর্পণ করিবেন। আমরা ছুটিয়া যাইয়া নিকটস্থ একটি জঙ্গলে আশ্রয় লই। অন্য দিন কোন কিছু অপরাধ করিলে মনোদির কাছে পলাইতাম কিন্তু সেদিন মনোদিকেও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমরা বাড়ী

হইতে কিছু দূরে একটি ঝোপে আশ্রয় লইলাম। চতুর্দ্দিকে বড় বড় আমগাছ। এবং আমগাছগুলির তলায় ঘন সন্নিবেশিত আশাস্যাওড়ার গাছ। আমগাছগুলি অধিকাংশই লতাদ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ জঙ্গলে মধ্যে মধ্যে বাঘ আসিত এইরূপ শুনিয়াছি। সাপের ত কথাই নাই। কিন্তু সেদিন বাঘ বা সাপকে ভয় করি নাই, করিয়াছিলাম মানুষকে। জানিতাম সাপ বা বাঘের নিকট নিস্তার পাইলেও পাইতে পারিব কিন্তু মানুষের কাছে পরিত্রাণ পাইব না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, ভয়ে ক্ষুৎ পিপাসায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম কিন্তু সেই আশ্রয়স্থল হইতে বাহির হইতে সাহস করিলাম না। কোন কিছু খড়্ খড়্ করিলে মনে হইতে লাগিল এখনি বুঝি বাঘে তুলিয়া লইয়া যাইবে। আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম "চল পরাণদা বাড়ী ফিরে যাই।"

পরাণদা উত্তর করিল "ক্ষেপেছিস্ আজ তা হ'লে বাঁচতে হবে?" এইস্থানে থাকিলেই বা বাঁচিব কি করিয়া তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু পরাণদার উত্তরকে অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বাড়ী ফেরার চেয়ে যে এই আশ্রয়স্থল ঢের বেশী নিরাপদ তাহা অনুভব করিলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখি অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম—"পরাণদা এখানেই কি আমাদের বরাবর থাকতে হবে?" পরাণদা ইহার কি জবাব দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি কাঁদকাঁদস্বরে বলিলাম "তাহলে কি হবে পরাণদা?" হঠাৎ পরাণদার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—পরাণদা বলিল "থাম কিছু ভাবনা নাই, জানিস্ না বনে জঙ্গলে পদ্মপলাশলোচনহরি থাকে?" স্বীকার করিলাম জানি, কিন্তু পদ্মপলাশলোচনহরি আমাদের কি কাজে লাগিবে এবং কাজে লাগিলেই বা তাহাকে পাওয়া যায় কোথায়? ধ্রুবের উপাখ্যান পড়িয়া পদ্মপলাশলোচনের কি করিয়া সন্ধান করিতে হয়

জানি। কিন্তু সে সময় আমি যেরূপ ক্ষুৎ পিপাসায় পীড়িত তখন পদ্মপলাশলোচনের উপর ভরসা রাখিতে পারা কঠিন।

পরাণদা বলিল—"এই মাণ্‌কে চোখ বুজে বসে যা, যেমন ক'রে ধ্রুব ব'সেছিল, ছবিতে দেখেছিস্ ত? তুই আমার পেছুতে বোস্ কেননা আগে বাঘ আসবে, তারপর ভীষণ অজগর আস্‌বে, তারপর নারদমুনি, তারপর পদ্মপলাশলোচন হরি।" পরাণদার পশ্চাতে চোখ মুদিয়া হাঁটু গাড়িয়া ধ্রুবের কায়দায় বসিলাম। পরাণদার পশ্চাতে থাকিলে বাঘ বা সাপ প্রথমে আমার কাছে আসিবে না জানিয়া খানিকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। পদ্মপলাশলোচন আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না। নারদ আসিলেই চলিবে মনে মনে করিয়া দুই ভাইয়ে 'কোথায় পদ্মপলাশ-লোচনহরি আছ দেখা দাও দেখা দাও' বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কতক্ষণ ঐরূপে ডাকিয়াছিলাম জানিনা, খুব সম্ভব ১০।১৫ মিনিটের বেশী নহে। কিন্তু মনে হইতে লাগিল অনন্তকাল ধরিয়া পদ্মপলাশ-লোচনকে ডাকিতেছি কিন্তু পদ্মপলাশলোচনের এখনও দেখা নাই। ধ্রুবর বেলায় কিন্তু পদ্মপলাশলোচনহরি এত দেরী করে নাই। এমন সময় খড়্ খড়্ খস্ খস্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল সেই শব্দ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরাণদা চুপি চুপি বলিল—"মাণ্‌কে শুনছিস্ এবার বাঘ আস্‌ছে।" সেকি? সত্যই বাঘ আসিতেছে? আমার বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল। কোনরূপে ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিলাম, "পরাণদা আর পদ্মপলাশলোচনকে ডেকে কাজ নাই।" পরাণদা "ডাক্ আর না ডাক্ এখন বাঘ ত এসে গেছে—?" এসে গেছে? দেখিলাম সত্যই সত্যই এক বিরাটকায় ব্যাঘ্র গাছপালা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আমাদের দিকে আসিতেছে। "ওরে বাবারে খেলেরে' বলিয়া উভয় ভ্রাতায় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম। কতখানি দৌড়াইয়াছিলাম জানি না। দৌড়াইতে দৌড়াইতে উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি।

যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল তখন দেখি মনোদি আমাদের চোখে জলের ঝাপটা দিতেছে ও কাঁদিতেছে। মাসীমা ও আর আর দর্শকবৃন্দও কাঁদিতেছিল কিন্তু মনোদি, যে কোনদিন বাড়ির বাহির হয় না, সে সকল লজ্জাকে তুচ্ছ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়ছে। মূর্চ্ছাভঙ্গে আমরা মনোদির বাড়ীতে গেলাম। মনোদি কিছুতেই আমাদের বাড়ীতে আমাদিগকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইল না। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া আর আমাদিগকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য সেদিন কেহ পীড়াপিড়ি করে নাই। সেদিন মনোদির কৃপায় মামার মার হইতে রেহাই পাইলাম! বাঘ আমরা দেখি নাই। কেষ্ট গোয়ালার কাছে শুনিলাম তাহার লাল একটি গরু দেখিয়াই নাকি আমরা ভয়ে ছুটিয়াছিলাম। কারণ কেষ্ট নিজে গরু চরাইতে যাইয়া আমাদের ঐরূপ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে খাখে। কিন্তু আমরা সেই দিন দুই ভাই ঐ গরুটিকে কিছুতেই গরু বলিয়া বিশ্বাস করি নাই—কারণ স্বচক্ষে দেখা বাঘ কি আর গরু হইতে পারে?

আর একদিন মনোদি সকল লজ্জা তুচ্ছ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া মামার কবল হইতে আমাদের উদ্ধার করে। এই দুইদিন মাত্র মনোদি বাড়ির বাহির হইয়াছিল আর কখনও তাহাকে নিমন্ত্রণ খাইতে কাহারও বাড়ীতে যাইতে দেখি নাই। আমরা বড়সারের স্কুল ছাড়িয়া তখন একটি মিসন স্কুলে ভরতি হইয়াছি। স্কুলটি অভিনব। এমন স্কুল আমি আর কোথাও দেখি নাই। মাইনর স্কুলের মান যতদুর, ততদুর খুব সম্ভব পড়ানর ব্যবস্থা ছিল। ফাদার মরিয়ট্ এবং মিসেস্ মরিয়ট্ নামে দুইজন ইউরোপীয় পুরুষ এবং মহিলা ব্যতীত আর আর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী দেশীয় খৃষ্টান ছিলেন। বালকবালিকা একসঙ্গে পড়িত। পড়াশুনা মন্দ হইত না। বাইবেলের ক্লাসে বড় মজা হইত। আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীকে ডাইরী রাখিতে হইত। প্রাতঃকাল হইতে শয্যাগ্রহণ

করিবার সময় পর্য্যন্ত যে সব কাজ করিতাম তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া মিস্ সরকারকে দেখাইতে হইত। বাইবেলের ক্লাসে মিসেস্ মরিয়ট এবং মিস সরকার থাকিতেন। সকল ক্লাস জড়াইয়া আমরা ৪০।৫০ জন ছাত্রছাত্রী পড়িতাম। ঐ স্কুলে খৃষ্টান করিয়া দিবে এই ভয়ে কেহ ছাত্র ভরতি করিতে রাজী হইত না। ফাদার মরিয়ট এবং মিসেস মরিয়ট দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করিতেন এবং ছাত্রছাত্রীদের নানাবিধ উপহারে প্রলুব্ধ করিতেন। বাইবেলের ক্লাস ব্যতীত কখনও কোন ছাত্রছাত্রীকে তিরস্কার করা হইত না।

একদিন বাইবেলের ক্লাসে মিস্ সরকার বলিলেন "যীশুর মত ভাল দেবতা তোমাদের নাই। কারণ যীশুই সর্বপাপ ত্রাণ করিতে সক্ষম।" পরাণদা এ কথায় সায় দিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "আমাদের ঢের ভাল এবং জাগ্রত দেবতা আছে"।

মিস সরকার—কি বলিতেছ?

পরাণদা—বলিল "কালী খুব জাগ্রত এবং ভাল দেবতা।" পরাণদার কথায় মনে হইল মিস্ সরকার বুঝি বা মুর্চ্ছাগ্রস্থ হইয়া পড়েন, একরূপ চোখমুখের ভঙ্গী করিয়া মিস্ সরকার বলিলেন—"যীশু তোমার অপরাধ মার্জনা করুন—তোমার দেবতা ভাল দেবতা নয় এই স্কুলে আর ঐ দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে না।" পরাণদা বলিল "আরে—ভাল দেবতা নয়? দেখেননি কখনও তাই বলছেন—ফি অমাবশ্যায় পাঁটা পড়ে।" বজ্রপাৎ হইলে মিস্ সরকার এত অভিভূত হইতেন না, পরাণদার কথায় যেমন হইলেন। মিসেস মরিয়ট বলিলেন—"শুন প্রাণকেষ্টো ঐ দেবতা ঠিক আছে না, বড় অসভ্য আছে উহা চক্ষে দেখাও পাপ।" একদিকে মিস্ সরকার ও মিসেস্ মরিয়ট্ এবং অপর দিকে পরাণদা ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের দেশীয় স্কুল হইলে পরাণদার সেদিন আর পৃষ্ঠে চর্ম বলিয়া পদার্থ থাকিত না কিন্তু খৃষ্টান স্কুলগুলি

ঐ বিষয়ে সহিষ্ণুতার আদর্শ স্থল। মিস্ সরকারও মিসেস্ মরিয়ট পরাণদার অপরাধের জন্য বিশুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, আর পরাণদা বলিল "এ যে সে কালী নয়, ঐ কালীর নিন্দা ক'রে কেউ কোনদিন পার পায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে মুখে রক্ত উঠে হ্যাঁ—বাছাধনদিকে আর 'মা' বলতে হয় নাই।"

ঐ স্কুলে আমি, পরণদা ও আমাদের এক প্রতিবেশী কন্যা শোভনা পড়িতাম। একটি পাল্কি গাড়ীতে আমরা তিনজনে স্কুল যাইতাম। গাড়ীতে চাপিয়াই আমরা তিনজনে মিলিত কণ্ঠে গান ধরিতাম। শোভনাদের একটি কলের গান ছিল। তখন গ্রামোফোনের নাম আমরা কলের গানই জানিতাম। কলের গানের গানই আমরা গাহিতাম। সেদিন শোভনা বলিল আজ এই গানটা ধরা যাক্ মাণিক্। এই বলিয়া "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো" সুর ধরিল। পরাণদা বলিল "ও সুর ঠিক হয় নাই।" শোভনা বলিল 'না এইটাই ঠিক্।' উভয়ে বাক্‌যুদ্ধ হইতে হইতে হস্তযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শোভনা পরাণদাকে পারিবে কেন? আমি অবশ্য দুই একবার ছাড়াইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহাতে শোভনা আরও উত্তেজিত হইয়া পরাণদার হাতে এক কামড় দিল। শোভনা যুদ্ধে পরাস্ত হইবার মুখে দংশন করিয়া থাকে। পরাণদা বলিল "দাঁড়া তোর কমড়ান বার করছি" এই বলিয়া পরাণদাও শোভনার গণ্ডদেশে দৃঢ়রূপে দংশন করিল। শোভনা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল 'বাবারে গেলুম'—দেখিলাম সত্যই শোভনার গণ্ডদেশে দশনপংক্তি গভীর দাগকাটিয়া শোভনার সুন্দর মুখমণ্ডলকে নীলাভ করিয়া দিয়াছে। শোভনা উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। গাড়ী থামিয়া গেল। আমরা দুইভাই বই বগলে করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া উর্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম। গাড়ী গৃহাভিমুখে ফিরিল। আমরা ৪টার সময় হাঁটিয়া স্কুল হইতে ফিরিলাম দেখিলাম মাতুল মহাশয় মোহনবাগানের

ব্যাক গোষ্ট পালের মত দাঁড়াইয়া আছেন। পরাণদা সাম্‌নে আসিতেই দমাদম্ সুট্। মনে হইল পরাণদা আজ আর থাকিবে না 'শুধু চরণ রেখাই' বুঝি থাকিয়া যাইবে। মনোদি শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া পরাণদাকে রক্ষা করে। পরের দিন দুই ভাই সকালে উঠিয়া ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করিলাম "আর জীবনে কখনও শোভনার গণ্ডদেশে দংশন করিব না।"

—পরাণদা কাল কেমন মার হ'ল?

—আর বলিস্ না মান্‌কে বর্ধমানের রাজারও এমন হয় না।

পরাণদার ও আমার ধারণা ছিল বর্ধমানের রাজার চেয়ে আর কোন বড় রাজা হয় না এবং বর্ধমানের রাজাই প্রচুর সম্পদের মালিক, আহার্য পরিধেয় সব কিছুই সে বেশী ভোগ করে। তাই কথায় খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি কিছু ভাল হইলেই বলিতাম বর্ধমানের রাজারও এমন জোটে না। এতবড় রাজা যখন এবং তার ভাগ্য যখন সব কিছুই বেশী জোটে তখন 'মারও' যে বেশী জুটিবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? পরাণদার কথায় পরাণদার আঘাতের গুরুত্ব বুঝিতে দেরী হইল না। আমরা দুই ভাই পদ্মার ধারে বেড়াইতেছি, দেখি শোভনা আমাদের দিকে আসিতেছে শোভনার উপর আমরা ক্রুদ্ধ ছিলাম। শোভনাকে দেখিয়া কিন্তু যতটা রাগ হওয়া উচিত ছিল ততটা রাগ করিতে পারি নাই। কারণ শোভনা আমাদের কাছে অপরাধীর মত আসিয়া দাঁড়াইল। শোভনার অবস্থা দেখিয়া মনে হইল মার খাইয়াও যেন আমরা জিতিয়া গেছি। শোভনা কাছে আসিয়াই বলিল—"হ্যাঁ পরাণদা কাল তোকে খুব মেরেছে?"

পরাণদা উত্তর করিল—"মারবে না তুই ব'লে দিলি কেন?"

—"আমি কি ক'রে জানব যে তোকে অত মারবে?"

এ কথা খুবই সত্য এত মারিবে তা' শোভনা কি করিয়া জানিবে।

পরাণদা ও আমি শোভনার যুক্তি মানিয়া লইলাম। পরাণদা বলিল—"ভ্যাখ যখন তখন কামড়াস না, জোরে পারিস্ না কামড়াতে যাস্ কেন? কাল তোকে খুব লেগেছিল বুঝি তাই এসে মামাকে ব'লে দিয়েছিস্?" শোভনা স্বীকার করিল তাহাকে লাগিয়াছিল সত্য কিন্তু সে কথা সে বাড়ীতে বলে নাই, বলিয়া দিয়াছিল ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান। শোভনা যে বলে নাই ইহা জানিয়া আমাদের রাগ পড়িয়া গেল।

মনোদির বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। পাত্রটি স্বঘর এবং দ্বিতীয়পক্ষ। পাত্রটি দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও একবারে বিনা পয়সায় হইবে না তবে অন্য সব পাত্রের তুলনায় পণ কমই লাগিবে। এই জন্য এই পাত্র সকলেরই পছন্দ হইয়া গেল। পাত্র নিজে আসিয়া কন্যা পছন্দ করিয়া গেলেন। তিনি যে মনোদিকে দয়া করিয়া বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছেন সে কেবল ফণীদার পিড়াপীড়িতে এবং কচিকাচাগুলো মানুষ করিবার জন্য। গরীব দুঃখীর ঘরের মেয়ে বিয়ে করাই ভাল। বড় লোকের ঘরের অনেক বিবাহ নাকি তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন কারণ বড় লোকের মেয়েরা তাহার ছেলেমেয়েদের যত্ন লইবে না। যাক্ মনোদিকে যদি কখনও ভুলি মনোদির ভাবি বরকে কোনদিন ভুলিব না। কি যেন দেবশর্মনঃ নাম ছিল মনে নাই। বয়স ৩৬।৩৭ হইবে কিন্তু এইরূপ শীর্ণকায় ব্যক্তি আমি আর কখনও দেখি নাই। সেই পুরুষ পুঙ্গব যখন একটি বক্র যষ্টিবৎ আসিয়া হাজির হইলেন তখন আমারা দুই ভাই কিরূপ রোষপরবশ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলাম মনে পড়িলে আজও হাসি সম্বরণ করিতে পারি না। আমরা তখনই নাম করণ করিলাম "ঠ্যাঙ্গা"। মনোদি এই ঠ্যাঙ্গাকে আমাদের চেয়ে কখনও বেশী ভাল বাসিতে পারে না ইহা সিদ্ধান্ত করিতে আমাদের একটুও দেরী হইল না। মনোদি যে তাহাকে ভালবাসিতে পারে না শিশুচিত্তের এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইয়াছিল। ফণীদা একটা চাঁদার খাতা লইয়া ভগ্নীর বিবাহের

জন্য দ্বারে দ্বারে চাঁদা তুলিতে বাহির হইলেন। তাহাকে পক্ষকালের অধিক অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়াছিলাম, বুঝিবার মত বয়স তখন না হইলেও অনায়াসেই উপলব্ধি করিলাম ফণীদার চাঁদার খাতার অঙ্কপাত আশানুরূপ হয় নাই যাহাতে মনোদির বিবাহ নির্বিঘ্নে হইতে পারে। একটী ষষ্ঠী কিনিতে এরূপ ব্যয় হইতে পারে তাহা আজও আমার ধারণায় আসে না। কিন্তু সেদিন ফণীদার সমগ্র পরিবারকে কি বেদনাকুলই না দেখিয়াছিলাম। মনোদি আমাদের সহিত কথা কওয়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিলেন। কদাচিৎ দুই একবার কথা বলিতেন। সমস্ত পরিবেশ কেমন যেন একটা বেদনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন একটা থম্‌থমে ভাব ধারণ করে কতকটা যেন সেই প্রকার। আমরা মনোদির বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিলাম। হঠাৎ একদিন মনোদি আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন তৎক্ষণাৎ আমরা দুই ভাইয়ে ছুটিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মনোদি বেশ পরিপাটী করিয়া সাজিয়াছেন। এত সাজিতে তাহাকে কোনদিন দেখি নাই। মনোদির সাজ দেখিয়া বলিলাম—"মনোদি তুমি যে লক্ষ্মী ঠাকরুণ হ'য়েছ?" কিন্তু মনোদির মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জিত হইলাম কোথায় যেন কি বিপর্যয় ঘটিয়াছে। মনোদিকে দেখিয়া মনে হইল যেন সে মনোদি আর নাই। মনোদি একটি বিস্কুটের টিন হাতে দিয়া বলিলেন 'বাড়ী নিয়ে যা' এই বলিয়া ঘর ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমরা দুই ভাই হতভম্ব হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

বাড়ীতে ফিরিতেই মাসীমা বলিলেন—"ওরে হীরে যে পায়রাটা পুষেছিলি সেটা ম'রে গেছে।" একটি কপোত শাবককে অতি যত্নে পরাণদা ও আমি লালন পালন করিয়াছিলাম। আমরা ছুটিয়া গেলাম দেখিলাম মৃত কপোত শিশু পড়িয়া আছে। আমরা খুবই দুঃখিত

হইয়াছিলাম, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম্—পরাণদা বলিল "কাঁদিস না মানকে ওটাকে আমি ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে দেব।" পরাণদার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস—পরাণদা যে বাঁচাইতে পারিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মৃত পারাবত এবং বিস্কুটের টিন লইয়া আমরা দুই ভাইয়ে একটি লণ্ঠন হাতে বাগানে গেলাম। পরাণদা হলুদ বাঁটা, নানাবিধ পত্রের রস প্রভৃতি ভেষজ পারাবতের গাত্রে প্রলেপ দিতে লাগিল। আমি বিস্কুটের টিন খুলিলাম। দেখিলাম একটিন ক্ষীরের সন্দেশ এবং ক্ষুদ্র একটি পত্র। পত্রটি অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া ক্ষীরের সন্দেশের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম। দাদা কপোত শাবককে একটি গর্ত করিয়া তাহাতে রাখিল এবং উপরে কতকগুলি পাতা ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়া বলিল—"চল্ মাণকে কাল পরশুকে ওটা বেঁচে যাবে।" পরাণদাকে বলিলাম "মনোদি একটি চিঠি দিয়েছে।" পরাণদা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "এই রে—তবে বিল্লুদার মত আমাদিকেও বাড়ী যেতে বারণ করছে বোধ হয়।" পরাণদা ও আমি পত্রখানি খুলিলাম কিন্তু বারংবার পড়িয়াও উহার অর্থ কি বুঝিতে পারিলাম না। পত্রখানি সরল অথচ আমাদের কাছে খুবই দুর্বোধ্য ঠেকিল।

ভাই হীরা ও মাণিক—

কাল সকালে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না আমাকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখ করিও না। তোমরা আর দুষ্টুমি করিবে না, দুষ্টুমি করিলে যেখানেই থাকি দেখিতে পাইব। আমাকে খুঁজিও না। খুঁজিলে আমাকে আর পাইবে না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "মনোদি তোদের কোথায়"? বলিও আমি ঐ পদ্মার কোলে আশ্রয় লইয়াছি। আমি চলিলাম দেখিও তোমরা আর দুষ্টুমি করিও না।

"মনোদি"

মনোদির হাতের লেখা, কিন্তু মনে হইতেছে যেন সে লেখে নাই।

পত্র পড়িয়া দুই ভাই কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 'পদ্মার কোলে আশ্রয় লইয়াছি'-ভালই হইয়াছে। "জল কুমারী জলের নীচে মস্ত বড় বাড়িতে বাস করে। তার সোনার খাট পালঙ্ক। কত জল পরী তার সঙ্গে খেলা করে। চিংড়ী রাণীর সঙ্গে সে মধ্যে মধ্যে বেড়াতে আসে। একদিন সে বেড়াতে এসে হঠাৎ দেখতে পেলে এক রাজপুত্র দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের ধারে। জল কুমারী রাজকুমারকে দেখে ভয়ে যেমন সে জলে ডুব দেবে অমনি তার চুলের খোপা রাজকুমারের তরোয়ালের ডগায় বেধে গেল। কারণ রাজকুমার ছিল তীরে আর তরোয়ালের খানিকটা ছিল জলে। জল কুমারী আটকে গেল। জল কুমারীকে রাজপুত্র তীরে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'তুমি কে?' জল কুমারী শুধু চেয়ে রইল সলজ্জ ভীরু নয়নে। তার সখীরা উত্তর দিলে 'উনি জল দেবতার কন্যা ওর নাম জলকুমারী।' রাজপুত্র বললে 'ও যেই হোক ওকে আমি বিয়ে করব।' জলপরীরা বললে 'ওকে বিয়ে করতে হলে তোমাকে কি ক'রতে হবে জান? সাত সাগর ছেঁচে সাতটি মাণিক্ আনতে হবে। সেই মাণিক সাতটীর মালা গেঁথে যে পরাতে পারবে সেই জল কুমারীর যোগ্য পাত্র।' রাজপুত্র কত যুগযুগান্ত ধরে সাগর সেঁচেছে কিন্তু সাগরের জল আর মরছে না। আর রাজপুত্রেরও বিয়ে করা হ'চ্ছে না।" এ গল্প ত কতদিন মনোদির কাছে শুনেছি। আমরা যখন পদ্মায় স্নান ক'রতে নেমে সাঁতার কাটতুম তখন মনোদি বলতেন "উঠে পড় হীরে মানিক নয়ত জল পরীরা বিয়ে করতে চাইবে?" সাঁতার কাটা বন্ধ করিয়া ভয়ে উঠিয়া পড়িতাম। যদিও মনোদির কাছে গল্প শুনিয়া জল কুমারীদের বিবাহ করিবার ইচ্ছাই জাগিয়াছিল, কিন্তু জলপরীদের চাল-চলনের ঠিক খবর জানিতাম না বলিয়া জলপরীদের বিশেষ ভয় করিতাম। যদি কোন প্রকারে বিবাহ হইয়া যায় তবে হয়ত ঐ জলপরীদের নিকটে পদ্মার

অতল তলে নির্ম্মিত সুবর্ণ খট্টায় স্থান পাওয়া যাইবে, তবুও কোথায় যেন অস্বস্তি বোধ হইত। জলপরীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা খুবই হইত কিন্তু বিবাহ হইবে এইরূপ শুনিলেই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতাম। আমরা প্রশ্ন করিতাম "মনোদি জলপরীদের তুমি কখনও দেখেছ?" মনোদি বলিতেন "নিত্য দেখা হয় তাঁদের সঙ্গে।" মনোদির সহিত এই নিত্য সাক্ষাৎকারিণী জলপরীদের দেখিবার ইচ্ছা হইত আমার, বিশেষ করিয়া যেটি আমার বধু হইতে পারে। তথাপি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি নাই। মনোদির সঙ্গে দেখা হয় তাদের এই যথেষ্ট।

পরাণদা বলিল—"মনোদি তা হলে এতক্ষণ জল কুমারীর বাড়ীতে পৌঁছে গেছে।" জলকুমারীর বাড়ী কত খানি পথ আমাদের জানা নাই। তবে জানিতাম নিমেষে সেখানে যাওয়া যায়। দুই ভাইয়ে ঠিক করিলাম ভোর উঠিয়া পদ্মার ধারে আসিলে মনোদির সহিত, চাই কি, জলপরীদের কাহারও না কাহারও সহিত সাক্ষাৎ মিলিয়া যাইতে পারে সেই জলপরীদের মধ্যে আমার জল বধুটীও থাকিতে পারে। আনন্দিত চিত্তে পারাবত শাবককে পত্রাচ্ছাদিত রাখিয়া ঘরে ঢুকিলাম।

পরের দিন শয্যাত্যাগ করিতে বেশ একটু বেলা হইয়া গিয়াছে মনটা আপশোষে ভরিয়া গেল। আজ আর মনোদির ও জলপরীদের সাক্ষাৎ মিলিবে না তখন মনোদি অপেক্ষা জলপরীদের কথায় চিত্ত ভরিয়া আছে। মাসীমা আসিয়া বলিলেন "হীরে—ও-হীরে মনো কোথায় গেছে জানিস্?" আমি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। পরাণদার বুদ্ধি সব সময় খোলে না যদি সে ব্যাপারটা ফাঁস করিয়া দেয় তবে আর জলপরীদের সাক্ষাৎ মিলিবে না। আমার মনোদি অপেক্ষা জলপরীদের সহিত সাক্ষাৎ করা খুবই দরকার। কিন্তু মনোদিকে যদি উহারা খুঁজিয়া আনে তবে আর জলপরীদের সাক্ষাৎ

মিলিবে না। পরাণদা কিন্তু এক মজার উত্তর করিল—বলিল "জানি কিন্তু বলতে বারণ আছে।" মাসীমা বলিলেন "সে কি রে মুখপোড়া কে তোকে বলতে বারণ করছে?" পরাণদা অচল অটল, আর কথা বলে না। একে একে বহু লোক জড় হইয়া গেল। নানাবিধ উপহার এবং ঘুষের প্রস্তাব আসিল কিন্তু কোন ফলই হইল না। তখন মামা আসিয়া যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই যে আমাদের কণ্ঠ নামিত পদার্থকে টিপিয়া মারিয়া ফেলিবেন। তখন আমি বলিলাম "যাও না? সেখানে আর যেতে হয় না তোমাদের, কাল ভোরে উঠে পদ্মার ধারে এলেই মনোদিকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।"

বৌদি কাঁদিয়া উঠিলেন "কিরে মাণিক্ মনো তোদের পদ্মায় ঝাঁপ দিয়েছে?" পরানদা ও আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম বুদ্ধি বলিয়া পদার্থ ইহাদের কাহারও নাই। একটা সামান্য কথা ইহারা বোঝে না। তাই পত্রখানি আনিয়া মামার হাতে দিলাম। কান্নার রোল উঠিল। পরানদা ও আমি কাঁদিলাম না। কারণ এই ব্যাপারে কাঁদিবার কিছুই নাই। কাল সকালে মনোদির যখন সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে তখন মিথ্যা একদিনের জন্য কাঁদাকাটি করিয়া লাভ কি? পরের দিনও উঠিতে বেলা হইয়া গেল। খুবই আপশোষ হইল কিন্তু কি করিব আর একদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। বৈকালে হঠাৎ খবর, পাওয়া গেল মনোদিকে পাওয়া গিয়াছে সরদার চরে। মামা, ফণীদা ও আরও অনেকে ছুটিলেন। সরদা রাজসাহী হইতে আট মাইল, ফিরিতে তাহাদের রাত হইয়াছিল। সকালে উঠিয়া যাহা শুনিলাম তাহার মর্ম এই সরদার চরে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে মনোরমা ত দূরের কথা পুরুষ কি রমণী চেনা যায় না। অতি কষ্টে কাপড়ের পাড় দেখিয়া ফণীদা সনাক্ত করিয়াছেন মনোরমার মৃতদেহই বটে। আমরা বুঝিলাম মনোদির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পরানদা বলিল

"চল্ মাণ্‌কে পায়রাটা বাঁচল কিনা দেখে আসি—আজ তিন দিন হয়ে গেল।" অর্থাৎ ত্রিরাত্র গত হইলে পারাবত শাবক প্রাণ পাইবে এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। পরাণদার ভেষজের উপর আমার গভীর আস্থা ছিল তাই বলিলাম "চল আবার উড়ে না পালিয়ে যায়?"

পরাণদা বলিল "ইস্ যে পাতা চাপা দিয়াছি।" ধীরে ধীরে পরাণদা আচ্ছাদন খুলিল—দুর্গন্ধে সেখানে টেঁকা দায়। পরাণদা বলিল "ওরে বাঁচে নাই যে রে—দেখেছিস্ মাণকে পায়রা কি চিল্ বোঝবার পর্যন্ত যো নাই।"

৪

দীর্ঘ এক বৎসর চারিমাস পরে পিতৃদেব যাইয়া আমাকে লইয়া আসিলেন। মনোদির মতই হরিশপুরকে ভালবাসি। রুক্ষ মরুভূমির মাঝে ওয়েশীস্। গুস্‌করা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পথ হরিশপুর। গ্রাম ঢুকিতে প্রায় অর্ধমাইল বাকি আছে দেখি গোবর্ধন আসিতেছে। গোবর্ধন বলিল "কিরে মাণকে কেমন আছিস্। তুই নামবি শুনে ষ্টেসনে যাচ্ছিলুম।" গোবর্ধন আমার হরিশপুরের বাল্য সাথী। গোবর্ধন আমার পোষাক দেখিয়া বলিল—"ওকি রে মাণকে ওসব কি প'রেছিস্। তোকে দেখলে যে গাঁয়ের লোক বলবে যাত্রা গাইতে এসেছিস।" আমার পরিধানে নিকার বুকার জাতীয় প্যাণ্ট, গায়ের কোটে সাঁচ্চার বুটী, মাথায় টুপি, টুপিতে আবার পালক বসান। এই পোষাক আমি পছন্দ করিয়া পরিয়াছি। সঙ্গীদের এই পোষাক দেখাইয়া তাক্ লাগাইয়া দিব। কিন্তু গোবর্ধণের বাক্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম গোবরা বলিল—"বাড়িতে যেয়েই খুলে ফেলবি—নয়ত দুলো, বিজয়, হারু এরা সব যদি দেখে তবে তোকে আর গাঁয়ে টিক্‌তে দেবে না।"

মনে হইল এখনই পোষাকটি খুলিয়া ফেলি। গোবর্ধনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ময়লা একটী লাল পাড় ধুতি সে পরিয়া আছে তবু ও তাহাকে আমার চেয়ে বেশ মানাইতেছে।

গোবর্ধন বলিল—"তোর খবর আমি রোজ লিই। তুই ত তোর মাকে চিঠি দিস্ আর তোর মা আমাকে সেই চিঠি দেখায়। আচ্ছা মাইরী, তুই কি বোকা বল্ দিকি—তুই তোর মাকে 'আপনি' ব'লে পত্র লিখিস্ কি ব'লে? তোর নজ্জা করে না।" পত্রে মাকে 'আপনি' সম্বোধনে কি লজ্জা থাকিতে পারে বুঝিলাম না বলিলাম "কেন মাকে ত ঐ রকমই চিঠি লিখতে হয়! মনোদি ত শিখিয়ে দিয়েছে।" গোবর্ধন আমার ও আমার গুরু মনোদির বুদ্ধির তারিফ করিয়া বলিল "ওরে বোকা—বলি মা কি গুরুজন যে 'আপনি' বলে চিঠি দিয়েছিস্?" সত্যই ত মা ত গুরুজন নহে। মাকে 'আপনি' বলিয়া কি ভুলিই না করিয়াছি। লজ্জায় মরিয়া গেলাম কেবল মনোদির জন্যই এরূপ হইয়াছে বলিয়া গোবরার কাছে ত্রুটী স্বীকার করিলাম। গোবরা বলিল—"তোর ভয় নাই তোর মা কিছু মনে করে নাই।" ঐ অল্প পথের মধ্যেই গোবর্ধনের কাছে গ্রামের সব খবর জানিয়া লইলাম। বর্তমানে গোবর্ধন গাছে চড়ায় অধিকতর উন্নতি করিয়াছে। এমনকি সে দীর্ঘ তাল গাছে অনায়াসে উঠিতে পারে। অবশ্য ঐ বিষয়ে আমি কোনদিন পারদর্শী ছিলাম না, গোবর্ধন ইহা জানিত। তাই সে তাহার কৃতীত্বের কথা ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল। পড়াশুনায় সেও আমার চেয়ে বর্তমানে কম নহে। কারণ এখন সে বন্ধুবান্ধবদের সহিত ইংরাজীতেই কথা বলে। সর্বনাশ গোবর্ধনের এত উন্নতি! তাহা হইলে সহরে যাওয়া আমার পণ্ডশ্রম মাত্র। ভাল ইস্কুলে পড়িয়া ইংরাজী বলিতে পারি না। তবুও কথাটা চাপিয়া গেলাম। গোবর্ধনের প্রশ্নে উত্তর করিলাম "আমিও ইংরাজী

জানি তবে আমার সঙ্গী না থাকায় বলা হয় না।" গোবর্ধন ইংরাজীর নমুনা ছাড়িল বলিল "হাউসের (house) এর নিয়ারে (near) এ এসে গেছি ঐ ভাখ তোর মাদার ষ্টাণ্ডিং রোয়েছে।"

মা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন। মাকে দেখিয়া কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া গেলাম। মা যেন আমার পর হইয়া গেছেন। আগের মত মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিলাম না। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "এলি রে মাণিক—বেশ ভাল ছিলি ত?" উত্তর দিতে ইচ্ছা হইল—ছাই ভাল ছিলুম।" কিন্তু কেন জানি না উত্তর করিলাম "হাঁ ভাল ছিলাম।" উত্তর করিয়াই মাকে প্রণাম করিলাম। গোবরা বলিল—"এ কি রে মাইরী মাকে আবার পেন্নাম কি রে?" গোবরার কথায় মনে পড়িয়া গেল মা গুরুজন নহে তাই মাকে প্রণাম করার প্রশ্ন কোনদিন জাগে নাই। কিন্তু এখন যেন মা আমার নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছেন দূরে, বহু দূরে—মা যেন ভালবাসা অপেক্ষা সম্মান দাবী করিতেছেন। দেখিলাম রীতিমত সুবোধ ছেলে হইয়া গিয়াছি। মাকে ভক্তি করিতে হইবে সম্মান করিতে হইবে এই যেন সন্তানের কর্ত্তব্য। গোবরা এই প্রণাম করার জন্য কত ঠাট্টা করিয়াছে, বার বার প্রশ্ন করিয়াছে "মা কি গুরুজন যে পেন্নাম করলি?" উত্তর দিতে পারি নাই। মা আবার গুরুজন কিসের? সে ত মা—তাই কোন সদ্ উত্তর দিতে না পারিয়া বলিয়াছিলাম "মা যে জননী রে গোবরা তাইত পেন্নাম করলুম।" এক বৎসর চারি মাস ব্যবধানে মা জননীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। জননীর মধ্যে আমার হারাণ মাকে বহুবার খুঁজিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।

আমার ছোট বোন ছটুকে কোলে করিয়া ঠাকুমা হাজির হইলেন; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"ওরে কে এসেছে রে, ওরে আমার মাণিক রে—ওরে আমি কতদিন পরে চাঁদ মুখ দেখতে পেলুম রে"—মা

বলিলেন 'মাণিক তোমার ঠাকুরমাকে প্রণাম কর। ঠাকুমা তাড়াতাড়ি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, না না প্রণাম করতে হবে না ভাই, তুমি আমার বংশের বাতি; একাই শতেক জনা হয়ে বেঁচে থাক।' এই বলিয়া ছটুকে নামাইয়া দিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন—ঠাকুমাকে প্রণাম করিতে পারি নাই।

দাদা মহাশয় মাকে ও ছটুকে কাপড় জামা আরও অনেক জিনিষ দিয়াছিলেন। ছটুর কিন্তু সে সবে মন উঠিল না। ছটু বলিল "দাদা আমার জন্য কেন ঢেঁকি আন নাই?" আমি হাসিয়া বলিলাম "ঢেঁকি? ঢেঁকি কি কখনও বাক্সতে আনা যায়?" তা ছাড়া ঢেঁকি রাজসাহীতে পাওয়া যায় না।" ছটু আমার কথায় বিশ্বাস করিল না "এত জিনিষ পাওয়া যায় আর ঢেঁকি পাওয়া যায় না?" আমি বলিলাম "আর পাওয়া গেলেই বুঝি ঢেঁকি বয়ে আনা যায়? ছটু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল "না তা কি যায়? দেখবে আমি নিয়ে আসব মিনুদের বাড়ী হ'তে"—এই বলিয়া সে মিনুদের বাড়ী হইতে একটি ছোট্ট ঢেঁকি লইয়া আসিল। এতক্ষণে বুঝিলাম খেলিবার ঢেঁকি। ছটুকে বলিলাম "ও তাই বল্—তা আমি এখানে গাজনে কিনে দেব।" ছটু নিশ্চিন্ত হইল। ছটু বলিল "যাই দাদা আমার আবার অনেক কাজ আছে। এখুনি লাল গাইটা খুলে যেয়ে শাক বাড়ীতে মুখ দেবে।" ছটু আমাকে অবাক করিয়া দিল। মাত্র এক বৎসর চারিমাস আমি বাড়ী ছাড়া এরই মধ্যে ছটু এত কাজের হইয়াছ। বয়স ত মাত্র পাঁচ বৎসর। রাঙ্গী গাইটাকে সে আটকাবে? ছটুর সঙ্গে গেলাম, দেখি একটি লাল বাখারী শাক বাড়ীর ধারে দড়ি দিয়া বাঁধা আছে। মনে পড়িয়া গেল ছটু কোন্ গরুর কথা বলিতেছে। এক বৎসর চারিমাস পূর্বে হইলে এসব কথা ইঙ্গিত মাত্রে বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু আজ তাহা বুঝিতে দেরী হইতেছে। নাঃ এক বৎসর চারিমাস আমাকে মায়ের

নিকট হইতে ছটুর নিকট হইতে এমন কি হরিশপুর হইতে অনেকখানি দূরে সরাইয়া দিয়াছে। আমার জন্ম কত আয়োজন খাবার থাকবার কত সুন্দর ব্যবস্থা—আমার যেন কোন ক্রটী না হয়। রীতিমত এ বাড়ীতে আমি কটুম্ব হইয়া গেলাম দেখিতেছি।

গোবর্ধনের সহিত কেবল পূর্বের সহজ সুন্দর সম্বন্ধ বজায় আছে ও ঠাকুমারও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। গোবর্ধন আসিয়া বলিল "চল্ মান্কে গাঁ দিয়ে বেড়িয়ে আসি।" গোবর্ধনের সহিত বাহির হইলাম। আমি বলিলাম "চল্ গোবরা অরুণাদের বাড়ী যাই।" গোবরা বলিল "বাব্বা তাদের বাড়ী যাবার যো আছে? আর অরুণা আমাদের সাথে খেলবে মনে করিস্?"—

"কেন খেলবে না?"

"ওরে সে যে বড় হ'য়েছে। ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে খেলতে বরণ করেছে তার মা।" অরুণা বড় হইয়াছে! [illegible]ার অপেক্ষা প্রায় তিন বছর বয়স বেশী। আমার বয়স সাড়েনয় অরুণার সাড়েবার। অরুণা আমাদের খেলার সাথী। সাথী অপেক্ষা মাষ্টার বলাই উচিৎ। আমরা যে কয়েকজন বালক বালিকা হরিশপুরে একত্র খেলিতাম, বেড়াইতাম, আনন্দ করিতাম অরুণা সেই দলের নেত্রী ছিল। কারণ সেই ছিল বয়সে সর্বাপেক্ষা বড়। গাছে চড়িতে, ঢিল ছুঁড়িতে সে কোন বালক অপেক্ষা কম ছিল না। আমি বলিলাম "চল্ আমি এসেছি জানলে অরুণা ছুটে বেরিয়ে আসবে?"

"ইস্ তা আর বের হ'তে হয় না—তবে বলছিস্ চল্।"

অরুণাদের বাড়ীতে গেলাম। অরুণার মা বলিলেন "কিরে মানিক, কখন্ এলি?" অরুণার মাকে প্রণাম করিলাম। বলিলাম "অরুণা কই?" অরুণার মা উত্তর করিলেন "আর কি অরুণা ছোট আছে যে সে তোমাদের সঙ্গে ধেই ধেই ক'রে বেড়াবে? তার পাঁচ জায়গা

হ'তে সম্বন্ধ আসছে তোমরা যাও। অরুণাকে আর বাড়ীর বার হ'তে দিই না।" ক্ষুব্ধ চিত্তে বাহির হইলাম। না, হরিশপুরের সব কিছু যেন পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। অরুণাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই দেখি অরুণা আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। "কিরে মাণিক কখন এলি ?" অরুণাও দেখি মাণকে না বলিয়া মাণিক বলিতেছে চাহিয়া দেখি মাণকের পরিবর্তে মাণিকের মত অরুণার সব কিছু বদল হইয়া গিয়াছে। অরুণা আর বালিকা নাই কৈশরের সীমায় পা বাড়াইয়াছে। আগের মত আর অরুণাকে অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না। অরুণা আস্তে আস্তে বলিল "মা আমাকে আর বাড়ীর বার হ'তে দেয় না। আমি বড় হ'য়েছি এরপর শ্বশুর ঘর যেতে হবে।" 'শ্বশুর ঘর যেতে হবে' কথাটা বলিয়া অরুণা রীতিমত রাঙ্গা হইয়া গেল। অরুণা লজ্জা পাইয়াছে। অরুণার ল[illegible] বলিয়া কোন জিনিষ কখন ছিল না। লজ্জাহীনা বলিয়াই অরুণার [illegible]ম। গোবরা বলিল "অরুণা এখন ফাদার-ইন্-ল-এর হাউস যাবে (শ্বশুরবাড়ী যাবে) ও আর আমাদের সঙ্গে খেলবে না।

অরুণা বলিল "খেলব' না কেন ? খেলতে যে দেয় না। আমার বুঝি খেলতে ইচ্ছে করে না ?"

অরুণার খেলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অরুণাকে খেলিতে দেয় না। এ জীবনে তাহার খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। অরুণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে আর অরুণার সহিত দেখা হয় নাই। তারপর প্রায় বিশ বৎসর পরে অরুণাকে দেখি। অরুণার মা একটি বিধবা তরুণীকে সঙ্গে লইয়া আমার কাছে হাজির হইয়া বলিল "একে চিনতে পারছিস মাণিক্" ? মূহুর্তে চিনিলাম অরুণা। অরুণা আমাকে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিতেছে। অবাক হইয়া গেলাম—অরুণা আমাকে নমস্কার করিতেছে। অরুণার মা বাললেন "বাবা এর একটা গতি করতে হবে তোমাকে, আমি

গরীব মানুষ তার উপর মেয়েটা ঘাড়ে পড়েছে।” কি করিতে হইবে বুঝিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম। অরুণা আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। “এই বলছিলুম বাবা কল্‌কাতায় ত কত ঝি রাঁধুনি লোকে রাখে তা অরুণাকে—” একটি দগ্ধ লৌহশলাকা কে যেন আমার কাণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। আমি বলিলাম “কি ব’লছেন জ্যাঠাই মা? অরুণা কল্‌কাতায় রাঁধতে যাবে?”

—আর যাবে না ত কি করবে বাবা?

কেন? ওর কি শ্বশুর বাড়ীতে কিছুই সংস্থান নাই? আমি যে শুনেছিলুম জ্যাঠামশায় বেশ খরচ করে ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন।

—সবই অদৃষ্ট বাবা, সবই অদৃষ্ট। ওর আর কি কিছু আছে বাবা, নলিনের যখন অসুখ হয় তখন সবই যে ভাইয়ের নামে লিখে দেয়। কারণ অরুণার ছেলেপুলে হল না। স্বামীর অবর্তমানে অরুণা সম্পত্তির মর্যাদা না বুঝে যদি দান বিক্রয় করে?

ও—সম্পত্তির মর্যাদার জন্য অরুণার মর্যাদার প্রয়োজনটা তাদের দেখবার প্রয়োজন হয় নি, এই ত? তা এখন দেবরঠাকুর মশায় বুঝি ঐ সম্পত্তির মধ্যে অরুণাকে একটু জায়গা দিতে পারলেন না?

না—তারা তাড়িয়ে দেয় নি। তবে জান বাবা অরুণা আর সেখানে থাকতে পারবে না। দিন রাত গরুর মত খাটে তাতে তাদের মন পায় না এরপর গায়ে হাত তুলছে।

—কাজ না করলে মারছে অরুণা?

অরুণা সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল। অরুণার নিকট যাহা শুনিলাম তাহার মর্ম এই অরুণার যাহা কিছু ছিল অলঙ্কার, নগদ টাকাকড়ি সব তাহারা কাড়িয়া লইয়াছে। দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পর্যন্ত দেয় না। দিবারাত্র তাহার জা ও দেবর গালাগালি করে। এখন আবার মধ্যে মধ্যে মারিতেছে।

অরুণার দিকে চাহিলাম। অরুণা এখন আমার খেলার সাথী নহে—করুণাপ্রার্থী নারী। অরুণাকে বলিলাম "তাইত অরুণা, যে কাজের ভার দিয়েছ তা'ত আমি পারব না?" মনে মনে ভাবলাম অরুণার আমি কোন উপকারই করিতে পারিব না।

অরুণার মা বলিলেন "সে কি বাবা তুমি হলে পরোপকারী ছেলে তুমি পারবে না ত কে পারবে? অনেক লোক ত কল্‌কাতায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে কিন্তু সোমত্ত মেয়েকে কি আর যার তার সঙ্গে পাঠাতে পারি?" বিজ্ঞের মত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম "তা কি আর যার তার সঙ্গে পাঠান যায়?" পাঠান ত যায় না, কিন্তু কি করা যায়। কোন উত্তরই খুঁজিয়া পাইলাম না। অরুণা তাহার রূপ যৌবন এবং বংশ মর্যাদা লইয়া উপবাস্ করুক, লাঞ্জনা সহ্য করুক্ আর আমরা হিতবাক্যের প্রলেপ দিয়া তাহাকে ক্ষণিক সান্ত্বনা দিতে থাকি। তাহা হইলেই কর্তব্য শেষ হইয়া গেল? আমি বলিলাম "অরুণাকে দুপুর বেলায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিও জ্যাঠাইমা কি করতে পারি দেখব'খন্।"

অরুণা দ্বিপ্রহরে আমার নিকট আসিল। আমি বলিলাম, "বোস অরুণা—সত্যই কি তুমি কলকাতায় রাঁধতে যেতে চাও?"

অরুণা দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল "তাছাড়া আর উপায় কি মাণিক্? পেটত আর কারও কথা শুনবে না?"

—তুমি কত দূর লেখা পড়া শিখেছ?

—সেই ত পাঠশালে যা পড়েছি তারপর কি আর চর্চা করেছি কিছু, প্রায় সব ভুলে গেছি।

—তুমি চরকা কাটতে পারবে?

—তা শিখিয়ে দিলে পারব।

—বেশ, আমি যে কদিন আছি এসে এসে শিখে যাবে?

অরুণা নিরুত্তর।

—কি আসবে না ?

—লোকে কি বলবে ?

—অর্থাৎ তুমি পেটে খেতে পাও কিনা লোকে তা দেখতে পার্বে না আর যত নজর তুমি আমার কাছে এসে চরকা কাটা শিখলে ? তাতে লোকে কি মনে করবে না করবে সে তোমার দেখবার প্রয়োজন নাই তুমি নিয়মিত এসে চরকা শিখে যাবে।

—বেশ মাকে সঙ্গে নিয়ে আসব ?

—হ্যাঁ যাতে তোমার চরকা শেখা হয় তাই করতে হবে।

—কিন্তু তাতে কি পেট ভরবে ?

—না তা ভ'রবে না। বাকি খরচ আমিই ব্যবস্থা করে দেব ?

—তুমি খরচ দিলে লোকে কথা কইবে। জান ত আমাদের দেশের লোক্‌কে ?

নাঃ এ সমস্যার আর সমাধান নাই। অরুণাকে বাঁচান আমার সাধ্যাতীত।

—তা লোকে নিন্দে ক'রবে, করুক্ গে ?

—ছি মাণিক, তা হলে কি নিয়ে বাঁচব ? ঐ সুনামটুকু নিয়েই ত বেঁচে আছি।

অরুণার আমি কোন উপকার করিতে পারি নাই। কয়েকটা টাকা দিয়া সেদিন আমার কর্তব্য শেষ করিয়াছিলাম। আর অরুণা আমার প্রস্তাবে রাজী হইলেই বা কি হইত ? সহস্র অরুণা সমাজে পুড়িয়া মরিতেছে কে তাহাদের দেখিবে ? আমি ভাবিতাম দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি দেশের এবং দশের সেবা করিব কিন্তু হায়, অরুণার ঘাটে আসিয়া আমার ক্ষুদ্র তরণী ফুটা হইয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম যেমন করিয়া হউক অরুণাকে দুঃখ সাগরে আর সাঁতার কাটিতে দিব না তাহাকে এই সাগর পার করিবই। কিন্তু অরুণার দুঃখ ত দূরের কথা

আমি যদি সাহায্য করি তাহাও অরুণার দুঃখের কারণ হইবে। দুনিয়ার সব কিছু চেষ্টা করিলে করা যায়, যায় না অরুণাদের দুঃখ দূর করা।

আবার পূর্বের কথায় ফিরে আসা যাক্‌। গোবরা বলিল "চল্ মাণ্‌কে এখন অরুণা আর হাউসের আউট (বাড়ীর বার) হয় না। ব্রাইড্ গ্রুম (বর) আসবে কিনা? ওরে শুনেছিস্ মাণ্‌কে আমাদের গাঁয়ের জমীদার এসে এখন এখানে আছে—বাব্বা তাদের তে-সীমানায় যাবার বো নাই। যাবি দেখ্‌তে?" যাহার ত্রিসীমানায় কেহ যাইতে পারে না সেখানে আমরা কেমন করিয়া যাইব? গোবরা বলিল "হ্যাঁ আমাদিকে আটকায় এমন ব্যাটাছেলে আছে? তুই মাইরী রাজসাই যেয়ে একেবারে বোকা হয়ে গেছিস? যাস্ না সেখানে?" গোবর্ধনের বাক্য অস্বীকার করিতে পারিলাম না। রাজসাহী হইতে ফিরিয়া আর পুরাণ দিনকে ফিরিয়া পাইতেছি না। বলিলাম "চল্ যাওয়া যাক্"।

গোবর্ধন ও আমি জমীদার বাড়ী গেলাম। ইতিপূর্বে এই জমীদারকে কখনও দেখি নাই। এঁরা সপরিবারে কলিকাতায় থাকেন এইরূপই শুনিয়াছি। গোমস্তা ও দুই একজন দারোয়ান এই বাড়ীতে থাকিত। জমিদারের নাম মধুসূদন ভট্টাচার্য বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ। জমীদার মহাশয় কাছারীতে বসিয়া গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজাইতেছেন। বহু নর-নারী ঐ গান শুনিতেছে। হরিশপুরের লোক ইতিপূর্বে গ্রামোফোন দেখে নাই। তাহারা এই অত্যাশ্চর্য কল হইতে গান শুনিয়া অবাক হইয়া বসিয়া আছে। একটি রেকর্ড বাজান শেষ হইতেছে আর গোমস্তা তিনকড়ি মণ্ডল সমাগত নরনারীকে বলিতেছে যে "শুনছিস ঐ বাক্সোটার মধ্যে বিড়ালছানা পোরা আছে ভেতর থেকে মিউ মিউ ক'রে গান করছে" এই অভূতপূর্ব যন্ত্রে বিড়াল ঢুকিয়া মিউ মিউ করার পরিবর্তে গান করিতেছে শুনিয়া ইহারা আরও অবাক হইয়া যাইতেছে। একজন প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ বা সত্যিই ওর মধ্যে বেরাল আছে?

জমীদার স্মিত হাস্যে গোমস্তার কথা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেছে।

—তা বেরালে কি করে গান করছে?

গোমস্তা তিনকড়ি উত্তর করিল "হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ কলের মধ্যে পুরে দিলে তুইও গান করবি?"

তিনকড়ির কথায় আমার হাসি পাইল আমি বলিলাম "না বেরাল থাকৃতে যাবে কেন ওর ভিতর—ওত কল, ওর মধ্যে দুটো কল ঘুরছে এবং স্প্রিংএ ঘোরাচ্ছে।"

—"কে হে ফচ্‌কে ছেলে খু-উ-ব যে কলের ব্যাখ্যান হচ্ছে?" এই বলিয়া তিনকড়ি আমার দিকে চাহিল। "ও তুমি, তুমি কবে এলে চাঁদ, এই-যে দুটি জোড় মাণিকেই হাজির। এরপর গাঁয়ে আর পিয়ারা গাছে পিয়ারা থাক্‌বে না বাবু।" তিনকড়ির কথায় আমি লজ্জায় মরিয়া যাইবার মত হইলাম। এক বৎসর চারিমাস পূর্বে এই কথাকে আমি কিছুই মনে করিতাম না কিন্তু এখন যেন ঠিক একথা বরদাস্ত করিতে পারিলাম না, বলিলাম "কলের ভেতরটা দেখেছ কখনও তিনুকা?" তিনকড়ি জ্বলিয়া উঠিল বলিল "ওঃ ছেলে যে দুদিন সহরে থেকে লায়েক হ'য়েছে দেখছি? শুনছ গো তোমরা ছোট মুখে কেমন বড় কথা কইতে শিখিয়েছে সহরের মাষ্টাররা?" সকলে এক বাক্যে সায় দিল ইহা অন্যায় বই কি। গোমস্তার চেয়ে কে আর বেশী ঐ সব কলের তত্ত্ব রাখিবে।

জমীদার মধুসূদন ভট্টাচার্য এতক্ষণ কোন উত্তর দেন নাই। তিনি সকৌতুকে প্রশ্ন করিলেন "তোমার নাম কি খোকা?

—মণীমোহন চট্টোপাধ্যায়

—তোমার বাবার কি নাম

—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

ও—তুমি হরিদাসের ছেলে? তা কোথায় থাক তুমি? তোমাকে ত এখানে দেখি নাই এর আগে?

—আমি রাজসাহীতে থাকি।

বেশ, বেশ বাবা, ওরে-ও খোকা ওরে শুনে যা এই দেখ এর সঙ্গে যাবি। গাঁয়ে একটা ভদ্রলোকের ছেলে নাই যে খোকা একটু কারও সঙ্গে মেশে। এখানে এসে যত সব ছোট লোকের ছেলের সঙ্গে মিশে ছেলেটা বেহেট্ হয়ে গেল।

গোবর্ধনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "এই—এই—ব্যাটা আবার এসে জুটেছিস্! যা এখান হতে যত সব ছোট লোকের ছেলে দিলে খোকার মাথাটা খেয়ে—"

গোবর্ধনের প্রতি ঐরূপ সম্বোধনে হতবুদ্ধি হইয়া কি করিব ভাবিতেছি পশ্চাতে চাহিয়া দেখি গোবর্ধন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

খোকা আসিয়া হাজির হইল; আমাদের বয়সী একটি সুদর্শন বালক।

আমাকে জমীদার বাবু এইরূপ আপ্যায়িত করায় তিনকড়ি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল "বাবু, সব একই গাছের ছাল এখন তো ছিম্‌ছাম দেখছেন দুদিন থাকতে থাকতে গুণ প্রকাশ পাবে।" আমার পরণে চমৎকার মিহি শান্তিপুরে ধুতি ও আদ্ধির পাঞ্জাবী ও পায়ে বার্ণিশ করা চটী জুতা।

খোকা আসিয়াই আমার কাছে হাজির হইল। আমাকে প্রশ্ন করিল "কি নাম ভাই তোমার?" আমার নাম বলিলাম। খোকা বলিল "তোমার ডাক্ নাম নাই? আমার দুটো নাম আছে। একটা হ'ল খোকা সেটা ডাক নাম, আর একটা কল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য্য।"

আমি বলিলাম "আমাকে সবাই মাণিক্ ব'লে ডাকে।"

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই খোকার সহিত ভাব হইয়া গেল। আমরা দুইজনে কাছারী বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। গোবর্ধন চলিয়া গিয়াছে তাই মনটা বেশ ভাল নাই। এমন সময় গোবরা ডাকিল

"হিয়ার হিয়ার হ্যাজ" (এখানে এখানে আছি)। গোবরার কাছে আসিতেই গোবরা খোকাকে দেখিয়া বলিল "কি ল্যাণ্ডলর্ডস সান যে?" (জমিদারের ছেলে যে)?

খোকা বলিল "আমাকে দেখলেই ও সব কথা বল কেন গোবর দা?"

"আর তবে কি বলব? তুই ত ল্যাণ্ডলর্ডের সান তাই বলেছি।"

"আমার বড় দুঃখ হয় তুমি একথা বললে গোবর দা—"

"ও ইজ্ সরি তবে—নট সে (দুঃখ হলে বলবো না) তোর মত তোর ফাদার নয়। তোর ফাদার ভেরী ব্যাড—(তোর বাবা ভারী বদ্)"

আমি বলিলাম—"গোবরা ওসব কথা বলতে নাই।"

গোবরা বলিল "ওঃ বাবুকে খুব খাতির করেছে কি না?"

খোকা বলিল "বলুক্ গে, গোবরদা অমন বলে। ওতে আমার রাগ হয় না। আমি বলে বাড়ী হ'তে বের হ'তে পাই না আমার বুঝি খেলতে ইচ্ছে করে না? বাবার খালি এক কথা 'সবাই ছোটলোকের ছেলে।' ভাগ্যিস্ তুমি এসেছ তাই বের হ'তে দিল আজ।"

গোবর্ধন বলিল "জমিদার সন্ (পুত্র) আছিস্ আপনার হাউসে (ঘরে) আছিস্, আমাদের সঙ্গে মিশতে হ'লে আমাদের মত চ'লতে হবে।"

—সে ভাই গোবরদা আমাকে যা করতে বলবে তাই করব।

গোবর্ধন অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিল "তোকে একটা ওয়ার্ক (কাজ) করতে হবে, পরে বলব এখন। আজ আবার বেশীক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকলে আর তোকে বেরুতে দেবে না।"

খোকা মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল গোবর্ধন যাহা বলিতেছে তাহা ঠিক, সেইজন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষুন্নমনে বিদায় লইল।

গোবর্ধন ও আমি বাড়ী ফিরিলাম, ঠাকুরমা আমাকে দেখিয়া সশঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "কোথায় গেছিলি মাণিক? হরি যে তোকে

খুঁজছে। তোকে দেখতে না পেয়ে রেগে আগুণ।” গোবর্ধনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন “যা যা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে কোথাকার? বাছাকে নিয়ে টং টং করে রোদে রোদে ঘোরা হচ্ছে। মারতে হয় অমন ছেলের মুখে ঝাঁটা মরণ আর কি?” গোবর্ধন অবশ্য ঠাকুরমার প্রিয় কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। ঠাকুরমার প্রথম প্রিয় সম্বোধনেই সে সরিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুরমা বলিলেন, “যা বাবা দাঁড়িয়ে আছিস কেন ঘাটে হাত পা ধুয়ে এসে কিছু খেয়ে পড়তে বোসগে যা ভয় নাই আজকে তোর বাপকে কিছু বলতে দেব না। বাছা আমার কতদিন পরে বাড়ী এসেছে একদিন না পড়লে যেন রাজ্য অচল হয়ে যাচ্ছে—পড়বেই ত পড়তেই রাজসাহী গেছল? পড়ে পড়ে বাছা আমার শুকিয়ে গেছে।” ঠাকুরমার সান্ত্বনা বাক্যে খুব একটা স্বস্তি পাইলাম না। পিতৃদেবের উদ্ধত ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সব বাক্য বলিতেছিলেন তাহাতে ক্রোধ উপশম হওয়া দূরে থাক্ ক্রোধ বৃদ্ধির সহায়ক তা যে কোন বালকই বুঝিতে পারিবে।

সেদিন অবশ্য পিতৃদেব কিছু বলিলেন না। পরের দিন সকালেই আমাকে ডাকিয়া বললেন “ভাল করে পড়বি। রাজসাহী যেয়ে যে সব কীর্ত্তি ক’রে এসেছ তাতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে আমার; তোমার মামা তোমাদের কিছু না ব’লে ছেড়ে দিয়েছে আমি হ’লে হাড় একদিকে আর মাংস একদিকে করে ছেড়ে দিতুম।” যে সকল গুরুজন “তুই” বলিয়া কথা বলেন তাঁহারা প্রায় তিরস্কারের সময় “তুমি” কখনও “আপনি” প্রভৃতি সাধু বাক্য প্রয়োগ করেন। এই বাক্য প্রযুক্ত হইলে ভুক্তভোগী উপদেষ্টার ক্রোধের মাত্রা কিরূপ তাহা বুঝিতে পারে। মাতুল মহাশয় বহুবার আমাদের বলিয়াছেন “আজ্ঞে আপনাদের কোথায় যাওয়া হয়েছিল’, “আজ আর না ফিরলেই পারতেন” ইত্যাদি। অতএব পিতৃদেবের তুমি সম্বোধনেই বুঝিলাম হাড় এবং মাংস আলাদা না করিলেও করা যে একান্ত

দরকার তাহা মানিয়া লইলাম বলিলাম—"না আর কোন অন্যায় কাজ কখনও করব না।"

—হ্যাঁ মনে থাকে যেন? আর গোবরার সঙ্গে যদি মিশেছ তা হলে—

মনে মনে বুঝিলাম হাড় মাংস পৃথক করিবার পর প্রাণ বলিয়া যে পদার্থ টুকু অবশিষ্ট থাকে তাহার সমাপ্তি ঘটাইবেন। উত্তর করিলাম "গোবরার সঙ্গে জীবনে মিশব না।"

—"খবরদার গোবরার সঙ্গে মিশবে না। দুদিনের জন্য এসে আর আমার মার ধর করবার ইচ্ছা নাই।"

অ্যাঃ দুদিন! দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা! তবে যে ঠাকুরমা বলছিলেন 'তোর বাপ্ কালই চলে যাবে!' পিতৃদেবের দুইদিন থাকিবার ইচ্ছা শুনিয়া আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। পিতৃদেবের নিকট হইতে কোন রূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বই লইয়া সুবোধ বালকের মত পড়িতে বসিলাম।

উঃ—উঃ—উঃ— গোবর্ধন বাহির হইতে দুইহাত মুটা করিয়া ফুঁদিয়া বংশীধ্বনি সহকারে ডাকিতেছে। বংশীধ্বনি করিলে রাধিকা ছুটিয়া ঘরের বাহির হইত। প্রেমে পাগল হইয়াই বাহির হইত না আয়ানের সন্দেহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ছুটিয়া কৃষ্ণকে বংশীধ্বনি না করিতে বলিবার জন্য যাইত তাহা রাধিকাই জানে। কিন্তু আমি যদি গোবরাকে এখন বংশীধ্বনি করিতে নিষেধ না করি তবে উত্তরোত্তর মুষ্টিমধ্যে ফুঁ দিতে থাকিবে উঃ—উঃ—উঃ—

না বারণ করিতে হবে, দুটো দিন বইত নয় গোবরাকে আমার কাছে আসিতে নিষেধ করিতে হইবে। গোবরাকে নিষেধ করিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইয়াছি দেখি পিতৃদেব সম্মুখে উপস্থিত।

—"কিরে প'ড়তে প'ড়তে কোথায় যাচ্ছিস্?"

—"দ্যাখ না বাবা, গোবরা কেমন বদমাইস বাইরে হ'তে আমাকে উঃ—উঃ— ক'রে ডাকছে।"

পিতৃদেব হাসিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গোবরা জানালার ধার হইতে চুপিচুপি বলিল "কিরে মাণকে রিডিং ইজ (পড়া হ'চ্ছে) বুঝি? আমিও বুক (বই) গুলো ব্রিং করবো? ওয়ান উইথ রীড করা যাবে? (এক সাথে পড়া যাবে।)

সর্বনাশ গোবরা বই এনে প'ড়তে বসলে আর বাঁচাও আছে? ইঙ্গিতে হাত নাড়িয়া বলিলাম—"না না তুই পালা" এবং পিতৃদেব যে পছন্দ করেন না তাহাও ইসারায় বুঝাইলাম।

—"ও তোর ফাদার ভেরী বিটহাট্টা (তোর বাবা বড় মারহাট্টা) মাইরী—" এই বলিয়া গোবর্ধন ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

গোবধন মাতৃহীন। গৃহে তাহার বিমাতা। বিমাতার চারটি পুত্রকন্যা। গোবর্ধনের পিতা যজন যাজন করিয়া কোন রূপে কায়ক্লেশে সংসার নির্বাহ করেন। গোবর্ধনের পিসীমার উপর সংসারের সকল দায়িত্ব অথচ তাঁহার মুখরা ভ্রাতৃজায়ার উপর গোবর্ধনের পিসীমার কোন কর্তৃত্ব খাটে না। গোবর্ধন বেশীর ভাগ সময় বাড়ীর বাহিরে বাহিরে কাটায়। তাহার পিসীমারও ইচ্ছা সে যত বাড়ীতে কম থাকে ততই ভাল। কারণ বিমাতার অবহেলা পিসীমা সহ্য করিতে পারেন না, প্রতিকারও করিতে পারেন না। গোবর্ধনের মা কবে মারা গিয়াছে গোবর্ধন জানে না। পিসীমাই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। গোবর্ধনের পিতা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। সংসারে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে কিছুই লক্ষ্য করেন না। যাহা কিছু সাংসারিক অভাব অভিযোগ তাহার দিদি মানদা ঠাকুরাণীকে দেখিতে হয়। সেইজন্য সব সময় মানদা ঠাকুরাণীও গোবর্ধনকে লক্ষ্য রাখিতে পারে না। গোবর্ধনের মত স্বাধীন ছেলে হরিশপুরে আর একজনও ছিল না। সারাদিন এর বাড়ীতে ওর বাড়ীতে ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফেরে। দিনের মধ্যে কোন ফাঁকে একবার আসিয়া ভাত খাইয়া যায়। গোবর্ধনের মত ব্যক্তি-স্বাধীনতা গ্রামের কোন বালকের ছিল না। সেইজন্য সকল

ছেলেই গোবর্ধনের স্বাধীনতাকেও ঈর্ষা করিত। আমরা চাহিতাম গোবর্ধনের মত আমরাও সারাদিন বাড়ীর বাহিরে থাকি। বাড়ী যেন আমাদের জেলখানা। গোবর্ধনের যেমন নিজের বাড়ীতে স্থান ছিল না তেমনি অন্য কাহার বাড়ীতেও তাহার আশ্রয় ছিল না। যাহার বাড়ীতেই সে যাক্ সেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। "বয়াটে ছেলে এসেছে আমাদের ছেলের মাথা খেতে ইত্যাদি" গোবর্ধন এসব কথা ভ্রূক্ষেপ করিত না। গোবর্ধন যেন অযত্ন রক্ষিত একটি আগাছা। বিনা যত্নেও লোক চক্ষুর অন্তরালে সে বাড়িয়া চলিয়াছে। শৈশবের জীবন বন্দীর জীবন। কোন শিশুই গৃহকোণে বন্দী থাকিতে চায় না। গোবর্ধন কিন্তু মুক্ত আবহাওয়ায় মানুষ—প্রকৃতির সহিত তাহার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। গ্রামের প্রত্যেকটি গাছপালার সঙ্গে তাহার পরিচয়। দিনের মধ্যে হয়ত সাত আট ঘণ্টা গোবর্ধন কোন এক বৃক্ষের উপর কাটাইয়া দিল। গোবর্ধনের সহিত পরিচয় নাই কেবল মানুষের। তাই গোবর্ধন মানুষকে এড়াইয়া চলে। গোবর্ধন গোপালপুর স্কুলে পড়ে। গোপালপুর আমাদের হরিশপুর হইতে দুই মাইল পথ। গোবর্ধনের পিসীমা বলিয়া দিয়াছেন মন দিয়া লেখাপড়া শিখিতে তাই সে নিয়মিত স্কুল যায়। স্কুলে ছাড়া আর কোথাও তাহার পড়িবার স্থান নাই। পাঠ্যপুস্তকও তাহার সব কেনা হয় নাই এবং খাতা পেনসিলও সব তার নাই।

গোবর্ধন বাঁশী বাজাইয়া চলিয়া গেল এবং যাওয়ার সময় ইসারা করিয়া বলিয়া গেল "আমি ব্লাকবেরী ট্রিটপে (জাম গাছের উপর) থাকব এখন।" আমি নিরস পুস্তকের যখন পাতা উল্টাইতেছি গোবর্ধন তখন সরস জামের আস্বাদ লইতেছে। গোবর্ধন আর আমাতে কত তফাৎ।

বাবা আর দুইদিন থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। বীজপুরে গাজনে খুব ধুম হয়, যাহা হোক, বীজপুরের গাজন দেখিতে বাধা দেবার আর কেহ নাই। মা অবশ্য খুবই আপত্তি করিবেন কিন্তু কে তাঁহার কথা শোনে। আমাদের গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা গ্রামে একটি থিয়েটারের দল করিয়াছে, বীজপুরে থিয়েটার করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছে হরিশপুরের থিয়েটারের দলকে। তাই দিন রাত খুব ধূমধাম রিহার্সেল হইতেছে। একদিন আশু মল্লিক আসিয়া আমার ঠাকুরমাকে বলিল 'খুড়ীমা মাণিককে আমাদের দলে চাই—"জয়দেবে সে 'কৃষ্ণের' পাঠ করিবে আর 'হরিশ্চন্দ্রে'—'রোহিতাশ্ব'।" ঠাকুরমা খুসী হইয়া মত দিলেন। মা অনেক আপত্তি করিলেন ছেলে মানুষ ও এখন হ'তে থিয়েটার করিবে কি ? আশু মল্লিক ঠাকুরমাকে বুঝাইল "ও সহরে থাকে অনেক থিয়েটার দেখেছে সহজেই ও একটিং করতে পারবে" আশু মল্লিকের সহিত আমি রিহার্সেলে গেলাম। সেই খঞ্জ পণ্ডিতের "পাঠশালা"। গ্রীষ্মের ছুটিতে পাঠশালা বন্ধ—এখন পাঠশালাটি রীতিমত রিহার্সেল রুম হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

গ্রামের যুবক প্রৌঢ় অনেকেই রিহার্সেলে যোগ দিয়াছে। আশু মল্লিক হইল এই দলের নায়ক। জাতিতে স্বণবণিক, গ্রামেই থাকে সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকে। তাহার দোকানে সন্ধ্যায় একটি ক্ষুদ্র আড্ডা জমে। স্বর্ণবণিকের আড্ডায় বয়োবৃদ্ধেরা বড় একটা যান্ না কারণ যে সব লোক আড্ডাতে যায় সেখানে গ্রামের মাতব্বরদের যাওয়া চলে না। আশু মল্লিকের গ্রামে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করিয়া মহিলাদের কাছে। অলঙ্কার ভাঙ্গিতে এবং গড়িতে কিরূপ অলঙ্কার সহযোগে কথা বলিলে ব্যবসায়ের প্রসার হয় সে বিদ্যা তাহার জানা

স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক করাই মানুষের রীতি। মানুষ আবার যখন নাটকীয় অভিনয় করে তখন সে একটা অস্বাভাবিক বস্তুকে সম্পূর্ণ বাস্তব স্বাভাবিক বলিয়া আনন্দ পায়। সীতার বনবাস অভিনয় হইতেছে রামচন্দ্র সীতাকে বনে পাঠাইবার পূর্বে কতই না দুঃখ কতই না শোকের অভিনয় করিতেছে, যেন সীতার অভাবে সে একমুহূর্ত্ত বাঁচিবে না। অভিনেতা কাঁদিতেছে, অভিনেত্রী কাঁদিতেছে দর্শকবৃন্দ সাশ্রুনয়নে সীতার বিয়োগে বেদনাতুর হইয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলকে সিক্ত করিতেছে। অথচ রামও জানে সীতা বনে যাইতেছে না আর গেলই বা চ'লে, সীতা বনেই যদি যায় তাহাতে তাহার কাঁদিবার কিছুই নাই কিছু বেশী বেতন দিলে আর একটি ভাল সীতা পাওয়া যাইবে। দর্শকবৃন্দও জানে দুই টাকার টিকিট কাটিয়া সীতার বনবাস দেখিতে আসিয়াছি। যাহা সে দেখিতেছে তাহা ভীষণ অরণ্যও নহে কয়েক খণ্ড বস্ত্রে রং লাগাইয়া গভীর অরণ্যের দৃশ্যপট অঙ্কিত করা হইয়াছে আর যে সীতার বনবাস হইতেছে অভিনয়ান্তে কোম্পানীর গাড়ী চড়িয়া সে সীতা বাড়ী চলিয়া যাইবে এবং পত্নীবিয়োগবিধুর রামচন্দ্র মুখের রং মুছিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বুকিং অফিসে জিজ্ঞাসা করিবে 'আজ কত বিক্রী হল টিকিট?' আমরা অভিনয় জানিয়াও যখন একটা অস্বাভাবিক চরিত্রের নিজেদের মধ্যেই অবতারণা করি তখন একটুও তলাইয়া দেখিনা আমি বাস্তবতা ছাড়াইয়া অনেক খানি অবাস্তব ভূমিতে বিচরণ করিতেছি। আশুমল্লিক একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। মাথার চুল কাচায় পাকায় মিশ্রিত। দন্তগুলির ইতিমধ্যেই অনেকগুলি খসিয়া পড়িয়াছে। নাতিদীর্ঘ বর্ত্তুলাকার স্থূল দেহ। শ্মশ্রু গুম্ফহীন বদন ক্ষৌরকর্মের অভাবে উদ্গত শ্মশ্রু গুম্ফের দ্বারা বদন মণ্ডল সমাচ্ছন্ন। যেন একটি কদম্ব ফুল। তিনি কৃষ্ণের অভিনয় শিখাইতেছেন অর্থাৎ গান করিবার সময় কিরূপে বাঁশি হাতে করিয়া

বাঁকিয়া বাঁকিয়া বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া বঙ্কিম নয়নে চাহিতে হইবে। একই সঙ্গে এতগুলি আয়াসলব্ধ ব্যাপার এমন অনায়াসে তিনি আমাকে দেখাইতেছেন যে আমি মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছি 'আশুকাকার মত কি আমি পারব?' আশুকা নাচিতেছে আমি দেখিতেছি। রাধিকাকে ডাকিবার জন্য সংকেত ধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেমন করিয়া নাচিয়াছিল এবং জয়দেব রচিত ঐ অপূর্ব্ব সঙ্গীতের কোনও একটি চরণ ভাবাবেগে গাহিয়াছিল কি না তাহা আমি জানি না। কিন্তু সেদিন আশুকা যেরূপ রিহার্সেল ঘরে শ্রীকৃষ্ণের যে অভিনব নৃত্য মাধুরী দেখাইয়াছিল তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হইলেই আমার মানস নয়নে একটি বর্ত্তুলাকার নাতিদীর্ঘ স্থূলদেহ এবং সেই দেহের উপরিভাগে অবস্থিত একটি উদ্গত-শ্মশ্রু-গুম্ফ-যুক্ত দন্তহীন মুখমণ্ডল ভাসিয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণ নাচুক আর না নাচুক আশুখুড়ো যে আমার চোখের সামনে নাচিতেছে এখনও তাহা আমি মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

সমস্যা হইল শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা আমি লইলে রাধিকার ভূমিকা লইবে কে? যে কয়টি ছেলেকে রাধিকার ভূমিকার জন্য আনা হইয়াছে তাহাদের সকলেই প্রায় আমার চেয়ে বড়। অতএব আমার মাপের একজন রাধিকার প্রয়োজন। কে একজন বলিল "নিধি গয়লার ছেলে যুগলোকে ঠিক মানাবে।" বাক্যস্ফুর্ত্তি হইবামাত্র গোপবালক 'যুগ্লোকে' আনিবার জন্য কয়েকজন ছুটিল। অল্পক্ষণ পরেই একটি সপ্তম বর্ষীয় বেশ গোলগাল চেহারা, বালককে ধরিয়া আনিল। যুগলকে রাধিকার ভূমিকা দেওয়া হইল।

আশু গান ধরিল "চল ধীরি ধীরি ফুল তুলি বোটা কাটা টাটকা ফুলে সাজি ভর—" সাজি হস্তে একটি বালিকা কিরূপ অপূর্ব্ব নৃত্যছন্দে গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছে তাহা আশুখুড়ো দেখাইতে লাগিল। রিহার্সেল

কক্ষের অন্যান্য সকলে অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল "না, আশু না থাকলে এ পালা উৎরোন কঠিন হ'ত।" সাধারণ মানুষ কতখানি অসাধারণ হইলে আশুর মত নাচিতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায়। একজন নাতিদীর্ঘ বর্ত্তুলাকার দেহ প্রৌঢ় বালিকা রাধিকার অভিনয় শিক্ষা দিতে নাচিতেছে, ভাঙ্গা গলায় গান গাহিতেছে এবং তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইতেছে বলিয়া যখন কেহ মন্তব্য করে তখন আমি ভাবি ইহারা কি পাগল হইয়া গিয়াছে! কিন্তু দর্শকবৃন্দ মাত্রই এইরূপ অভিনব বস্তুকেই চিরকাল 'বাস্তব' (Natural) বলিয়া কতই না করতালি দিয়া থাকে। শিশির ভাদুড়ি রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া লবকে দেখিয়া—'নিল নয়ন' বলিয়া যখন লবের গালে মুখে মৃদু সোহাগ প্রদর্শন করেন এবং স্বর্ণ সীতার মূর্ত্তির সহিত মিলাইয়া নানারূপ অভিনয় করিতে থাকেন তখন দর্শকবৃন্দ করতালি দিয়া তাঁহার এই অপূর্ব্ব বাস্তব অভিনয়কে অভিনন্দন করেন। সাময়িক ভাবে মানুষ পাগল না হইলে এরূপ করিতে পারে না। যাহা হোক কয়েকদিন তালিম দিবার পর আমি ও যুগল এমনি অভিনয় পটু হইয়া গেলাম যে দ্বাপরে সত্যকার কৃষ্ণ ঠিক আমার মত সংকেত ধ্বনি সহকারে "রতি সুখ সারে গতমভিসারে—" গান গাহিয়া রাধিকার অনুসন্ধান করিতে সত্যই এমনটি পারিয়াছিল কি না সন্দেহ আছে। দশম বৎসরের কৃষ্ণ ও সপ্তম বৎসরের রাধিকার অভিসার যে কতখানি (natural) স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা দর্শক-গণের হাততালি হইতে বুঝিয়াছিলাম।

থিয়েটারের রিহার্সেল দেখার সময় অন্য কোন ছেলেকে রিহার্সেল রুমে ঢুকিতে দেওয়া হইত না, কারণ তাহারা 'বখাটে' হইয়া যাইবে। আমিও যে 'বখাটে' হইতে পারি একথা অবশ্য তাহারা ভাবে নাই এবং হয়ত ভাবিয়া থাকিলেও আমায় না হইলে তাহাদের নাটক অভিনয় করা সম্ভব হইবে না বলিয়াই আমার ব্যাপারটা উপেক্ষা করিয়া

থাকিবে। অভিনয় বা নাটক মানুষের শিক্ষার বাহনরূপে চিরদিন পরিচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অভিনয় করে বা যে পরিবেশের মধ্যে অভিনয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা একটি বালকের চরিত্র গঠনের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর। আমি ছাড়া তথাকথিত ভদ্র লোকের ছেলে আর কেহ অভিনয়ে যোগ দেয় নাই। যাহারা সখী সাজিয়া গান করিত তাহারা সকলেই নিম্ন শ্রেণীর লোকের ছেলে। আমি ছাড়া কোন ভদ্র লোকের ছেলেকে ঐ রিহার্সেল রুমে ঢুকিতে পর্যন্ত দেওয়া হইত না। কেবল একজন মাত্র নানা তাড়না খাইয়াও আসিত সে গোবর্ধন। গোবর্ধন একপাশে বসিয়া অভিনয় দেখিত, মাঝে মাঝে এর তার ফরমাস খাটিত এবং যখন তখন লোকের তাড়না খাইত। গোবর্ধনের অবশ্য এ বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না সকল ব্যাপারেই সে নির্বিকার। গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের কাছে আমার যথেষ্ট খাতির বাড়িয়া গেল। আমি গ্রামের মাতব্বরদের সহিত একসঙ্গে মিশিতেছি, এমন কি, যাহারা শাসন করিবার অধিকারী তাহারা এখন আমার তোষামোদ করিতেছে যাহাতে আমি বিগড়াইয়া না যাই; তাহা হইলে তাহাদের সাধের অভিনয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। সেইজন্য আমি তখন হইতেই গ্রামের অন্যান্য সাথীদের কাছে উঁচু চালেই মিশিতে সুরু করি। অল্পদিন পরেই দেখি আমি আমার সাথীদের 'মাণিকদাদা' হইয়া গিয়াছি। আমার সমবয়সীদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমাকে খাতির করিতে লাগিল, কারণ বয়োজ্যেষ্ঠদের দরবারে আমার অবাধ গতিবিধি। কিন্তু গোবর্ধন আমাকে কোন দিন খাতির ত করেই নাই পরন্তু যুগলকে দেখিলে বলিত "মাণকে ঐ দ্যাখ তোর 'বউ' যাচ্ছে।" যুগলকে 'বউ' বলিলে আমি চটিতাম কিন্তু কি করিব কোন উপায় নাই কারণ আমি কৃষ্ণ, যুগল যে রাধিকা। গোবর্ধন ঐ একমাত্র অস্ত্রে আমাকে দিয়া যে কত কাজ এবং অকাজ করাইয়া লইত তাহার ইয়ত্বা নাই। আমি সকলের দাদা কিন্তু গোবর্ধনের চেয়ে বড় হইতে

পারিলাম না। সকলেই আমার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিয়াছিল কেবল গোবর্ধন বলিয়াছিল—"গান করবার সময় তুই অমন মুখটা ছুঁচলো করিস কেন মাইরী যা বিচ্ছিরী দেখায়—" হায় গোবর্ধনের কাছে আমার কোন মূল্যই নাই। গোবর্ধনের কথা আগেই পরিচয় দিয়াছি। এই অল্প বয়স হইতেই সে জীবনটাকে এমন একটা ভূমিতে লইয়া আসিয়াছে যেখানে কোন অপমান, লাঞ্ছনা, কোন স্তুতি বাক্য বা প্রশংসা তাহাকে আদৌ স্পর্শ করিত না। গোবর্ধন এমন কতকগুলি কাজ করিতে পটু ছিল যাহা গ্রামের অন্য কোন বালক পারিত না। বিধুভূষণ দত্তের পুত্র-বধুর কানের মাকড়ি স্নান করিতে যাইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছে গোবর্ধন সারাদিন জলে ডুবিয়া ডুবিয়া সেই মাকড়ী জল হইতে উদ্ধার করিয়া দিল। হরিঘোষের ছেলের অসুখ রাত্রে 'খেতপাপড়া' ঔষধের অনুপান হইবে, গোবর্ধন অনায়াসে তাহা আনিয়া দিল। এই সব কাজ গোবর্ধন ছাড়া আর কেহ বড় একটা পারিত না। গোবর্ধনের এত গুণ থাকিতেও গ্রামের লোকে কেহ যে তাহার কোন মূল্য দিত তাহা নয় বরং তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনাই করিত। সকলেই নিজের ছেলেকে সতর্ক করিয়া দিত 'দেখিস্ গোবরার সহিত মিশিস্ না—ব্যাটা বখাটের একশেষ—"

৬

বীজপুরে গাজনে থিয়েটার করিতে গেলাম। দুনিয়ার চট সতরঞ্চি ও কাপড় জড় করিয়া আমাদের রঙ্গমঞ্চকে ঘেরা হইয়াছে। ইতিপূর্বে বীজপুরে কখনও থিয়েটার হয় নাই। অগণিত নরনারী রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে অভিনয় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দুই একজন যুবক বা বালক রঙ্গমঞ্চের ঘেরা ফাঁক করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেই ধমক

খাইয়া পলাইয়া যাইতেছে এমন কি আমিও অনায়াসে আমাপেক্ষা অনেক বয়স্ক লোককে ধমক দিতেছি "কি হচ্ছে এখানে, কি দেখেছেন? যান না নিজের জায়গায় বসুন গে না—ইত্যাদি।" গোবর্ধনও আমাদের সহিত আসিয়াছে সেই কেবল বলিতেছে "দেখুক না মাণকে অমন করছিস কেন লোকগুলোকে? একবার এই ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো দেখলেই ওদের ন্যাখার সাধ মিটে যাবে।" গোবর্ধনের কথার জবাব দিতে পারি নাই কারণ আমার জবাবের সে মোটেই গুরুত্ব দিবে না—কিন্তু কি আস্পর্ধা এমন চমৎকার সিনগুলোকে বলে কিনা ন্যাকড়া! আমি রাগিয়া উত্তর করিলাম—"কি বলছিস গোবরা ঐগুলো কি ন্যাকড়া ছেঁড়া?"

গোবর্ধন নির্বিকারচিত্তে উত্তর দিল—"ন্যাকড়া ছেঁড়া নয়ত কি? গাছ আঁকিলেই কি গাছ হ'য়ে যাবে?" গোবর্ধনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আমাদের হইতে বিভিন্ন ছিল। কোন কিছু অবাস্তব ব্যাপারকে সে সহজে গ্রহণ করিতে পারিত না। আমরা যখন উদ্যানের দৃশ্যপট দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম গোবর্ধন তখন দিব্য তাহার পাশের ব্যক্তিকে বলিতেছে "ও কিছু না কাপড়ের উপর রং করে এঁকেছে।"

থিয়েটার আরম্ভ হইল আমি সুন্দর ভাবে আমার অভিনয় করিয়া যাইতেছি এমন সময় একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে গ্রীণরুমের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। আশু খুড়োর অনুমতি লইয়া আমি বাহিরে গেলাম। আমি তখনও 'পীতধড়া মোহনচূড়া' ছাড়ি নাই কারণ আমার ভূমিকা তখনও শেষ হয় নাই। আমি বাহিরে আসিতেই দেখি একটি অবনতমুখী কিশোরী দাঁড়াইয়া আছে আর তাহার মা। ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোক কিশোরীর পিতা। কিশোরীর মা বলিলেন "নে যামিনী কোলে নে, বল ভগবান এমনি ছেলে একটি আমার কোলে দাও" আর আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন "বাবা তুমি একবার যামিনীর কোলে চেপে একবার 'মা' বলে ডাক ত?" যামিনীর মায়ের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। বেশ

শক্ত হইয়া দাঁড়াইলাম যাহাতে যামিনী আমাকে কোলে করিতে না পারে। দে৷খলাম যামিনীর মায়ের চক্ষে অশ্রু এবং অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিতেছে "বাবা একবার কোলে ওঠ তুমি যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াব—আর একবার মা ব'লে ডাক।" আমি বলিলাম "ওকি আমার মা যে ওকে আমি মা বলব ?"

"হ্যাঁ বাবা ঐ তোমার মা একবার মা বল !" বহু অনুরোধেও আমি কোলে চড়িতে রাজী হইলাম না বা মা বলিলাম না। একে একে আরও কয়েকজন মহিলা জড় হইল। একজন বলিল "যামিনা তোর কপাল পোড়া, নইলে কোলে চ'ড়বো না কোন ছেলে কবে ব'লেছে।"

যামিনী পূর্ববৎ অবনতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলাম তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। মহিলাদের আলাপ হইতে যাহা বুঝিলাম তাহা এই যামিনীর প্রায় পাঁচ বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে কিন্তু কোন সন্তানাদি হয় নাই। যামিনীর স্বামী বংশের একমাত্র সন্তান তাই বংশরক্ষা করা তাহার কর্তব্য সেইজন্য তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া সন্তান লাভের জন্য দ্বিতীয় বার দ্বার পরিগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যামিনীর মা ও বাবা যামিনীর সন্তানের জন্য আধিদৈবিক আধিভৌতিক নানারূপ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া যামিনীর সপত্নী সম্ভাবনা ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছেন।'

আমি যখন কিছুতেই কোলে চাপিতে রাজী হইলাম না তখন যামিনী ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইল। আমি অনিচ্ছাসত্বেও কোলে চড়িতে আপত্তি করিতে পারিলাম না যামিনীর মায়ের মুখে আর হাসি ধরে না বলিল"হে কৃষ্ণ যখন দয়া ক'রেছ একবার 'মা' বল।"

গোবর্ধন পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল "কাকে কৃষ্ণ বলছ ওতো মাণকে কেষ্ট সেজেছে—ও কেষ্ট হতে যাবে কেন ?"

—রাম রাম কোন্ মুখপোড়া এমন অলুক্ষণে কথা বললি রে—বেরো মুখপোড়া এখান হতে—অমন ছেলে নদীর ধারে—

গোবর্ধন ততক্ষণে সরিয়া পড়িয়াছে।

যামিনীর সহিত আমার ভাব হইয়া গেল। তাহাকে 'মা' বলিতে অবশ্য পারি নাই; মাত্র দুই দিন বীজপুরে ছিলাম। আমি যামিনীদের বাড়ীতেই খাইতাম শুইতাম। যামিনীর সহিত জীবনে আর আমার কখনও দেখা হয় নাই। যামিনীর কৃষ্ণের মত কোন পুত্রলাভ হইয়াছিল কি না অথবা সপত্নী লইয়া বাকী জীবন স্বামীর ঘরে বাস করিতে হইয়াছে তাহার কোন খবরই আমি জানি না। জানিবার প্রয়োজনই বা কি? যামিনীর মায়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস আমাকে যামিনীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। এই পরিচয় কিন্তু উপেক্ষা করিতে পারি নাই। যামিনীর সে দিনের যে সমস্যা তখন আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারি যামিনীর সমস্যার মধ্যে আমাদের সমাজ-জীবনে যে সমস্যা লুক্কায়িত আছে তাহা দুদিনের পরিচয়েই স্থায়ী ভাবে আমার মনে বাসা বাঁধিয়া আছে। একটি ষোড়শী বা সপ্তদশী বালিকার সন্তান হয় নাই, ডাক্তারী শাস্ত্রমতে তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসর সন্তানের জন্য অপেক্ষা করা চলে, কিন্তু যামিনীর স্বামী বা শ্বাশুড়ী কেহ অপেক্ষা করিতে রাজী নয়। সেদিনের সমস্যা যামিনীর জীবন-মরণের সমস্যা। একটি সন্তান তাহার চাই নতুবা এই জীবনের যত কিছু আলো একটা ফুৎকারে নিভিয়া যাইবে। যামিনী চির অন্ধকারে ঢাকা থাকুক তাহাতে যামিনীর স্বামীর কোন কিছু আসিয়া যাইবে না। এমনি কত যামিনী যে অমারজনীর গভীর অন্ধকারে ঢাকা আছে কে তাহার খবর রাখে?

বীজপুর থিয়েটারে আমাদের তিনজনের নাম হইয়াছিল। আমার শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিতাশ্বের ভূমিকা অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। বাদলের 'বিমলি বামনির' ভূমিকায় ঘন ঘন হাততালি পড়িয়াছিল। আশু খুড়ো

তাহাকে এমন তালিম দিয়াছিল যে পুরুষ মানুষে যে মেয়ে মানুষের ভূমিকা লইয়াছে এ যেন কেহ বুঝিতে না পারে। সম্মার্জনী হস্তে বিমলা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া মেয়েলি স্বরে পার্ট করিতে করিতে স্বামীকে ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিল—সম্মার্জনীটী বরাবর বাম হস্তে ধরিয়াছিল কারণ স্ত্রী ভূমিকায় বাম অঙ্গের চালনাই না কি প্রশস্ত এবং প্রতি পদবিক্ষেপে বাম পদকে আগে বাড়ানই না কি নিয়ম। বাদল যখন বাম পদ বাড়াইয়া পদচারণ এবং বাম হস্তে সম্মাজ্‌র্নীর ব্যবহার করিতেছিল তখন মনে হইতেছিল কোন 'হ্যাটা' শুচিবায়ুগ্রস্ত নারী (নপুংসক বলিলেই ঠিক হয়) ষ্টেজের উপর বিচরণ করিতেছে! আর একজন যবনিকার অন্তরালে নাম কিনিয়াছিল তিনি হইলেন আমাদের বাদক নলিন। দুইদিন-ধরিয়া আমরা যেরূপ বেতালা গান করিয়াছিলাম নলিন না হইলে ঐ সব বেতালা গানকে সামাল দিতে পারিত না। নলিন চির জীবন বেতালা গানে তাল রাখিয়া আসিতেছে উত্তরকালে সে আর কোন ওস্তাদ লোকের তাল লয় সহ-যোগের গানে তাল রাখিয়া বাজাইতে পারিত না। কারণ বেতালা গানে বাজাইয়া বাজাইয়া সে 'তালকানা' হইয়া গিয়াছিল ইহাই লোকে বলিত। —"আহা নলিনের হাতটি যেমন মিষ্টি যদি তাল বোধ থাকিত তবে চমৎকার হইত।"—বেতালা জগতে যাহাকে তাল রাখিয়া চলিতে হয় সুরলোকে তাহার ছন্দপতন হইবে ইহা আর আশ্চর্যের কথা কি? কিন্তু মানুষের স্বভাব এমনি যে ছন্দপতনকে সে ছন্দপতন বলিয়া ক্ষমা করে না। বেসুরো জগতে সুর রাখিতে যাইয়া কতলোক যে কণ্ঠহারা হইয়াছে, বেতালা জগতে তাল রাখিতে যাইয়া কত লোক যে 'তাল বেতাল' হইয়াছে কে তাহার হিসাব রাখে? নলিনের আমরা নিন্দা করি 'সে বড় বেতালা' কিন্তু আমরা ভাবিয়াও দেখি না তাল রাখিতেই তাহার এই দুর্দশা।

শৈশবে মানুষ যে দৃষ্টিতে প্রকৃতির সহিত পরিচয় করে যৌবনে তাহার খেই হারাইয়া যায়। বীজপুর হইতে বাড়ী ফিরিয়াছি, দুইদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়াছে। ঠাকুরমা আমাকে বাটীর বাহির হইতে দেন নাই। কারণ আমি থিয়েটার করিতে গিয়াছিলাম একথা ভবিষ্যতে বাবার কানে যাইবেই। অতএব আর অন্য ধরণের দৌরাত্ম না করিয়া পাঠে যাহাতে যথারীতি মনঃসংযোগ করিয়া এই কয়দিনের ফাঁকি পূরণ করিয়া লইতে পারি সেইজন্য দুইদিন ঘরে বন্দী আছি। এত বড় একটি ঝড় বাদল আমি কোন কাজে লাগাইতে পারিলাম না বলিয়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছি। উপরের ঘরে একটি জানালার ধারে বসিয়া আমাদের খিড়কির ঘাটে জলে মেঘের ছায়া দেখিতেছি। যৌবনকালে উহাতেই আমি তৃপ্ত হইতাম। সাদা জলে কালো মেঘের ছায়া দেখিয়া খুব বড় রকমের একটা কল্পনা করিতে পারিতাম—নবজলধরের বিজুরী রেখাকে আমার কোন মানসীর সহিত তুলনা করিয়া ভরাবাদলে ভাবের নদীতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে এক কাপ গরম চায়ের ফরমাস দিতে পারিতাম, অপর দিকে আমার মানসী হয়ত বিরহের উষ্ণ বাতাসে (যদিও সেদিনের বাতাস জলীয় ছিল) মেঘ দর্শনে হা হুতাশ করিতে বা আক্ষেপ করিতে পারিত—"তোমায় যখন পড়বে মনে চাইব কাল মেঘের পানে"—অথবা "এ ভরা বাদর—শূন্য মন্দির মোর" প্রভৃতি বলিয়া বিরহ ব্যথায় চাল কড়াই ভাজার অর্ডার দিতে পারিত। কিন্তু হায় এমন একখানা মেঘ সেদিন গোবর্ধনের অভাবে মাঠে মারা যাইতেছিল। সরকার পুকুরের মোহনায় কিরূপ জোরে জল ঢুকিতেছে অথবা মুকুন্দ সায়রের কতটা জল বাড়িল এই চিন্তায় মন অধীর হইয়া আছে।

খিড়কির ঘাটের কালো জলে প্রিয়ার নয়নতারার তুলনা অপেক্ষা

কতগুলি কইমাছ রাত্রিকালে উজান ধরিয়া উঠিতে পারে তাহারই হিসাব গণনায় যখন ব্যস্ত আছি তখন গোবর্ধনের বাবা আমাদের বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওরে মাণিক গোবরা কোথায় ব'লতে পারিস? আজ তিন দিন যে সে ঘর ছাড়া হয়েছে তার একবারে দেখা নাই।" গোবর্ধন ঘর ছাড়া হইয়াছে ঠিক নহে গোবর্ধনের বাবা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অবশ্য গোবর্ধনকে যে সেদিন নূতন তাড়াইয়া দিয়াছিল তাহা নহে এইরূপ মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। গোবর্ধন এ সব ব্যাপারকে কিছুই মনে করে না কিন্তু এবার সে বাড়ী ফেরে নাই। গোবর্ধনের পিতা কাতর স্বরে বলিলেন "মাণিক তুই ঠিক বলতে পারবি সে কোথায়?"

—"আমি কি করে জানবো জ্যাঠামশায়।"

—"ছাখ না বাবা একটু খুঁজে আর ত বৃষ্টি পড়ছে না। মেঘ করে আছে তবে আর বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

ঠাকুরমা বলিলেন "তাই ছাখ বাবা একবার। কি দস্যি ছেলেরে বাছা এই তিন দিন ঝড় বাদলে রইলি কোথা?"

মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোবর্ধনের সন্ধানে বাহির হইলাম। আপাততঃ গোবর্ধনের চেয়ে গ্রামের পুকুর গোড়েগুলির সার্ভে (survey) করা দরকার মনে করিয়া কোন পুকুরের কত জল বাড়িয়াছে বা কোন পুকুরের কত মাছ উঠিয়াছে তাহার সন্ধানে লইতে লাগিয়া গেলাম।

গ্রামের শেষ প্রান্তে কাঁটা দিঘী নামে একটি দিঘী আছে সেখানে বড় একটা লোকে যায় না। কিন্তু মনে হইল হয়ত গোবর্ধনের সন্ধান সেখানে মিলিলেও মিলিতে পারে। কাঁটা দিঘী বড় বড় গাছ এবং ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গোবর্ধন শীতকালে এইখানে কুল ও গ্রীষ্মকালে বৈঁচী খাইতে আসে। আমি কাঁটা দীঘির পাড়ে উঠিতেই গোবর্ধনের ডাক শুনিতে পাইলাম 'উ উ হিয়ার—উ-উ-হিয়ার।'

দেখি গোবর্ধন জলের ধারে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছে।

—"কি রে গোবরা কোথায় ছিলি তিনদিন ?"

গোবর্ধন নিরুত্তর।

—"তোকে যে তোর বাবা খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেল !"

গোবর্ধন বলিল—"সে কি রে মেরে তাড়িয়ে দিলে। 'বললে ঘরে ফিরলে মেরে খুন করে দেবে!' আবার খুঁজছে বলিস্ কি মাইরী—।"

আমি গোবর্ধনকে বলিলাম সত্যই তাহার বাবা খুঁজিতেছে। কিন্তু গোবর্ধন এই তিন দিন কোথায় ছিল জানিবার কৌতূহল হইল অথচ গোবর্ধন নীরব। বলিলাম "বল না গোবরা কোথায় ছিলি ?" গোবর্ধন যাহা বলিল তাহা শিশু চিত্তের কেন বহু বয়স্ক লোকের পক্ষে ভীতিজনক। কাঁটা দীঘির এক পাড়ে আমাদের গ্রামের শ্মশান। ঐ শ্মশানে দুই একটী ছোট ছোট স্মৃতি মন্দির কোন কোন ধনী গৃহস্থ তাহাদের মাতা পিতার নামকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য করিয়াছে, গোবর্ধন সেই স্মৃতি মন্দিরের একটিতে আশ্রয় লইয়াছে, গোবর্ধনের নিকট এই কথা শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল।

ভয়ে ভয়ে বলিলাম—সে কি রে গোবরা তোর ভয় করে নাই ?

গোবর্ধন বলিল—বাব্বা ভয় আবার করে নাই রাত্রির বেলায় যে ভূতের উৎপাত।

অ্যাঁ—ভূতের উৎপাত গোবরা বলে কি অথচ গোবর্ধন ত্রিরাত্র এখানে বাস করিতেছে ? ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রকম ভূত দেখলি ভাই ?

গোবর্ধনের কথা শুনিয়া দিবাভাগেই আমার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। গোবর্ধন বলিল "ঐ ভৈবব ভট্চাযের মঠে আমি রাত্রে থাকি। পেরথম দিন শুয়ে আছি এমন সময় ভৈরব ভট্চায হুঁকো হাতে কাস্তে কাস্তে বলছে "ও রেঁ কেঁ রেঁ শুঁয়ে এঁখানে ?" আমি চেয়ে দেখি ঠিক

ভৈরব ভট্‌চায। আমি তখন ভয়ে জড় সড় হ'য়ে ভৈরব ভট্‌চাযের দিকে চেয়ে রইলুম। "কেঁ রে গোঁবরা না যাঁ ব্যাটা এখান হঁ'তে যাঁ।" কি করি ভয় পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম ছুটে যেয়ে তেঁতুল গাছে উঠে পড়লুম।"

আমি ভীত কণ্ঠে বলিলাম "তেঁতুল গাছে যে উঠ্‌লি গোবরা, ভৈরব ভট্‌চায যদি উঠত?"

—"দূর বোকা ভৈরব ভট্‌চায কি কখনও তেঁতুল গাছে উঠতে পারে? সে যে বুড়ো রে, বোকা।"

হ্যাঁ আমি বোকাই বটে আর গোবর্ধন খুব বুদ্ধিমান। ভূতের যে অসাধ্য কাজ নাই গোবরার এ তথ্য জানা নাই।

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলাম "তুই রাম নাম ক'রলে দেখতিস্‌ পালিয়ে যেত! রাম নামকে ভূতে বড় ভয় করে।"

আমার এই অমূল্য উপদেশের গোবর্ধন কোন মর্যাদাই দিল না।

সে বলিল—"সে হ'ল 'গোণা' ভূত, তারা রাম নামকে ভয় করে। এরা রাম নামকে ভয় ক'রবে কেন?"

'গোণা' ভূত সে আবার কেমন? ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলাম দিবাভাগেই যদি গোণা ভূত দেখা যায়।

গোবর্ধন বলিল—"যারা অপঘাতে মরে—যেমন গলায় দড়ি দিয়ে, এবং জলে ডুবে—"

—"তা গোণা ভূত যদি থাকত?"

—"দূর, গাঁয়ে আমাদের গোণা ভূত পাবি কোথায়? কেউ কি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে?" অর্থাৎ এই তিন দিনে গ্রামের সকল ভূতগুলির সহিত গোবর্ধনের পরিচয় হইয়াছে। গোবর্ধন কি করিয়া ঐ ভূতের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে তাহার এক অপূর্ব কাহিনী বলিল। ভৈরব ভট্‌চাযের পর নিস্তারিণী বুড়ী, জগা পোদ্দার, বলা গয়লা, কিরূপ

শ্মশানে জড় হইয়া বিশ্রম্ভালাপ করিত তাহার গোবর্ধন বিস্তারিত বিবরণ দিল। আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম "পালিয়ে চল্ গোবরা ভূতে যে তোকে মেরে ফেলে নাই এই ভাগ্যি—"

গোবর্ধন বলিল "দূর বোকা—ভূত কি কখনও মারে? ভূতে কেবল ভয় দেখায়।"

গোবর্ধনের এই তথ্যটি জানা ছিল যে ভূতে যতই ভয় দেখাক মারিয়া ফেলিতে পরিবে না। কারণ মরিয়া যাবার পর আর মানুষের গায়ে জোর থাকে না। ভূতে কখনও কাহাকেও মারিয়া ফেলিতে পারে না যদি কেহ মরে সে ভয়ে মরে। যে মারিতে পারে না তাকে আবার ভয় কি? গোবর্ধন ভূত অপেক্ষা তাহার পিতাকে যে বেশী ভয় করিয়াছিল গোবর্ধনের কথায় তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। বলিলাম "গোবরা এই তিনদিন কি খেয়েছিস্? গোবর্ধন বলিল "খাবার আবার ভাবনা রে মাণকে, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি,—তবে তোরা ও সব জিনিষ খেতে পারবি না। "গোবর্ধনের পিসীমা, 'ভগবান জীব দিলে যে আহার দেন' এই বাক্য প্রায়ই গোবর্ধনের বিমাতাকে বলিতেন অর্থাৎ গোবর্ধনের বিমাতার দয়ার উপর গোবর্ধনের নির্ভর করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তবে বিধাতা জীবের কিরূপ আহারের ব্যবস্থা করেন তাহা গোবর্ধনের খাদ্য বস্তু না দেখিলে বোঝা যাইবে না। গোবর্ধন আমার মৌনতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"যা দুর্যোগ মাণ্‌কে নইলে খাবার আবার ভাবনা? চল কত খাবার জোগাড় করেছি দেখবি।" গোবর্ধনের খাদ্য বস্তু দেখিবার জন্য ভৈরব ভট্টাচার্যের মঠে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম গোবর্ধন কয়েকটি কাঁকুড় ও ফুটি সংগ্রহ করিয়াছে। এই ফসলটি সংগ্রহ করিতে তাহাকে তিন মাইল পথ দুর্যোগের মধ্যে যাইতে হইয়াছিল। তা' ছাড়া একটি কাঁচা কুমড়া এবং কিছু নিমের পাতা আমি বলিলাম—"কাঁচা কুমড়ো আর নিমপাতা কেন রে?"

গোবর্ধন বলিল "দূর বোকা একরকম জিনিষ খাওয়া যায় ? তাছাড়া নিমপাতা খেলে অসুখ করবে না তা জানিস্ ? নিমপাতা হনুমানে কেন অত খায় ? অসুখের ভয়ে। কারণ ওদের ত আর ডাক্তার নাই। জলে বাদলে ভিজতে হয় যদি অসুখ করে ? নইলে অত তিত খেতে যাবে কেন ? মানুষে অত তিত খেতে পারে না ত বাঁদরে খেতে যাবে ?" ইহা খুবই সত্য কথা মানুষে যখন ঐরূপ তিক্ত দ্রব্য খাইতে পারে না, বাঁনরে তাহা পারিবে কেমন করিয়া ? তাই আমি নিঃসন্দেহে গোবর্ধনের কথা মানিয়া লইলাম। তবুও বলিলাম "গোবরা নিমপাতা তোকে বুঝি তিত লাগে না ?" গোবরা বলিল "দূর বোকা নিমপাতা তিত লাগে না কে ব'ললে ? ঔষুধ মাত্রেই ত তিত ? নিমপাতা বেজায় তিত চোখ বুজে খেয়ে নিই।" অর্থাৎ চক্ষু মুদিয়া তিক্তবস্তু আহার করিলে তিক্ত কম লাগে।

"আর কুমড়ো—"

"না—খেতে খুব ভাল লাগে না। তবে খেতে অভ্যেস ক'রলে অসুবিধা হয় না। বাঁদরে খায় কি করে ? তাদের রান্না ক'রে কে দেবে শুনি—'আলোনা মালোনা খেয়ে বন দিয়ে পালায়'—পিসিমার কাছে শুনিস নি ?" বহুবার শুনিয়াছি বানরে বিনা লবণে কেমন বড়ি বা ঐ জাতীয় অলবণাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বন দিয়া পলাইয়া যায়। অতএব গোবর্ধনের আহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা দেখিয়া বলিলাম— "তুই তা হ'লে বাড়ী যাবি না ?"

—"আরে বাড়ী যাব না কে বললে—বাড়ী গেলে কি বাঁচাও আছে ?"

—"এখানে যদি ভৈরব ভট্চায ঘাড় মুটকিয়ে দেয় ?

—"তা ত দিতেই পারে। কায়দায় পেলে কি আর ছেড়ে কথা কইবে ? সেইজন্যই ত রাত্রে তেঁতুল গাছে থাকি।"

কাঁটাদীঘিতে গোবর্ধন যে ভূতের কথা আমাকে বলিয়াছিল তাহা

সত্য কি মিথ্যা যাচাই করিয়া দেখিবার মত বয়স আমার হয় নাই। গোবর্ধন যাহা বলিয়াছিল তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। গোবর্ধন যাহা বলিতেছে তাহা অপ্রাকৃতিক না ভাবিবার যদি বয়সও হইত তথাপি হয়ত আমি গোবর্ধনের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কারণ গোবর্ধন যে প্রকৃতির বালক সেইরূপ বালক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আমরা জানিতাম গোবর্ধন যাহা করিতে পারে আমরা তাহা পারি না. অতএব গোবর্ধনের কথা সেদিন মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করি নাই আজও মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। হয়ত গোবর্ধন ভূত দেখে নাই। কিন্তু একটী ক্ষুদ্র বালক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া শ্মশানে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় লইয়াছে সে যদি রাত্রির অন্ধকারে তাহার কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিয়া ঐ সব অপ্রকৃত বস্তুকে মানস নয়নে উপস্থিত করিয়া সত্য বলিয়া ভ্রম করে তবে তাহাকে নেহাৎ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। ভৈরব ভট্টচায যে খড়ম পায়ে দিয়া হুঁকা হাতে ঐ স্থানে পদচারণা করেন তাহা গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা জানেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেও হয়ত উত্তর পাওয়া যাইবে যে—তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী। আমিও দিবাভাগে ভৈরব ভট্টাচার্যকে শ্মশানে না দেখিয়াও বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম যে ঐ শ্মশানে কোথাও ভৈরব ভট্টাচার্য হুঁকা হাতে অপেক্ষা করিতেছে। অতএব গোবর্ধন ভৈরব ভট্টাচার্যকে না দেখিয়াও যদি মনে করে সে দেখিয়াছে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিবার কিছু নাই। সত্যই ভৈরব ভট্টাচার্য শ্মশানে খড়ম পরিয়া হুঁকা হাতে পদচারণা করেন কি না ইহা যাচাই করিয়া দেখিবার মত বালক ত দূরের কথা হরিশপুরের কোন বয়স্ক লোকেরও সাহস ছিল না। গৃহে গোবর্ধনের কোনদিন স্থান ছিল না তাই সে প্রকৃতির সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল। মানুষ ছাড়া গোবর্ধনের সকলই আপনার বস্তু। ভূত দেখিয়া সে ভয় পাইলেও ভূতের ভয়ে সে পলাইয়া যায় না। এমন কি সত্যই যদি কোন ভূত

থাকিত তবে গোবর্ধনের সহিত তাহাদের পরিচয় হইতেও বিলম্ব হইত না।

গোবর্ধন বলিল—"মাণ্‌কে আমি যে শ্মশানে থাকতুম তা যেন কাউকে বলিস্‌ না।"

—"তবে কোথায় ছিলি বলব?"

—"তুই বলিস্‌ আমাকে বলে নাই; আমি কাঁটাদীঘির কাছে দেখে ডেকে নিয়ে এলুম।"

—"তাই বলব—আচ্ছা গোবরা ভূতে কি খায়রে?"

—"ভূতে এমনি কিছু খায় না তবে যারা ভয় খায় তাদের ঘাড় মুটকিয়ে রক্ত খায়।"

এত অল্প খেয়ে ভূত কি করিয়া বাঁচিতে পারে বুঝিতে পারিলাম না তবুও গোবর্ধনের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না কারণ গোবর্ধন ভূতের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। গোবর্ধন বলিল—"ভূত দেখে ভয় খাওয়া চলবে না।"

আমি বলিলাম—"ভূতগুলো কি ঠিক মানুষের মত দেখতে?"

—"হ্যাঁ মানুষের মত তবে একটু তফাৎ আছে ভূতের ছায়া পড়ে না আর পায়ের পাতা পেছন দিকে।"

একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম যদি ভূত দেখি তবে তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইবে না। গোবর্ধনকে বলিলাম—"তাহলে ভূত চেনা খুব সহজ বল্‌।"

—"দূর বোকা ভূত চেনা অত সোজা নয়। ভূত এক এক সময় এমন মূর্তি ধ'রে আসে তখন চেনা কঠিন হয়। এমনও হ'তে পারে তোর বাবার বেশ ধ'রে এল—তখন কি তুই তার পা দেখতে যাবি? তোর ত মনে হ'য়ে যাবে তোর বাবাই ঠিক?"

সর্বনাশ ভূতের অসাধ্য কাজ নাই তবে। এমনও ত হইতে পারে কাঁটাদীঘিতে আমি গোবর্ধনের সন্ধানে যাওয়ায় ভৈরব ভট্টাচার্য গোবর্ধনের

মূর্তিতে আমার সহিত আসিতেছে—কিন্তু পা! পা দেখিলেই ধরিতে পারিব। তাই গোবর্ধনের পায়ের দিকে চাহিলাম—দেখি গোবর্ধনের পা দুটি উল্টা দিকে বসান। তারপর কি হইয়াছিল জানি না আমি গোবর্ধনের পা দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ি। গ্রামের লোক জড় হইয়া আমাকে বাড়ী লইয়া আসে।

পরের দিন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কোথাও মেঘের একটু চিহ্ন মাত্র নাই। আমাকে বাড়ীর বাহির হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। হাতে এবং গলায় অনেক মাদুলি দেওয়া হইয়াছে। আমি যে গোবর্ধনকে দেখিয়া ভয়ে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছি তাহা কেহ জানে না। থিয়েটার করিতে যাইয়া আমি কোন বিপদ ঘটাইয়া আসিয়াছি ইহাই ঠাকুরমাকে কে বলিয়া দিয়াছে যে যামিনী আমাকে পুত্র কামনায় কোলে লইয়াছিল এবং সেই আমাকে পুত্ররূপে পাইবে বলিয়া ঔষধ করিয়াছে। ঠাকুরমা যামিনী সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঔষধের সন্ধান করিতেছেন। মা খুব কড়া পাহারা বসাইয়াছেন যেন আমি বাড়ীর বাহির না হই। ছটু আমাকে পাহারা দিতেছে।

—"দেখ আবার বাড়ী হ'তে একা বেরিও না যেন? তোমাকে নিয়ে আমাদের মুস্কিল হয়েছে। খেলতে হয় বাড়ীতে খেল। লোকের বাড়ী খেলতে যাবার দরকার কি?"

ঠাকুরমা যে কথাগুলি বলিয়াছেন ছটু সেই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতেছে। এমন সময় গোবর্ধন আসিয়া উপস্থিত।—"কিরে মাণকে কেমন আছিস?" গোবর্ধনের পায়ের দিকে চাহিলাম দেখিলাম গোবর্ধনের পা ঠিক আছে। ছটু বলিল—"দাদার কোথাও যেতে বারণ।"

গোবর্ধন বলিল—"তুই কাল ভয় খেলি কেন বল দেখি?"

ভয় খাইয়াছিলাম এ কথা গোবর্ধনকে বলিতে লজ্জা বোধ হইল। যে ত্রিরাত্র ভুতের সহিত বাস করিয়াছে তাহাকে ভয়ের কথা বলিতে

আমার পৌরুষে বাধিল। তাই বলিলাম—"ভয় খাবার ছেলে আমি নই বাবা—এমনি অসুখ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছি।" তবুও আর একবার গোবর্ধনের পায়ের দিকে চাহিয়া লইলাম।

গোবর্ধন বলিল—"হাঁ ভয় খাবি না, কখন জঙ্গলে ঘাড় মটকে দেবে। ভূত যে শুধু শ্মশানে থাকে তা নয় সব জায়গাতেই থাকে। তবে দিনের বেলায় বড় একটা বের হয় না ওরা।"

গোবর্ধনকে বলিলাম—"না, ভয় করবার পাত্র আমি নই।" গোবর্ধনের পায়ের দিকে আর একবার চাহিলাম, দেখিলাম পায়ের কোন পরিবর্তন নাই। নাঃ এ তা হলে আসল গোবরাই বটে! হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

গোবর্ধন বলিল—"তোকে ত আর হাউসের আউট (বাড়ির বার) হ'তে দেবে না?" ঘাড় নাড়িয়া গোবর্ধনের কথায় সায় দিলাম। গোবর্ধন ক্ষুণ্ণ মনে জবাব দিল—"তবে আমি যাই।" ছটু বলিল—"শোন না গোবরদা, তুমি বরং দাদাকে একটু দেখ, আমি একটু আসি।" ছটু আমার তত্ত্বাবধান করিতেছে এবং আমাকে পাহারা দিতেছে ইহা গোবর্ধনের কাছে প্রকাশ করায় ছটুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম—বলিলাম—"ফাজিলি করতে হবে না—মেয়ে যেন গিন্নী হয়েছে!" ছটু গিন্নীর মত জবাব দিল—"তুমি বেশী কথা ব'ল না, আবার মুচ্ছো যাবে—ঠাকুমা বলেছে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে।"

ছটু চলিয়া গেল। গোবর্ধন বলিল—"দ্যাখ কাল তুই যেন ভয় খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলি মনে হ'ল। কেন ভয় খেলি বল দেখি?"

আমি কোন উত্তর করিলাম না। গোবর্ধন এখনি যেখানে খুসী চলিয়া যাইবে হয়ত আবার কাঁটাদীঘিতেও বেড়াইতে যাইতে পারে অথচ আমাকে এই বন্দী অবস্থায় কাটাইতে হইবে। তাই আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। গোবর্ধন বলিল—"দুর বোকা কাঁদতে আছে? তুইত

বেশ আছিস্ দিব্যি আরামে—আমি যদি তোর মত থাকতে পেতুম তা হ'লে বেঁচে যেতুম।"

গোবর্ধন বলে কি আমার মত অবস্থায় থাকিতে পাইলে সে বাঁচিয়া যাইত? অথচ আমি কেন, হরিশপুরের প্রত্যেক বালকই গোবর্ধনের ন্যায় মুক্ত জীবন বাসনা করে।

মা আসিয়া বলিলেন—"মাণিক কিছু খাবি?" মায়ের এমন মধুর ডাক হরিশপুর আসিয়া শুনি নাই। আমার অভিমান হইল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে, বীজপুরে কে তোকে কোলে নিয়েছিল—?"

গোবর্ধন উত্তর করিল—"খুড়ীমা আমি সেখানে ছিলুম—সে একটা মেয়ে। মাণিক কেষ্ট সেজেছিল কি না? তার ছেলে হয় নাই তাই ছেলে হবে ব'লে কেষ্ট কোলে করতে এসেছিল। হ্যাঁ খুড়ীমা, মাণিক কি সত্যকারের কেষ্ট যে কোলে করলে ছেলে হবে?"

মায়ের মুখে দারুণ অসন্তোষের ছাপ। মা বলিলেন—"হ্যাঁ গোবর তারা কি মাণিককে কোন ওষুধ করেছে? নিশ্চয় কোন তুকতাক্ ক'রেছে, নয়ত বাছা আমার ভয় খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যাবে কেন? বোকা ছেলে দুদিন ধ'রে ওদের ঘরে ছিল এবং সেইখানেই খাওয়া দাওয়া ক'রেছে।"

মা যামিনীর উদ্দেশ্যে গালাগালি করিতে লাগিলেন। যামিনীর সহিত আমার মাত্র দুই দিনের পরিচয়। তাহাকে আমি মা বলিতে পারি নাই সত্য তবুও যেন যামিনী তাহার মাতৃস্নেহের দাবী লইয়া আমার কাছে দাঁড়াইল। আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম—"মা তুমি যামিনীকে দেখ নাই তাই অমন কথা বলছ। অমন ভাল মেয়ে হয় না আমাকে যা যত্ন ক'রেছে। কত ভাল জিনিষ খাইয়েছে। গোবরা ত ব'লবেই, ওকে যামিনীর মা গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল কি না?"

মা বলিলেন—"ওরে হাবা ছেলে, গোবরা চালাক ছেলে তাই সেই সব কুহকিনীর জালে পড়ে নাই—তুই বোকা কি না তাই—"

আমি প্রতিবাদ করিলাম—"যামিনীর মত ভাল মেয়ে হয় না। সে ত কোলে ক'রতে মোটেই রাজী হয় নাই। তা ছাড়া কোলে ক'রলেই বা? রাজসাহীতে মনোদি যে কোলে করে তাতে দোষ হ'ল না আর যামিনী কোলে করায় যত দোষ!"

—"দেখেছিস গোবরা, বোকা ছেলে না হ'লে মনোর সঙ্গে যামিনীর তুলনা করে?" মা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"তোকে যদি কেউ ভালবেসে কোলে নিয়ে বিষ দেয় ত খাবি?"

—"বিষ দিলে খেতে যাব কেন?"

—"খাবার জিনিষের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিলে জানতে পারবি কি ক'রে?"

যামিনী কখনও খাদ্য বস্তুতে বিষ মিশাইয়া দিবে ইহা ধারণা করা যায় না। তাহাছাড়া বিষ মিশাইয়া দিলে যে আমি জানিতে পারিব না এমন বোকা নই। তাই উত্তর করিলাম—"ইস্—আমি এত বোকা নই যে বিষ দিলে জানতে পারব না। আমি ত গোবরা নই যে তিত জিনিষ খেলে মিষ্টি লাগবে।" বিষ যে তিক্ত পদার্থ ইহা আমার জানা ছিল। গোবরা আমার কথায় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। যদি তাহার শ্মশানবাসের ইতিহাস ফাঁক করিয়া দিই। তাই সেও জবাব দিল—"তা বটে খুড়িমা, বিষ হ'লে মাণকে বুঝতে পারত।"

—"ওরে বোকা ছেলে মিষ্টি বিষ বুঝি নাই?"

সর্বনাশ! বিষ আবার সুস্বাদু হইতে পারে? তবে ত খুবই সমস্যার কথা। তাহা হইলে ত খাওয়া বন্ধ করিতে হয়। মানুষের বেশে ভূত থাকিতে পারে, খাদ্যবস্তুর মধ্যে বিষ থাকিতে পারে; তবে ত মহা মুস্কিল! আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম—"আচ্ছা মা তুমিও ত ভূত হ'তে পার?

—"ওরে ওকি বলছিস্ রে ? কোন ভালখাকী আমার ছেলের মাথা বিগড়ে দিয়েছে রে—ওরে তার যেন আমার চেয়ে সর্বনাশ হয় রে ।"

মায়ের যে কি সর্বনাশ হইল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কিছু যে একটা গুরুতর বিপদ হইয়াছে তাহা মনে হইল। তথাপি আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—"আচ্ছা মা রোদে দাঁড়ালে তোমার 'ছায়া' পড়ে ?"

—"ওসব কি কথা বলছিস্ ? ওরে গোবরা"—গোবর্ধন ইতিপূর্বেই অন্তর্ধান হইয়াছে পাছে তাঁহার মন্ত্রগুপ্তি ফাঁক হইয়া যায়। মা বলিলেন —"ও সব কি বলছিস মাণিক ? ও রকম অলুক্ষুণে কথা ত তোর মুখে শুনি নাই ?" এই বলিয়া মা আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। আমি মায়ের পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম মায়ের চরণ-যুগল যথাপূর্ব সন্নিবেশিত আছে। তাই আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম—"না তুমি আমার আসল মা আছ।" মা আমার এই সব অস্বাভাবিক কথায় আরও ভীত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরমাকে ডাকিলেন। ঠাকুরমাকে মা যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই যে, আমার সহিত কথাপ্রসঙ্গে যামিনীর কার্যকলাপ জানিয়া লইয়াছে, এবং যামিনী ও যামিনীর মা যে ডাকিনী বিদ্যার সাহায্যে আমার প্রাণহানি করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয়ের কিছুই নাই। কারণ আমি নাকি 'মাকে' পর্যন্ত চিনিতে পারি নাই। এই কথার আমি প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলাম—"বারে, চিনতে পারব না কেন মাকে ? তবে আসল মা না কোন ভূত মা হয় এসেছে তা আমাকে পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে না ? আমি ত আর তোমাদের মত বোকা নই যে মা মনে ক'রে ভূতের কোলে উঠতে যাব ?"

—"শুনছেন মা মাণিক কি সব বলছে ?"

ঠাকুরমা উত্তর করিলেন—"বউমা বুঝেছি সব। সেই ডাকিনীরা আমার ছেলেকে যাদু ক'রেছে। তুই শীগ্‌গির এক কাজ কর। এক কুলো ছাই নিয়ে আয়।" ঠাকুরমার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র মা আমাকে ঠাকুরমার কোলে

দিয়া কুলায় করিয়া এককুলা ছাই উনান হইতে লইয়া আসিলেন। আমাকে খিড়কির ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। ঠাকুরমা বলিলেন—"দাদা বলত—যামিনী আমার মা না ছাই—যামিনী আমার মা না ছাই—যামিনী আমার মা না ছাই।"

আমি অবশ্য বিনা প্রতিবাদে যামিনীর উদ্দেশ্যে ছাই উড়াইয়া দিলাম। কারণ উহা বেশ মজার ব্যাপার মনে হইয়াছিল। জানি না আমার উৎসর্গীকৃত ভস্ম যামিনীর মাতৃহৃদয় কতখানি ভস্মীভূত করিয়াছে কিন্তু আজও সে কথা মনে হইলে আমার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, দুইটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাতৃহৃদয়ের দ্বন্দ্ব মানুষকে কতখানি ছোট করিয়া দিতে পারে। ছাই উড়ান হইলে ঠাকুরমা মাকে বলিলেন—"বউমা ওর বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা জোরে কামড়ে দাও। মা ঠাকুরমার কথা মত আমার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি ঈষৎ জোরে দংশন করিয়া দিলেন। আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বুঝিলাম ইনিই আমার আসল মা। কারণ ভূতে ভয় দেখায় দংশন করে না তাহা গোবর্ধনের মুখে শুনিয়াছি।

৮

খোকার সহিত আমার খুব ভাব হইয়া গেল। গ্রামের ছেলেরা জমীদারের ছেলের সহিত বেশ প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিত না। ইহার কারণ গ্রামের ইতর ভদ্র সকল লোকে খোকাকে জমীদারের ছেলে বলিয়া অত্যন্ত খাতির করিত। বয়সের অনুপাতে সে যেরূপ খাতির পাইত তাহা আমাদের মত গৃহস্থঘরের বয়স্ক লোককেও সকলে করে না। সেইজন্য গ্রামের ছেলেরা খোকার সহিত মিশিতে পারিত না। খোকা কিন্তু সব সময়েই গ্রামের ছেলেদের সহিত মিশিতে ইচ্ছুক ছিল।

জমীদারের ছেলেরা যে জীবনধারায় চলিতে অভ্যস্ত খোকারও সেই সকল অভ্যাস পুরামাত্রায় ছিল। সে সাধারণতঃ যেরূপ পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত আমরা অনেকে তাহা চোখেও দেখি নাই। সেইজন্য সাধারণ লোকে তাহাকে একটা 'কেষ্ট বিষ্টু' ভাবিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে। খোকাও তাহার সমবয়স্ক বালক ত দূরের কথা বয়স্ক লোককেও খাতির করিয়া চলিতে অভ্যস্ত ছিল না। আমাকে ও গোবর্ধনকে ছাড়া সে বড় কাহাকেও নিজের সমান ভাবিতে পারিত না। আমাকে খাতির করিত কারণ আমি সহরে থাকি এবং তাহার পিতা মিশিতে বলিয়াছিল এবং আমি থিয়েটার করিতে পারি। আর গোবর্ধনের রোমাঞ্চকর জীবনযাত্রা-প্রণালী খোকাকে খুবই আকৃষ্ট করিয়াছিল। জমীদারের ছেলের চরিত্র যে ভাবে গড়িয়া উঠে তাহাতে ভবিষ্যতে যে তাহারা অত্যাচারী জমীদারে পরিণত হয় তাহার বীজ বাল্যাবস্থাতেই উপ্ত হয়। খোকা যে কোন বয়স্ক লোককে তাহার অপেক্ষা সম্মানে নিকৃষ্ট ভাবিতে শিখিয়াছিল। একদিন খোকা ও আমি হারাধন মুদির দোকানে যাইয়া কিছু মিষ্টি কিনিতে চাহিলাম। হারাধন মুদির দোকানে সাধারণতঃ মণ্ডা, কদমা, জিলিপী প্রভৃতি সাধারণ মিষ্টি বিক্রয় হইত। খোকা বলিল—"এই দোকানদার রসোগোল্লা ক'রতে পারিস্ না?" হারাধন অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিল এবং খোকার কথার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। হারাধন এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের মত বয়সের বালকের কাছে পায় নাই।

খোকা আবার বলিল—"রসগোল্লা করিসনি? এ সব কি মিষ্টি করেছিস্?"

হারাধন মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও বেশ শান্ত স্বরে জবাব দিল—"বাবু আমরা গরীব ব'লে কি আমাদের মান ইজ্জত নেই?"

—ফুঃ, মান ইজ্জত ত খুব আছে দেখছি! তা মশায়কে কি 'আজ্ঞে' 'আপনি' বলতে হবে?"

"তা কেন—তবে 'তুমি' বলে কথা বললেই কি আপনার ইজ্জত কমে যেত খোকা বাবু?"

"যা—ব্যাটা—যা, ময়রা ব্যাটা, তাকে আবার তুমি বলতে হবে?"

হারাধন আরও ক্ষুব্ধ হইয়া জবাব দিল—"বাবু এই কি আপনাদের কল্‌কাতার লোকের ভদ্রতা, আপনার বাবাও ছেলে বেলায় আমাকে হারাণ দা বলত আর তার ছেলে হয়ে—"

"খুব হয়েছে—আর দাদাগিরী ফলাতে হবে না।"

খোকার সহসা এই উত্তর প্রত্যুত্তরে আমি লজ্জায় মরিয়া যাইবার মত হইলাম। এমন সময় তিনকড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। হারাধন তাহাকে দেখিয়া বলিল—"আসুন নায়েব মহাশয়, আসুন। একটু তামাক ইচ্ছে হোক।" তিনকড়ি হারাধনের দোকানের একটি বেঞ্চিতে বসিল। হারাধন তিনকড়িকে খোকার অভদ্র ভাষা প্রয়োগের কথা বলিল।

তিনকড়ি বলিল—"ওসব কি আমায় নূতন শোনাচ্ছ হারু। আমি ঢের আগে হ'তে জানি। যখনই বাবু আমাদের মাণিকের সঙ্গে খেলতে ব'লে দিলেন তখন হতেই জানি ও একবারে অসভ্য হয়ে যাবে। ও যখন প্রথমে আসে এখানে, কি বাক্যি—আহা আমাকে জ্যাঠামশায় ব'লতে অজ্ঞান। কিন্তু যেই এই ফচ্‌কেগুলোর সঙ্গে মিশেছে অমনি এখানকার ছেলেদের রীত ধ'রেছে। এখন আমাকে গোমস্তা বাবু বলে ডাকা হয়।"

তিনকড়িকে গোমস্তা বলিলে সে খুবই রাগিয়া যায়। সে নিজেকে নায়েব বলিয়া জাহির করে। জমীদার হিসাবে মধুসূদনবাবু খুব বড় জমীদার নহেন। চার পাঁচটি মাত্র মৌজা, তিনকড়িই আদায় উশুল করে এবং দুইজন পাইক তাহাকে সাহায্য করে।

হারাধন উত্তর করিল—"তা নায়েব বাবু যা ব'লছেন। আমাদের

দেশের ছেলে আর সহবৎ শিখবে কোথা হ'তে। তবে বাবু, মাণিক ত আমাদের সোনার চাঁদ ছেলে—ওর সঙ্গে—"

"ছাখ্ হারু, মাণকে ছোঁড়াকে বুঝি আমার চেয়ে বেশী জানিস? ওর আর গোবরার জ্বালায় একটা পাকা পেয়ারা গাছে দেখবার জো নেই। ফুল শুদ্ধ চিবিয়ে খেয়ে দেবে। এমন হতচ্ছাড়া ছেলে ওরা।" তিনকড়ির রাগের কারণ বুঝিতে দেরী হইল না। তিনকড়ির পেয়ারা গোবর্ধন বরাবর খাইয়া থাকে। গোবর্ধনের সঙ্গে থাকিলে অবশ্য আমরাও খাই। কয়েকদিন আগে পাকা পেয়ারা গাছে না ফলিতে দেওয়ার জন্য তিনকড়ির আপশোস শুনিয়া গোবর্ধন বলিয়াছিল—"হ্যাঁরে মাণকে, পেয়ারা আবার পাকে? এমন কথা শুনেছিস্ কি কখনও? ব্যাটার মতলব আমাদের পাকা পেয়ারার লোভ দেখিয়ে পরে পেয়ারাগুলি পেড়ে নেবে।"

গোবর্ধনের ধারণা নাই যে পেয়ারা পাকিতে পারে কারণ সে গ্রামের কোন গাছের পেয়ারা পাকিবার সময় দেয় না। পাকিবার পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া থাকে। তিনকড়ির কথা শুনিয়া আমার রাগ হইল—বলিলাম "তিনু খুড়ো আপনাদের জমীদারের ছেলে যদি এত ভদ্র ত আমাদের সঙ্গে মেশে কেন? আটকে রাখতে পারেন না?"

তিনকড়ি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব দিল না। আমি খোকাকে বলিলাল—"না ভাই আমি তোমার সঙ্গে খেলব না। তুমি কেন আমাদের সঙ্গে মিশে দুষ্টু হ'য়ে যাবে?"

খোকা আমার কথা শুনিয়া তিনকড়ির উপর অত্যন্ত রাগিয়া গেল—বলিল, "আমি বদ্মাস্ আছি ঘরে আছি—তুই আমাদের মাইনে খাবার চাকর, তুই বলবার কে রে—"

তিনকড়ি খোকার রাগ দেখিয়া অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গেল। মনে করিল তাহার মনিব যেন তাহাকে ভৎর্সনা করিতেছে—তাই নরম সুরে উত্তর করিল "না খোকা বাবু তোমাকে রাগিয়ে দেবার জন্যই ঐ সব কথা

ব'লছিলুম।" পরে হারাধনের দিকে ফিরিয়া বলিল—"বলি ও হারু, দাও ত খোকাবাবুকে এক টাকার খাস মণ্ডা, দামটা আমিই দেব'খন।"

খোকা ও আমি খাস মণ্ডার জন্য অপেক্ষা না করিয়া খোকাদের বাড়ীতে গেলাম। হারাধন আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে মণ্ডা লইয়া বাড়ী ঢুকিল।

খোকার পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও হারু তোমার হাতে কি?"

হারু অত্যন্ত বিনীত স্বরে জবাব দিল—"দিদিমনি, খোকা বাবুর জন্য ভাল মণ্ডা ক'রেছিনু তাই দিতে এসেছিলুম—"

আহা তোমরা গরীব মানুষ তা অমনি দিতে পাবে কোথায়, দাম নিয়ে যেয়ো।

"না দিদিমনি দাম দিতে হবে না, খোকাবাবু খেলেই আমার দাম পাওয়া হ'য়ে যাবে।"

খোকার পিসীমা হাত বাড়াইয়া মণ্ডা লইয়া বলিলেন "ওরে—ও খোকা, তোর জন্য হারু মণ্ডা নিয়ে এসেছে, নে খা দু'খানা।" এই বলিয়া পিসীমা খোকার হাতে চার পাঁচটি মণ্ডা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় খোকা বলিল—"পিসীমা মাণিকদাকে দিলে না যে?"

"দাঁড়া বাপু সবই ছেলের বাড়াবাড়ি, দিই কি না ত্থাখ একবার," এই বলিয়া একটি মণ্ডার একটি অংশ ভাঙ্গিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি সঙ্কুচিত চিত্তে হাত বাড়াইয়া লইলাম। প্রায় দুই সের মণ্ডা হইতে মাত্র আধখানি মণ্ডা দান করিতে ইতিপূর্বে কোন মহিলাকে আমি দেখি নাই। মণ্ডার অংশটী খাইব কি না ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া খোকার পিসীমা বলিলেন "খাও বাবা খাও, লজ্জা কি—তুমি আমার খোকার বন্ধু, ঘরের ছেলে। খোকার আমার আপন পর বোধ নাই, সবাইকে মুখের গ্রাস তুলে ত্থায়। নাও বাবা লজ্জা ক'রো না, খেয়ে ফেল।"

বাধ্য হইয়া মণ্ডাটি খাইয়া ফেলিলাম।

খোকা বলিল—"হ্যাঁ পিসীমা অত মণ্ডা থাকতে একটু ভেঙ্গে যে মাণিকদাকে দিলে ?

—"আহা ছেলের কথা গ্যাখ। অত আবার কোথায়! আধখানা ক'রে ঘরের লোককে দিলে কুলুবে না।"

এই জীবনে বহু মহিলার স্নেহের পরিচয় পাইয়াছি, সাধারণতঃ নারীজাতির উপর আমার শ্রদ্ধা সহজাত ভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু খোকার পিসীমার মত দুই একটি নারীর এমন চরিত্র দেখিয়াছি যে তাহা বিস্মৃত হওয়া কঠিন। বহুবার খোকার সহিত পাশাপাশি বসিয়া খাইয়াছি এবং যখনই এই মহিলা খাদ্যবস্তু পরিবেশন করিয়াছেন তখনই খোকাকে আমাপেক্ষা অন্ততঃ চতুগু'ণ পরিবেশন করিয়াছেন।

এই মহিলাটির চক্ষুলজ্জা বলিয়া কোন জিনিষ দেখি নাই। এক খোকা ব্যতীত ইহাদের চক্ষুলজ্জার বালাই কাহারও ছিল বলিয়া জানি না। তথাপি পিসীমার সহিত অপরের তুলনা হয় না।

খোকা ও আমি মণ্ডা খাইয়া বাহির হইলাম। পথে গোবর্ধনের সহিত দেখা। গোবর্ধন বলিল—"কোথায় যাচ্ছিস সব।"

আমি বলিলাম—কোথায় আর যাব এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

গোবরা বলিল—"চল্—তিনু খুড়োর গাছে পেয়ারা আছে নাকি দেখা যাক্।"

আমি বলিলাম—"না তিনু খুড়োর ওখানে যাব না।"

খোকা উচ্চ কণ্ঠে বলিল—"কেন যাব না দুটো পেয়ারা খাব তা দেবে না ?—আমাদের মাইনে খায় না সে—?"

সত্যই সে যে খোকাদের বেতনভুক কর্মচারী এবং এই কিছুক্ষণ পূর্বে হারাধনের দোকানে তিনকড়ির খোকাকে ভয়ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাই আমিও আর অমত করিলাম না। তিনু খুড়ো গৃহে না থাকিলেই সাধারণতঃ ছেলেরা তাহার পেয়ারাগাছে চড়াও হয়।

পেয়ারা গাছটি তিনু খুড়োদের বাড়ী হইতে সামান্য দূরে। আমরা তিন-জনে পেয়ারা গাছের তলায় হাজির হইলাম। গোবর্ধন গাছে উঠিল, আমি ও খোকা একটু অন্তরালে গা ঢাকা রহিলাম। এমন সময় তিনকড়ির কন্যা রাজলক্ষ্মী ওরফে রাজু পেয়ারা গাছের তলায় আসিয়া হাজির। রাজু বালবিধবা, বয়স কুড়ি একুশের ঊর্ধ্বে হইবে না। সে গোবর্ধনকে যৎপরোনাস্তি গালিগালাজ করিতে লাগিল। আমাদিগকে অবশ্য সে দেখিতে পায় নাই তাই আমরা গোবর্ধনের অসহায় অবস্থায় প্রমাদ গণিলাম। গোবর্ধন চোর, সে ধরা পড়িয়াছে তাহার আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গোবর্ধন গাছ হইতে নামিতেই রাজু উগ্রচণ্ডার মত মূর্তি ধরিয়া বলিল—"চল্ তোকে জমীদার বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে যেয়ে একবার পেয়ারা চুরির মজা দেখাচ্ছি।" ইহা ছাড়া গোবর্ধনের পিতৃ-পুরুষের যথারীতি সদ্গতি করিয়া অশ্রাব্য ভাষায় গোবর্ধনকে গালি দিতে লাগিল। খোকা বলিল—"মাণিকদা, গোবরদাকে অত গাল দিচ্ছে এর বিহিত করতে হবে।"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই করা উচিৎ।"

খোকা আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া একবারে রাজুর সম্মুখে হাজির হইয়া বলিল—"সংযুক্তা, কর তুমি সংযত রসনা—জেন মনে সীমা আছে মানব ধৈর্যের—"

খোকাকে দেখিয়া রাজু একেবারে চুপ হইয়া গেল—বলিল—"রাজাবাবু তুমি! তা পেয়ারার দরকার ছিল ত বল নাই কেন?"

গোবরা বলিল—"কেন গো লক্ষ্মী এবার যে বড় গাল বন্ধ হ'য়ে গেল? জোঁকের মাথায় চূণ পড়ল বুঝি? এখন রাজাবাবুকে পেয়ারা খাওয়াতে মন যায় যদি তবে আমাকে হুকুম দাও—আমিও 'চল ধীরি ধীরি পেয়ারা তুলি' করে পেয়ারা গাছে উঠি।" গোবরা ঐ অংশটি সুর করিয়া বলিল। খোকাদের বাড়ীর গ্রামোফোনের রেকর্ডে 'সংযুক্তা কর

তুমি সংযত রসনা' শুনিয়া, এই অংশটি কাহারও কথা থামাইবার সময় আমরা প্রয়োগ করিতাম। খোকা রাজুর বাক্যের ঐরূপ উত্তর দেয়। কিন্তু এইখানেই ঐ ব্যাপারের সমাপ্তি ঘটে নাই। খোকার কথা ও গোবর্ধনের গান শাখাপল্লবে বিস্তারিত করিয়া রাজু ও তার পিতা জমীদারের কাছে নালিশ করে—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যাহা কিছু অভিযোগ গোবর্ধনের বিরুদ্ধেই করিয়াছে আমার ও খোকার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে নাই।

জমীদারের পেয়াদা যাইয়া গোবর্ধনকে ধরিয়া আনিল। গোবর্ধনের পিতা জমীদারের কাছে গোবর্ধনের হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু জমীদার মধুসূদন ভট্টাচার্যের মন গলিল না। গোবর্ধনকে কাছারি বাড়ীর খুঁটিতে বাঁধা হইল এবং জমীদার স্বয়ং ও তিনকড়ি গোবর্ধনের সর্বাঙ্গে জুতা দিয়া প্রহার করিতে লাগিল। সে কি নির্মম প্রহার! মামার কাছে আমরা অনেক মার খাইয়াছি কিন্তু এমন নির্মম অসম্মানজনক মার আমি দেখি নাই। একটি বালককে একজন জমীদার ও তাহার গোমস্তা এমন ভাবে প্রহার করিতে পারে তাহা চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। যখন প্রহার চলিতেছিল দর্শকবৃন্দের কাহাকেও প্রতিবাদ করিতে দেখি নাই এবং গোবর্ধনের ঐরূপ অবিমৃষ্যকারিতায় সকলে ঐ প্রহারকে সমর্থন করিতে লাগিল। কেহ বলিল—'বেশ হচ্ছে যেমন কর্ম তেমনি ফল।' কেউ কেউ বলিল—'এবার রাজাবাবু গ্রামের ছেলেদের ঢিট করে দেবে'—ইত্যাদি, গোবর্ধন কাঁদিতেছে—'বাবা গো আমি ম'রে গেলুম গো'—আর গোবর্ধনের পিতা কাঁদিতেছে—'রাজাবাবুগো, এবার ছেড়ে দেন গো, ছোট ছেলে ম'রে যাবে গো! রাজা বাবু, ওর বদলে আমাকে মেরে ফেলুন গো—'

গোবর্ধন প্রহার খাইয়া প্রায় অজ্ঞান, সেই অবস্থাতে তাহাকে বাড়ীতে আনা হইল। গোবর্ধনের পিসীমা দিগন্ত কাঁপাইয়া কান্না

আরম্ভ করিল—'ওরে গোবরা চল্ বাপ্ তোকে নিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে কোথাও চলে যাই—এমন দুধের ছেলেকে যেখানে বেঁধে মারে সেখানে কি মানুষে বাস ক'রতে পারে!—ওরে সেখানে কি মানুষ ছিল না যে বাছাকে আমার ছাড়িয়ে আনে। ওরে এমন গাঁয়ে আবার মানুষ বাস করে। আমরা গরীব কি ব'লে আমাদের এমনি ক'রে মারবে! ভগবান কি নাই, হে ভগবান এর বিচার কোরো, তুমি ছাড়া আর গরীবের কে আছে—'

গোবর্ধনের পিসীমার কান্না ভগবানের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না জানি না—কিন্তু হরিশপুরের মানুষ সে কান্না শুনিয়াও শোনে নাই। একজন জমীদার ও তাহার গোমস্তা সামান্য কারণে একজন শিশুকে এমন নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে পারে এবং সেই প্রহারের প্রতিবাদ ত দূরের কথা গ্রামের লোকে সমর্থন করিতে পারে এ চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আমি ঠাকুরমাকে বলিলাম "ঠাকুমা গোবরাকে খোকার বাবা ও তিনু খুড়ো খুব মেরেছে।"

ঠাকুরমা বলিলেন—"মরুকগে দাদা তুমি ওসবে থেক না। তুমি যখন জমীদারের ভাল নজরে প'ড়েছ তখন আর তুমি যেন জমীদারের বিষ নজরে প'ড় না।"

—"গোবরা ত তেমন কিছু দোষ করে নাই ঠাকুমা?"—"না দোষ করে নাই আবার? এমনই কি মারতে গেল শুধু শুধু। গোবরার সঙ্গে মিশিস না, গাঁয়ের মধ্যে বখাটে ছেলে সে!"

গোবর্দ্ধন গাঁয়ের মধ্যে বখাটে ছেলে। অন্য ছেলের সহিত তাহার কিছুই তফাৎ নাই—তফাতের মধ্যে গোবর্ধনরা গরীব এবং গোবর্ধনের গৃহে বিমাতার জন্য ঠাঁই নাই। তাই গোবর্দ্ধন কোনরূপ শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত নয়। এই সব ত্রুটির জন্য ত গোবর্ধনকে দোষ

দেওয়া যায় না। কিন্তু কি আশ্চর্য গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা গোবর্ধনকে দোষ দিতে ত্রুটি করিত না।

সাধারণত লোকে শৈশব জীবনকে মধুর বলিয়া থাকে। মানুষ কেন যে এরূপ মত পোষণ করে আমি ভাবিয়া পাই না। হয়ত পরিণত বয়সে মানুষ তাহার রঙিন বাসনাকে বাস্তবে খুঁজিয়া পায় না তাই হয়ত শৈশব তাহাদের মধুর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমি শৈশবকালকে ভয়াবহকাল বলিয়াই মনে করি। তবুও শৈশবে কিছু কিছু মধুর ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে ,বলিয়াই শৈশবকে মধুর বলিয়াই মনে হয়। শিশু অতি সহজেই তাহার দুঃখ ভুলিয়া যায়। যে তাহাকে কাল শাস্তি দিয়াছিল সে যদি তাহাকে আবার সান্ত্বনা দেয় শিশু তাহার সকল দোষ অতি সহজে ক্ষমা করে। আবার তাহাকে আপনজন বলিয়া গণ্য করে। গোবর্ধন অল্প দিনেই তাহার প্রহারের দুঃখ বা লাঞ্ছনা ভুলিয়া গেল।

৯.

আষাঢ়ের মধ্যাহ্ন দীর্ঘ। আমরা ঐ দীর্ঘ মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে ঘরের কোণে না থাকিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ঠাকুরমা বলিতেন "রোদে রোদে ঘুরিস কেন? রোদ লাগে না?" ঠাকুরমার কথায় আশ্চর্য বোধ করিতাম। রোদ আবার লাগে না কি? মনে মনে ভাবিতাম রোদ কি মার যে লাগিবে? প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন রবি যখন ধরিত্রীকে উষ্ণ হইতে উষ্ণতর করিত ঠিক তখনই ছিল আমাদের খেলিবার সব চেয়ে ভাল সময়। কারণ বয়স্ক ব্যক্তিরা তখন বড় একটা ঘরের বাহির হইত না। একদিন ঐরূপ খর রৌদ্রে ঠাকুরমা জোর করিয়া আমাকে ঘরে শোয়াইয়া নিজেও শুইলেন।

ছটু তাহার পুতুল লইয়া ব্যস্ত, তাহার একটি কন্যা নাকি শ্বশুরবাড়ী যাইবে কিন্তু তখনও পাল্কি আসিয়া হাজির হয় নাই। ছটু আমাকে বলিল "দাদা তুমি একবার দেখতে পার পাল্কি বেহারা আসছে কি না?" পাশের বাড়ীর একটী বালিকার ছেলের সহিত ছটুর মেয়ের বিবাহ হইয়াছে, পাল্কি সেখান হইতেই আসিবে। ছটুর কন্যার পাল্কি তখনও না আসায় আমিও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। বলিলাম "ছটু তখনই বলেছিলুম ওদের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিস্ না সুখ হবে না।" ছটু ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"তোমার কি তুমি ত ব'লে খালাস ঐ কালটা মেয়েকে কে বিয়ে করত শুনি? যে দেখে সেই অপছন্দ করে। তা ছাড়া আমার টাকা থাকত তবে আলাদা কথা।" ছটুর 'কালটা' মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটি চার পয়সা দামি কাঁচের পুতুল, ধবধবে সাদা। মায়ের বেনারসি বস্ত্রের টুকরা কাটিয়া ছটুর কন্যার পরিধেয় বস্ত্র করা হইয়াছে। একটা সাদা পুতুল কাল হইল কি করিয়া অত কথা ভাবিবার বয়স ছটুর হয় নাই। আমার হইলেও, পুতুল জগতের বিচিত্র কথার সহিত আমিও পরিচিত। কনক যেদিন ছটুর কন্যা দেখিতে আসে সেদিন সে বলে ছটুর বংশ ভাল বলিয়াই কাল মেয়ে হইলেও সে তাহার বৌ করিবে। তা ছাড়া ছটুর কন্যার নাকি গৃহস্থালির কাজকর্ম অপর কন্যাদের অপেক্ষা বেশী শেখা আছে। তাই অতি সহজে ছটুর কাল মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল। আমার চোখে ঘুম নাই ছটুও উদ্‌বিগ্ন চিত্তে ঘর বার করিতেছে আর বলিতেছে "যাও দাদা ঠাকুমা ঘুমিয়ে গেছে জানতে পারবে না।" আমিও ঠাকুরমার চক্ষুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে ছিলাম। কারণ যদি সত্যই ছটুর কন্যাকে না লইয়া যায় তবে নিন্দার কথা। বিশেষ করিয়া কনকরা অত্যন্ত ছোট-লোক হয়ত সে তাহার পুত্রের বিবাহ দিয়া দিতে পারে—তাই বলিয়া ছটু ত পারে না। কিন্তু আমি যে কথা চিন্তা

করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি ছটু আমার উদ্‌বেগ কাটাইয়া বলিল "দাদা একবার দেখে এস—যদি ভালয় ভালয় পাল্কি পাঠায় তবে ত ভাল, নয় ত আমি ও বিয়ে ফিরিয়ে নেব।" পুতুলের জগতে বিবাহ ফিরিয়া লওয়া চলে। আমি বলিলাম "না বিয়ে যখন হয়েছে তখন আর ফেরাফেরিতে কাজ নাই।" আর ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম—"আমি দেখে আসি পাল্কি এসেছে কি না?" কনকের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম কয়েকজন ছেলে দাঁড়াইয়া আছে তবে ছটুর কন্যা আনিবার গরজ বিশেষ দেখা যাইতেছে না। গোবর্ধন সেখানে দাঁড়াইয়া। বলিলাম—"গোবরা ছটুর মেয়ে যে সাজ ক'রে বসে আছে।" গোবরা বলিল "আমরা কি করব? আমি আর গোপলা কখন এসে ব'সে আছি কিন্তু কনকের মা যে পাল্কিটাকে তুলে রেখেছে। সেদিন অনুপমার মেয়েকে আনতে যেয়ে পাল্কির ডাঁট ভেঙ্গে গেছে।"

—"তবে কি হবে?"

কনক আসিয়া বলিল—"হবে আর কি, গোবরদা ব'লেছে গরুর গাড়ী এনে দেবে?

আমি বলিলাম—"পাল্কী ছাড়া কি মেয়ে পাঠাবে?"

কনক বলিল—"না পাঠায় ভারি ব'য়ে যাবে না হয় সে বিয়ে ফিরিয়ে নেবে।" বুঝিলাম বিবাহ ফিরাইয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমি আর ও ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইলাম না। ছটুকে খবর দেওয়াও সমীচীন বোধ হইল না। কারণ ঠাকুরমার যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তবে আমাকে আবার শুইতে বলিতে পারেন। গোবরা বলিল—"অত ভাবতে হবে না। গরুর গাড়ীতে ক'রে ছটুর মেয়েকে আনলেই হবে। চল বরং ডাকাত ডাকাত খেলি গে।" আমরা সকলেই রাজী হইয়া গেলাম। নেপাল, সজনী, নগেন, গোপাল ও কনক সকলেই রাজী হইয়া গেল। ঠিক হইল আমি গৃহ-স্বামী, কনক আমার

স্ত্রী। আমরা রাত্রিকালে ঘুমাইতে থাকিব গোবর্ধন ও নেপাল ডাকাত হইয়া কনকের অলঙ্কার চুরি করিবে। তারপর আমি ও নগেন দারোগার কাছে নালিশ করিব। নগেন সজনী ও গোপাল কনেষ্টবলকে লইয়া ডাকাতের সন্ধান করিবে এবং সারা দুপর ডাকাত খুঁজিতে ব্যস্ত থাকিবে। কনকদের বাহিরের ঘরে আমি ও কনক শুইয়া পড়িলাম। ঐ ঘরে একটি জানালা ছিল কিন্তু জানালায় কোন গরাদে ছিল না। ডাকাতি করিবার পক্ষে ঐ ঘর খুব উপযুক্ত ছিল। আমি পূর্বেই শয্যা গ্রহণ করিলাম। কনক ঘোমটা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল দিল। কনক আমার বৌ তাই সে ঘোমটা দিয়াছে। কনক আমার শয্যার একাংশে শুইয়া পড়িল।

আমি বলিলাম—কনক গোবরা কি ক'রছেরে?" কনক বলিল—"গোবরা ত এখন ডাকাত সাজতে গেছে। এখন আর গোবরা বললে চলবে কেন?" কথা ঠিক। গোবরা এখন ডাকাত, কনক আমার বধূ। কনক চুপি চুপি বলিল, "ও বর ঘুমিয়ে প'ড়লে?" কনকের আমি মাণিকদা অবশ্য এখন সাময়িকভাবে তাহার বর হইয়াছি তবুও কথাটা কেন জানি না আমার কর্ণে বিচিত্র সুরে ধ্বনিত হইয়া যেন সাহানার মধুর ধ্বনির মত মনে হইল। কনকের দিকে চাহিলাম। কনক আমার বধূ যেন অন্য কোন সম্বন্ধ নাই—যেন খুব আপনজন। কনক তখন সপ্তম বর্ষের ছোট্ট একটি বালিকা! সুন্দর নাক মুখের গড়ন। ধবধবে রং। সেই কনক আমার বধূ। আমি অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। কনককে বলিলাম—"বৌ শুয়ে পড় তুমিও, এখুনি ডাকাত এসে প'ড়বে।" কনক আমার পার্শ্বে শয্যাগ্রহণ করিল। কনক বলিল "আচ্ছা ডাকাত এলে তখন কি ক'রতে হবে?" ডাকাত এলে ঠিক কি করা উচিত আমার জানা ছিল না। গৌর পালের বাড়ীতে নাকি একবার ডাকাত পড়িয়াছিল

তখন আমার ত দূরের কথা আমার বাবারও জন্ম হয় নাই। কিন্তু সেই ডাকাতির গল্প গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শুনিয়া আসিতেছে—ঘটনা যেন মাত্র সেদিন ঘটিয়াছে। আমি সেই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া বলিলাম—"ডাকাত এসে জ্বলন্ত কাট নিয়ে গায়ে ছেঁকা দেবে।" কনক রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। করুণ কণ্ঠে বলিল "আমাকে লাগবে না বুঝি?"

আমার বধূর অঙ্গে জ্বলন্ত অঙ্গারের তাপ লাগিবে ইহা আমারও ভাল লাগিল না। কিন্তু গোবর্ধন যেরূপ ডাকাত তাহাতে সে নিশ্চয়ই ছেঁকা না দিয়া ছাড়িবে না।

কনক বলিল—"তা হলে কি হবে? তুমি তখন কি করবে?" আমি বলিলাম "আমি গৌর পালের মত পগার পার।" গৌর পালের বাড়ীর ডাকাতির বিবরণ আমি কনককে শুনাইতে লাগিলাম। গৌর পালের তখন 'ধনে ধান কাপাসে মান।' তাহার দরজায় হাতী ঘোড়া বাঁধা না থাকুক এ তল্লাটে তাহার সমকক্ষ অর্থশালী লোক কেহ ছিল না। তখন এদেশে প্রায়ই ডাকাতি হইত। একদিন গৌর পালের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। গভীর রাত্রি। সেদিন নাকি সারা-রাত্রি মেঘ করিয়াছিল। এত অন্ধকার যে সামনের মানুষও চোখে দেখা যায় না। এমন সময় কাহারা দমাদম্ বাহিরের দরজায় ঘা দিতে লাগিল। গৌর পালের বুঝিতে দেরী হইল না যে ডাকাত পড়িয়াছে। গৌর পাল সিন্দুকের চাবি এবং তাহার স্ত্রীর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিল—তারপর আস্তে আস্তে বলিল—"পাল বৌ তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাক আমি বাইরে কিসের শব্দ হচ্ছে দেখে আসি।" গৌর পাল যখন খিল খুলিয়া উঠানে নামিল তখন সদর দরজা ভাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। গৌর পাল দেখিল আর রক্ষা নাই। গৌর পালের গৃহের প্রাচীরের নিকট একটি আমগাছ

ছিল। গৌর পাল প্রাণভয়ে সেই আমগাছে উঠিয়া প্রাচীর পার হইয়া নিকটস্থ এক বাঁশবনে আশ্রয় লয়। এদিকে ডাকাতরা দরজা ভাঙ্গিয়া পাল গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করে—গৌর পাল কোথায়? পাল গিন্নী ভীতকণ্ঠে জবাব দেয় "এই মাত্র কোথায় গেল।" ডাকাতদল পাল গিন্নীর কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া পাল গিন্নীর নাকের নথ ধরিয়া টান দিয়া নথটি কাড়িয়া লয়। পাল গিন্নীর নাক কাটিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে। কনক ভয়ে নাকে হাত দিল—বলিল "আমি ত নথ পরি না।" আমি বলিলাম "কিন্তু মাকড়ি?" কনক শঙ্কিত হইয়া উঠিল—"মাকড়ি টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল নাকি?"

—"নেয় নাই আবার? দেখিস নাই পাল বুড়ির এখনও নাক কান কাটা?" কনক ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। কনক বলিল তারপর? আমি বলিলাম তারপর ডাকাতরা বলিল "দে সিন্দুকের চাবি দে?" পাল গিন্নী চাবি কোথায় পাবে? গৌরপাল ত এদিকে চাবি নিয়ে পগার পার। ডাকাতেরা চাবি না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া একটি কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করিয়া পাল গিন্নীর সর্ব্বাঙ্গে ছেঁকা দিতে থাকে। তথাপি চাবি না পাইয়া শেষকালে সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করে। কনকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যেমন ডাকাতেরা পাল গিন্নীকে সাজা দিয়াছিল তাহার উপযুক্ত ফলও পাইয়াছিল। গৌর পাল বাঁশঝাড় হইতে ডাকাতদের চিনিতে পারে এবং ডাকাতরা ধরা পড়ে। বিচারে ডাকাতদের দ্বীপান্তর হয়। দ্বীপান্তরের কথা শুনিয়াও কনকের ভয় ঘুচিল না। ভয়ে ভয়ে বলিল "ডাকাত পড়লে তুমি পালিয়ে যাবে?" পলাইয়া আমাকে অবশ্য যাইতে হইবে; কিন্তু কনকের ভীত ত্রস্ত মুখ দেখিয়া কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। কনক বলিল, 'না বর তুমি আমাকে ফেলে পালিও না।' কনক বলে কি? আমি কি কনকের জন্য মারা পড়িব? হইলই বা সে বউ। তাই বলিলাম—

"পালাব না ত কি প'ড়ে প'ড়ে মার খাব ?" কনক আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"না তুমি পালাতে পাবে না ?" কনককে কোন সান্ত্বনা দিতে পারিলাম না। কনক আমাকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধরিয়া আছে। যদিও আমি বালিকা বধূকে ফেলিয়া পলাইতে ইচ্ছুক ছিলাম না কিন্তু কি করিব আমি নিরুপায়।

১০

কৈশোরে প্রেমে পড়িবার বয়স জানি, কিন্তু শৈশবে মানুষ প্রেমে পড়ে কি না জানি না। আমার ধারণা মানুষ শৈশবে প্রেমে পড়িতে পারে। আমি সেদিন খেলার সাথী কনককে আমার সত্যকার বধূ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখ'নি ডাকাত আসিয়া তাহার অশেষ নির্যাতন করিয়া তাহার কাণ ছিঁড়িয়া মাকড়ি লইয়া যাইবে এই চিন্তায় সেদিন আকুল হইয়াছিলাম; বিশেষ করিয়া গোবরাকে আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। ডাকাতি করিতে আসিয়া আমার বধূ বলিয়া সে যে স্নেহাই দিবে সে পাত্র সে মোটেই নয়। কনকের অবশ্য সেদিন নাক কাণ কিছুই ছেঁড়া যায় নাই। কারণ গোবর্ধন আসিবামাত্র সে ভয়ে এমন চিৎকার করিয়া উঠে যে কনকের মা ছুটিয়া আসে। গোবর্ধনের কপালে যাহা ঘটিয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কনকের মা গোবর্ধনকে যৎপরোনাস্তি গালিগালাজ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। আমিও অবশ্য কনকের অবিমৃশ্যকারিতায় সেদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে অমন মেয়েকে বৌ করা ঠিক হয় নাই; অমন সুন্দর ডাকাত খেলা নষ্ট হইয়া গেল। তার চেয়ে 'মিলি'কে (মৃণালিনী) বৌ করিলে আমাদের খেলা সুন্দর জমিয়া যাইত। আপাততঃ কনকের উপর রাগ করিলেও কনক যেন সেদিন আমার হৃদয়ের কোন অজ্ঞাত স্থানে দাগ

কাটিয়া দিয়াছিল। কনক ছটুর কন্যাকে যথাসময়ে না আনার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিয়াছিল—"আমি কি করব ছটু? তোর দাদাই ত বউ. বউ খেলতে লেগে গেল আমি বউ আনি কি ক'রে?" ছটু আমার এই ছেলে মানুষিতে সেদিন অত্যন্ত চটিয়া যাইয়া বলিয়াছিল "তোমার কি আক্কেল দাদা? আমি এদিকে সাথ ক'রে বসে আছি। এখুনি পাল্কী আসছে আর তুমি যেয়ে 'বৌ' 'বৌ' খেলতে লেগে গেলে!" সেইদিন হইতে ছটু আমার উপর রাগিয়া গেলে বলিত "যাও না তোমার বৌয়ের কাছে—আমার সঙ্গে খেলতে ভাল লাগবে কেন?" এইরূপে কনক ও আমার মধ্যে যেন এক অজ্ঞাত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে।—তারপর কয়েকটী বছর পার হইয়া গিয়াছে, আমি এখন আর শিশু নই। কনক তখন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আমিও সে বৎসর আই এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছি। কনকের মা একদিন আমার মায়ের কাছে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—'মাণিকের মা, নেহাত কুলের দায় তাই, নইলে কনককে আমার মাণিকের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম।' কনক নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। কনকের মায়ের কথা শুনিয়া আমি কনকের দিকে চাহিয়াছিলাম। দেখিলাম কনক আমার দিক হইতে লজ্জায় তাহার মুখ ফিরাইয়া লইতেছে! আজও কনকের সেদিনের লজ্জাবনত রক্তিম গণ্ড স্মরণ করিয়া শৈশবের মধুর দিনের কথা মনে পড়িয়া যায়। সেদিন কনকের মায়ের কথায় আমি যেন কি আমার পাওয়া জিনিষ হারাইয়া যাওয়ার ব্যথা অনুভব করি। কৌলিন্য মর্যাদা আমার ভাগ্যে নাই। যাহার বাকী জীবনে কেবল খাদ লইয়াই কারবার তাহার জীবনে কনক লাভ কেমন করিয়া ঘটিবে!

কনকের অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল। এক শ্রেণীর লোক সোনা হারাইলে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া থাকে। আমি সেই শ্রেণীর লোক নহি। কনকের বিবাহকে আমি সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। হয়ত সেই

সময় কনকের উদ্দেশ্যে দুই একটা কবিতা লিখিয়া থাকিব। কনকের বিচ্ছেদই তাহার মূল কারণ তাহা নয়, সে দিন কনককে অবলম্বন করিয়াই আবার রঙ্গিন বাসনা পাখা মেলিয়া মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতেছিল। মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গম ফিরিয়া আসিয়া কনকের পাখায় পুনরায় বসিবে এমন কোন কথা নাই। কনকের বিবাহের পর কয়েকটা বসন্ত কাটিয়া গিয়াছে। আমার জীবন তখন ছন্নছাড়া হইয়া সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়া ছন্দহারা জীবনের প্রথম ধাপে সবেমাত্র পদক্ষেপ করিয়াছি।

ফাল্গুনের চাঁদ যখন আলো দেয় তখন অকৃপণ ভাবেই দিয়া থাকে। কিন্তু ধূলিসমাচ্ছন্ন মলিন পৃথিবী সেই আলোর সবটা গ্রহণ করিতে পারে না। আমি আমার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ম্লান চাঁদের দিকে চাহিয়া আছি। কনক একটি হারিকেন হাতে করিয়া আসিয়া আমার হাতে একটি টেলিগ্রাম দিল। টেলিগ্রামটি খুলিয়া পড়িলাম। গিরিডি হইতে কনকের স্বামী টেলিগ্রাম করিতেছে তাহার অসুখ, কিছু টাকা না পাঠাইলে পথ্য এবং চিকিৎসা অভাবে সে মারা যাইবে। বলিলাম—"কনক যোগেশ বাবুর অসুখ, তাকে কিছু টাকা পাঠাতে হয়।" কনক বলিল—"মিথ্যে কথা মাণিকদা, এই নিয়ে তার চারবার টেলিগ্রাম করা হল। আমি তিনবার টাকা পাঠিয়েছি, এ তার মিথ্যে টেলিগ্রাম।"

আমি বলিলাম—"সত্যি-মিথ্যে কি ক'রে বুঝব কনক এখান হ'তে। কিন্তু অসুখ যদি সত্যি হয় তখন তাকে মিথ্যে মনে ক'রে যেন ভবিষ্যতে আপসোস করতে না হয়।"

কনক উত্তর করিল—"তাকে তুমি জান না মাণিকদা, পয়সার জন্য তার অকরণীয় কিছুই নাই। সে এইরূপ আমাকে তিনবার প্রতারণা ক'রেছে, আমি আর তার টেলিগ্রামে ভুলব না।"

আমি বলিলাম—"অসুখ সত্যি কি মিথ্যে কনক একবার তুমি যেয়ে যাচাই ক'রে আসতে পার ত ?"

কনক উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল—"আমি ঠিক জানি এ তার মিথ্যে প্রতারণা—আর যাব কোথায় মাণিকদা সেখানে কি আমার স্থান আছে ? না কোন ভদ্রলোকের মেয়ে তার কাছে যেতে পারে ?"

কনকের স্বামী চরিত্রহীন সে কথা আমার জানা আছে। গিরিডিতে সে রেলে কাজ করে। একটী নীচ জাতীয়া রমণীর সহিত সে সেখানে বসবাস করে। তাই কনকের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তবুও জবাব দিলাম—"একবার যাওই না তুমি, তোমার ত একটা কর্তব্য আছে।"

কনক ও কনকের মা আমার প্রস্তাবে রাজী হইল। ঠিক হইল পরের দিন আমি তাহাকে গিরিডি লইয়া যাইব। এবং সম্ভব হইলে কনককে তাহার স্বামীর কাছে রাখিয়া আসিব। কারণ কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে কনকের মত ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাই বলিয়া কে কবে স্বামীর সহিত ঘর করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

গিরিডিতে কনক ও আমাকে দেখিয়া কনকের স্বামী যোগেশ জ্বলিয়া গেল। আমি কনকের মত একজন যুবতীকে লইয়া গিরিডি আসায় কনককে লইয়া সে ঘর করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের ঘরে এরূপ ব্যভিচার নাকি সহ্য করা সম্ভব নয়। কনককে গিরিডি আনিবার পূর্বে এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে ভাবি নাই। অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়াও যোগেশকে রাজী করাইতে পারিলাম না। বাধ্য হইয়া কনককে আমার সহিত ফিরিতে হইল। কনককে ফিরাইয়া দেওয়া যোগেশের দরকার। কনকের মা যদি সঙ্গে থাকিত তবুও সে অন্য কোন অজুহাতে ফিরাইয়া দিত। পরের ট্রেনেই গিরিডি হইতে রওনা হইলাম। মধুপুরে গাড়ী বদল করিতে হয়। পূর্বগামী ট্রেন সকালের এদিকে আর পাওয়া যাইবে

না। বাধ্য হইয়া আমাদের মধুপুরের ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইতে হইবে। ইণ্টার ক্লাস ওয়েটিং রুমে আশ্রয় লইলাম।

কনক বলিল—"মাণিকদা রাত হ'য়ে গেল, কিছু খাবার কিনে খেয়ে নাও; এরপর আবার খাবার পাবে না।" কিছু খাবার কিনিলাম। কনক কিছুই খাইল না। খাইবার মত মানসিক অবস্থা তাহার ছিল না। সে এক পার্শ্বে শয্যা পাতিয়া কিছুদূরে আমার শয্যা প্রস্তুত করিয়া শুইয়া পড়িল। আমি শয্যা গ্রহণ না করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিলাম। ষ্টেশনে আর জনপ্রাণী নাই। অদূরে একটা ইঞ্জিন শেঁা শেঁা করিতেছে। ফাল্গুনের শুক্লা রজনীর চাঁদ মধুপুরের আকাশে মধু বিতরণ করিতেছে। চাঁদের দিকে চাহিলাম। ফাল্গুনের চাঁদ অকৃপণ হইয়া কিরণ বিতরণ করিলেও ধূলিসমাচ্ছন্ন পৃথিবীকে সে সম্পূর্ণ আলোকিত করিতে পারে নাই। দ্বাদশীর চাঁদের এক টুকরা কিরণ কনকের মুখে পড়িয়াছে। কনকের শুভ্র মুখ চন্দ্র কিরণে উদ্ভাসিত হইলেও কনক বলিয়া চেনা যায় না। মনে হয় যেন কোন অচেনা নারী অদূরে শুইয়া আছে। ঈষৎ আলো-আঁধারে যেমন পরিচিত বস্তুকেও চিনিতে কষ্ট হয় কনককেও যেন আমার সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। শুভ্র চাঁদের কিরণ তাহার বেদনা ক্লান্ত মুখ-মণ্ডলকে পাণ্ডুর করিয়াছে। চুপি চুপি চোরের মত কনকের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাল্যকালের কথা মনে পড়িয়া গেল। ডাকাত ডাকাত খেলিতে যাইয়া এই কনক আমার কণ্ঠ লগ্ন হইয়া শুইয়াছিল। সেদিনের সেই ভীরু কাতর মুখশ্রী আমার মানস নয়নে ভাসিয়া উঠিল। তারপর রঙ্গমঞ্চের কয়েকটা দৃশ্য পর পর যেন আমার চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কনকের মা যেন বলিতেছে "মাণিকের মা, যদি তোদের কুলে দোষ না থাকত কনককে তোর বৌ ক'রে দিতুম—" কনকের লজ্জা রাঙ্গা মুখখানি ঈষৎ সরিয়া গেল। আর আজ কনক খুব নিকটে অথচ যেন কতদূরে। মানুষ সব পারে, পারে না মনের গতিরোধ

করিতে। অজ্ঞাতে মন কখন যাইয়া কনকের পাণ্ডুর কপোলে চুম্বন করিয়া বলিল, "কনক তুমি জাগো আমাদের মধ্যে ব্যবধান ঘটিয়াছে ইহা সত্য নয়। তুমি ও আমি ইচ্ছা করিলেই একই পথে যাত্রা করিতে পারিতাম। যদি কোথাও সেই যাত্রাপথে বাধা থাকিয়াও থাকে তবে এস সে বাধাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের যাত্রা পথকে সহজ সুগম করিয়া লই।" কতক্ষণ এইরূপ সম্বিৎহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না। বহুদূরে একজন গায়কের কণ্ঠধ্বনিতে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম গায়ক হিন্দি ভাষায় গাহিতেছে—"পাখী তুমি যখন ধূলির ধরণীতে বিচরণ করিতে চাও না তখন তোমার কল্পনারঙিন পাখা মেলিয়া আকাশের দিকে ছুটিয়া যাও। তখন তোমার মনে হয় আর ধূলির ধরণীতে তুমি নামিবে না। কিন্তু পাখায় যখন ক্লান্তি আসে, তখন কঠিন মাটির পৃথিবীতে তাই আবার তোমাকে নামিতে হয়। মাটির পৃথিবীকে আবার যখন তোমার রুক্ষ মনে হয় আবার তুমি তোমার পাখা মেলিয়া দাও। ধূলি আর আকাশ, আকাশ আর ধূলি এই করিয়াই তোমার দিন কাটে—কিন্তু উপায় কি?" কনকের দিকে চাহিলাম—খুব সম্ভব কনক ঘুমাইতে পারে নাই—সেও আমার মত ভাবিতেছে। কি ভাবিতেছে কে জানে? মনে হইল কনকের বক্ষ চিরিয়া দেখিয়া লই কোথাও যদি একটু ঝড় উঠিয়া থাকে। অপরাধীর মত চুপি চুপি আর একবার কনকের মুখের দিকে চাহিলাম। কনকের পাণ্ডুর মুখে আমার অনন্ত স্বপ্নের যদি কোন উত্তর খুঁজিয়া পাই। না, কোন জবাব খুঁজিয়া পাইলাম না। চাঁদের দিকে চাহিলাম। দ্বাদশীর চাঁদ এখনও পূর্ণ বিকসিত হয় নাই তবুও যেন মনে হইতেছে পরিপূর্ণতার গৌরবে সে ফাটিয়া পড়িতেছে। একটু বাকী আছে তা থাক, ধীরে ধীরে সে তাহা পূরণ করিয়া লইবে। ওকি শুভ্র চাঁদে অতখানি কাল দাগ কেন? পূর্ণতা পাইবার পূর্বে সে যে নিজেকে অনেকখানি কলঙ্কিত করিয়াছে! কনকের

নিকট হইতে সরিয়া গেলাম। অদূরে সে গায়ক আর একটি গান ধরিয়াছে —"তুমি ফুল চাহিয়াছিলে, ফল আনিয়াছি—তুমি পত্র চাহিয়াছিলে—আমি পাখা আনিয়াছি। তুমি বারি চাহিয়াছিলে আমি নদী আনিয়াছি, ইহাতেও কি তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহা পাওয়া হইল না।" কনকের দিকে চাহিলাম আকণ্ঠ পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, এক পাত্র জলের প্রয়োজন, নদী লইয়া আমি কি করিব? অত জল আমি কোথায় রাখিব? আমার কণ্ঠে বা পাত্রে তাহার স্থান হইবে না। তাই নদীতে আমার তৃপ্তি নাই। কনক নদীর স্রোতের মত আমার নিকটে উপস্থিত আর আমি আকণ্ঠ পিপাসায় কাতর। একটি পেচক তীব্র চিৎকারে রাত্রির নির-বতাকে ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। পূর্ব চেতনা ফিরিয়া পাইলাম। একি আমি এসব কি ভাবিতেছি। ছিঃ ছিঃ কনক জানিতে পারিলে কি ভাবিবে। আমি যে তার অতি বিশ্বাসী মাণিকদা! শয্যা গ্রহণ করিতে যাইতেছি কনক ডাকিল—"মাণিকদা, তুমি যে এখনও শুলে না, কি অত ভাবছ বলত?" অজ্ঞাতে আমার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—"এই তোমার কথাই ভাবছিলুম কনক!"

—"আমার কথা ভেবে কি হবে মাণিকদা—আমার কথা ভেবে কোন কূল কিনারা পাবে না। মিথ্যে ভেবে কেন কষ্ট পাচ্ছ বল ত।" লজ্জায় মরিয়া গেলাম। কনকের কথা ভাবিয়া আমি কষ্ট পাই নাই নিজের কথা ভাবিয়াই কষ্ট পাইতেছি।

১১

মানুষ ভালবাসে বা ভালবাসিতে চায়, ইহাই হইল মানব জীবনের একমাত্র সত্য। আবার ভালবাসার বিনিময়ে মানুষ ভালবাসা পাইতে চায় ইহাও মানুষের স্বভাব। কনককে আমি ভালবাসিয়াছিলাম। জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল কনক আমাকে ভালবাসে কি না? কিন্তু কনককে ত

আর জিজ্ঞাসা করা যায় না ? আর কনককে জিজ্ঞাসা করিয়াই বা লাভ কি ? মধুপুরে সে রাত্রি এমনি ভালবাসার জাল বুনিয়া চলিয়াছিলাম। যেন জীবনে সেদিন আমার সব কিছু কনকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর যেন জীবনে কিছু ভাবিবার বা করিবার ছিল না। কনক বলিয়াছিল "আমার কথা ভেবে কূল কিনারা পাবে না" সেদিন কনকের কথা ভাবিয়া আমি কোন কূল কিনারা পাই নাই। কনকের স্বামী কনককে গ্রহণ করে নাই' স্বামি পরিত্যক্তা কনকের ভবিষ্যত জীবনে কি পরিণতি হইতে পারে এই লইয়া কনক সম্বন্ধে কত কথাই ভাবিবার ছিল কিন্তু সেদিন ঐ বিষয়ে আমি কোন ভাবনাই ভাবি নাই। আমি নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, কনকও প্রতিকূল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোন ঘুর্ণীজালে ঘুরপাক খাইয়া মুখোমুখী হইয়াছে। ভিন্নমুখী দুইটী জিনিব অবস্থার বিপর্যয়ে সামরিকভাবে একই স্থানে জড় হইয়াছে। এখুনি আর একটা ঘুর্ণী আসিয়া উভয়কে পৃথক করিবে, তা সত্বেও উভয় বস্তু মিলিত হয়। জানি কনক ও আমি অনন্তকাল ওয়েটিংরুমে থাকিব না তবুও সেদিন মনে হইয়াছিল কনক ও আমি যেন একই স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারি। মানুব এমনি অসম্ভব ভাবে।

কনকের জীবনে পর পর গ্রীষ্মের কয়েকটা দাবদাহ কাটিয়া গিয়াছে কোন খবরই রাখিবার অবকাশ ছিল না। আমার জীবনে তখন শুধু বসন্ত বা গ্রীষ্ম কিছু একটা একলা অধিকার করিয়াছিল না ষড় ঋতু সমগ্র ভাবে আমার জীবনে একজোটে বাসা বাঁধিয়াছে। বসন্তের কোকিল ডাকিতে না ডাকিতেই শীতের শীতল স্পর্শে সে কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। আমি তখন কোথায় থাকি কি করি কিছুই একটা বাধা ধরা গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। কি একটা জরুরী কাজে হরিশপুরে আসিয়াছি আজ আর মনে তাহা পড়ে না। গ্রামের যুবক সমিতির ছেলেরা, পল্লীমঙ্গল সমিতির ছেলেরা, বাণী মন্দিরের যুবকরা আমায় ঘিরিয়া আছে। কোথায় কখন

যাইব, কি কি করিব এমনি নানা কাজের মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া আছি। বাড়িতে মা নাই, ঠাকুরমা নাই, পিতৃদেব নাই; সকলেই ইহধাম হইতে বিদায় লইয়াছেন। তাঁহারা যেন যুক্তি করিয়া আমাকে ঘর হইতে বাহির করিবার জন্য তাঁহারাই গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। হরিশপুর আসিলেই মায়ের কথা মনে পড়ে। একটি লক্ষ্মীছাড়া ছেলেকে গৃহবাসী দেখিবার কি ব্যাকুল আগ্রহই না তাঁহার দেখিয়াছি। তাই হরিশপুরে আসিলেই আমি মায়ের প্রিয় ঘরটিতে আড্ডা করি। ঐ ঘরে থাকিলেও মনে হয় যেন মায়ের কোলেই আছি। হরিশপুরে আসিলে ঘরে ঘরে খাওয়ার ডাক আসে। আমাকে আর গৃহস্থালি লইয়া মাথা ঘামাইতে হয় না। পাশের বাড়ীর কনকের মা আমার ঘর দোর পরিষ্কার করিয়া পানীয় জলের কুজাটা ভরিয়া দিয়া যায়। যেদিন আসি সেদিন শয্যা পাতিয়া দিয়া যায় আর চলিয়া যাইবার দিন সেই শয্যা তুলিয়া দিয়া যায়। ঘরের চাবি কনকের মায়ের কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্তে আবার আমি আমার গন্তব্য পথে যাত্রা করি।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে। বৃষ্টি হয় নাই। এমন কি বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা দেখাও যায় নাই। প্রকৃতিটা অভিমানিনী নারীর মত যেন অভিমানে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। না রোষ প্রকাশের কোন ভাষা আছে, না চোখের জলে তাহার সমাপ্তি আছে। প্রকৃতির গুমোট ভাবটা আমাকে কোনদিনই বেশ স্বস্তি দেয় না। তাই সেদিন সন্ধ্যায় আর কোথাও বাহির হইলাম না। আমার মায়ের প্রিয় খাটটির উপর শুইয়া শুইয়া মায়ের কথা ভাবিতেছি। হঠাৎ দেশলাইয়ের আলোয় আমার চিন্তা বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। আলোর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কনক প্রদীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যা দিতেছে। বুকটা যেন কে চাপিয়া ধরিল। কনক আমার ঘরে সন্ধ্যা দিতেছে। কনকের দিকে চাহিলাম, সন্ধ্যার দীপ জ্বালা হইলে পিলসুজের উপর প্রদীপটী রাখিয়া কনক ভূমি-

তলে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিতেছে। প্রণাম করা শেষ হইলে কনকের দৃষ্টি আমার দিকে পড়িল, সে যেন খানিকটা চমকিত হইয়া বলিল—"তুমি যে শুয়ে মাণিকদা, আজ বের হও নাই ?"—"না আজ বের হই নাই মনটা বেশ ভাল নাই।" —"তবু ভাল, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম বুঝি বা শরীর খারাপ ?"

কনকের উত্তরে যেন মনে হইল সে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কথা বলিতেছে। উত্তর করিলাম—"মন খারাপটা বুঝি কিছুই নয় কনক ?"

কনক এই কথার যেন জবাব খুঁজিয়া পাইল না, তবুও একটা উত্তর দিল—"তোমার আবার মন খারাপ আছে না কি ?"

—"আমার মনের খবর তুমি জানলে কি ক'রে ?"

—"একি আর জানতে হয় মাণিকদা এমনিই জানা যায়।"

—"তা যায় নাকি ? তা হলে চেষ্টা করলে আমিও তোমার মনের খবর ব'লে দিতে পারি কি বল ?" কথাটা যেন খুব খাপছাড়া হইয়া আমার কানে বাজিল। কনক কিন্তু হাসিয়া উত্তর করিল—"আমার কথা যদি তোমার মনে প'ড়ত তবে হয়ত ব'লতে পারতে ?"

সত্যই দীর্ঘদিন কনকের কথা মনে করিবার অবকাশ পাই নাই। যে কয়েকবার বাড়ি আসিয়াছি কনককে দেখিয়া থাকিলেও আলাদা করিয়া কথা বলিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কনক অবশ্য দেখা করিত, আমার কাজ কর্মের খবর রাখিত এবং সবচেয়ে আমার প্রয়োজনীয় একটি কাজ সে করিত, আমার ময়লা কাপড় জামাগুলিতে সাবান দিয়া কাচিয়া দেওয়া এবং সেইগুলি যত্নসহকারে গুছাইয়া রাখিত। ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে জবাব দিলাম—"তোমার কথা মনে থাকবে না কেন ? খুব মনে আছে। তবে তুমি ত জান এখন আমার অবসর কত কম আর গ্রামে ত আসি না বললেই হয়। যাই হোক এখন কেমন আছ বল ?"

—"কেমন ? যেমন ভগবান রেখেছে।" কনকের কণ্ঠ হইতে

বিষাদমাখা উত্তর পাইয়া আর কি জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া পাইলাম না। আর কনককেও জিজ্ঞাসা করিবারই বা কি আছে? তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার শরীর ত খুব খারাপ দেখ্‌ছি কোন অসুখ-বিসুখ হ'য়েছিল না কি?"

—"অসুখ? আর ক'টা দিন বইত নয় মাণিকদা! এর পরের বারে এলে আর অসুখের খবর জানতে হ'বে না!" কনকের কথা কেমন যেন হেঁয়ালির মত মনে হইল। একি কনকের অভিমান? না দুঃখ? কনকের ক্ষোভের কারণ কি? বাহিরে জানালার দিকে চাহিলাম, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। কেবল টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির শব্দ শোনা যাইতেছে। কনক হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করিল—"বিয়ে থাওয়া কেন করছ না মাণিকদা?" কনক আরও যেন কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সে যেন লজ্জা পাইয়া থামিয়া গেল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আমার মত হতভাগাকে কে বিয়ে ক'রবে কনক?"

কনক পুনরায় বিষাদমাখা স্বরে জবাব দিল—"যার অভাগ্যি সেই তোমাকে বিয়ে ক'রতে চাইবে না। সত্যি মাণিকদা, তুমি বিয়ে কর?"

বিবাহ ব্যাপারে মেয়েদের খুবই কৌতূহল জানিতাম তাই বলিলাম—"বিয়ে ত ক'রব কে ক'নে দেখে বল ত কনক? আর ক'নেই কি আমার জন্য ব'সে আছে।"

কনক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"না ব'সে কি আর আছে? বল কেমন মেয়ে বিয়ে করবে আমরা সেইরকম মেয়েই দেখে দেব।"

অজ্ঞাতে কণ্ঠে হইতে বাহির হইয়া গেল—"এই তোমার মত বৌ হ'লেই চলবে।"

কথাটা বলিয়াই ভাবিয়াছিলাম কনক হয়ত লজ্জিত হইবে অথবা রাগ করিবে। কিন্তু কনক রাগ না করিয়া ধীরে ধীরে আমার শয্যার

পার্শ্বে আসিয়া অল্প একটু চাপা স্বরে জবাব দিল।—"আমি কি এমন সুন্দরী মাণিকদা যে আমার মত বৌ চাচ্ছ?"

—"আমি ত সুন্দরী বৌ চাই নাই আমি তোমার মত বৌ চেয়েছি।" বাহিরে জোরে বৃষ্টি নামিয়াছে। কনক আমার ঘরে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। মধুপুরের চাঁদ না থাকুক কনক আছে। সেদিনের মত মানসিক অবস্থা আমার নাই। আজ যে সব কথা বলিতেছি যেন কথা বলিবার জন্য বলিতেছি। সেদিন কথা বলিতে পারি নাই, কে যেন কণ্ঠ রোধ করিয়াছিল আজ কে যেন আমাকে কথা বলিতে উৎসাহ দিতেছে। কনক উজ্জল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জবাব দিল—"আমার মধ্যে কি এমন গুণ দেখলে মাণিকদা যে আমার মত বৌ চাচ্ছ?"

দুষ্টুমির সুরে জবাব দিলাম—"তোমার মত বৌ পাই নাই ব'লেই ত কনক বিয়ে করা হ'য়ে ওঠেনি?"

কনক শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল তারপর অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে জবাব দিল—"আমার মধ্যে কি এমন ভাল গুণ দেখলে মাণিকদা যে আমার মত বৌ চাও।"

মনে হইল কনকের যেন কোথাও ব্যথা আছে। আমার কথায় যেন সে বেদনা বোধ করিতেছে—তাই তাহার কথার জবাব না দিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, তোমার কি শরীর ভাল যাচ্ছে না কনক?"

কনক বেদনামাখা কণ্ঠে জবাব দিল—"আমি ত আর গোণা দিনে প'ড়েছি মাণিকদা—এরপর এলে আর কনককে দেখতে পাবে না। আগে যদি বা জ্বর মাঝে মাঝে বন্ধ হচ্ছিল এখন আর একেবারে ছাড়ে না।"

—"সে কি তোমার এমন কঠিন অসুখ তা'ত জানি না! কি হ'য়েছে তোমার?"

—"কবিরাজ ব'লছে এই জ্বরে নাকি মানুষ বাঁচে না। কি

যেন ক্ষয় রোগ না কি হ'য়েছে এমনি একটা কথা মাকে বলছিল—আমাকে অবশ্য কিছুই বলে না তারা।"

কনকের দিকে চাহিলাম সত্যই সে অনেকখানি কৃশ হইয়া গিয়াছে। কনককে কাছে ডাকিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম সত্যই তাহার জ্বর রহিয়াছে। কনকের রোগের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া বলিলাম—"না কনক এ রোগের ত এখানে চিকিৎসা হবে না ভাল। এ রোগের ভাল চিকিৎসা হওয়া দরকার—তুমি বরং আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় চল সেখানে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দেব?"

কনক জবাব দিল—"চিকিৎসা করিয়ে কি হবে মাণিকদা, আমার বেঁচে কি লাভ? যত শীগগীর মরণ হয় ততই ত আমার লাভ?"

কনকের মরিলে লাভ আছে কি না জানি না তবে বাঁচিয়া যে লাভ নাই এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবুও বলিলাম—"বেঁচে থাকতেই ত মানুষ চায় কনক, কে কবে মৃত্যু-কামনা ক'রেছে?"

—"মৃত্যু কামনা করি না মাণিকদা—তোমরা পুরুষরা একথা ব'লতে পার, আমাদের মত মেয়ে কেনই বা মরতে চাইবে না—বেঁচে থাকা ত বিড়ম্বনা মাত্র।"

কনকের কথা অস্বীকার করা যায় না। তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম—"সত্যিই কনক তুমি বাঁচতে চাও না? এই জগতে তোমার বাঁচতে সাধ যায় না?"

কনক উত্তেজনার বশে আমার একটি হাত লুফিয়া লইল। আমি বাধা দিলাম না। কনক বলিল—"না। কি সুখে বাঁচতে চাইব মাণিকদা—তোমরা ত স্বদেশী করছ দেশের ভাল কাজ করছ কিন্তু আমাদের কিছু ভাল করতে পার মাণিকদা?"

—"কি করলে তোমাদের ভাল হয় কনক?"

—"সেই যে মধুপুর হ'তে এসে গ্রামে বক্তৃতা দিলে—মেয়েদের অবস্থা

সম্বন্ধে বলেছিলে 'যে সমাজ মেয়েদের অত্যাচার ক'রে, যে সমাজে মেয়েরা লাঞ্ছিতা—সে সমাজ ভেঙ্গে চুরমার ক'রতে হবে।' কই কিছু ত হ'ল না। আজও সমাজ তেমনি আছে মাণিকদা।"

কনককে শান্ত করিয়া বলিলাম—"আমাদের কতটুকু ক্ষমতা কনক? মেয়েদের ত এতে যোগ দিতে হবে?"

—"কোন মেয়েকে কি তোমাদের কাজে যোগ দিতে ডেকেছিলে মাণিকদা?"

—"ডাক দিলেই কি কেউ যোগ দিত কনক, না এখনও যোগ দেবে ভাবছ? এই ধর তোমাকে যদি সেদিন সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলতুম তুমি পারতে দাঁড়াতে?"

কনক মুহূর্তে জবাব দিল—"নিশ্চয়ই পারতুম।"

কনক আজ জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়াছে। পিছনে ফেলিয়া আসা পথের সে আর তোয়াক্কা রাখে না তাই সে ঐ জবাব দিতে পারিল। আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—"কতখানি দুঃখ পেতে হ'ত তা জান কনক?"

—"হ্যাঁ জানি, কিন্তু এতেই কি আর কম দুঃখু পাচ্ছি মাণিকদা? সমাজ না হয় একটু নিন্দেই ক'রত, না হয় তাড়িয়ে দিত তার বেশী আর কি করত? এমন তিল্ তিল্ ক'রে ত ম'রতে হ'ত না?"

—"কিন্তু তাতেই কি তোমার উদ্দেশ্য সার্থক হ'ত? সমাজ যাকে মর্যাদা দেয় না তার কোন কাজই সমাজের প্রয়োজনে লাগে না তার কোন কথাই সমাজ শোনে না তা যত ভাল কথাই হোক? এই ধর আমাকে যে লোকে এত মানছে সে আমি সমাজের বিধানগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠছি ব'লেই ত? ধর আজ বাইরে যদি দুর্যোগ না থাকত এই রাত্রির অন্ধকারে তুমি যে আমাকে ভাল ভাল কথা শোনাচ্ছ তা যত ভালই হোক লোকে জানতে পারলেই আমার জীবনের সব কাজই শেষ ক'রতে হ'ত?"

কনক যেন আমার কথা শুনিয়াও শুনিল না। রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল—"লোকে নিন্দে ক'রত এইত কিন্তু ভাল কাজ করতে হলে লোক-নিন্দাকে ভয় ক'রলে চলে না।" বুঝিলাম কনক আমার কোন যুক্তি মানিবে না। কেনই বা মানিবে? আজ তাহার প্রশ্নের আমার জবাব দেওয়ার মত ক্ষমতা নাই আমি জানি তবুও কনকের যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলিলাম—"এমন ত হ'তে পারে কারো ভালর কথা চিন্তা না ক'রে তুমি নিজের মনের মত কাজ ক'রতে চেয়েছ এবং তাই ভাল ব'লে তোমার মনে হয়েছে।"

কনক একটু চুপ করিয়া ভাবিয়া লইয়া জবাব দিল—"তোমার কথার মানে বুঝতে পারলুম না মাণিকদা।"

—"এই ধর আমাকে তোমার ভাল লাগে ব'লেই আমার ডাকে তুমি সাড়া দিতে। যাকে তোমার ভাল লাগে না তার ভাল কথায় হয়ত তোমার মন সাড়া দিত না।"

কনক নিরুত্তর কি যেন বলিতে যাইয়া বলিতে পারিতেছে না।

—"কই আমার কথার জবাব দিলে না ত?"

কনক যেন ধরা পড়িয়াছে, যেন কোন দ্রব্য চুরি করিয়াছিল এখনি লোকচক্ষুর গোচরে আসিতে পারে এমনি করিয়া তাহার চুরি করা জিনিষ লুকাইয়া রাখিতে চায়। আমি বলিলাম—"তুমি যদি কিছু না মনে কর তবে তোমার মনের কথার আমি জবাব দিতে পারি।"

—"না না আমি কিছু মনে করব না তুমি যা খুসী জবাব দিতে পার?"

আমি কনকের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে আরো কাছে টানিয়া শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম—"ভাল মন্দর কথা হচ্ছে না কনক। আমার কথা তোমার ভাল লাগে তাই সেই কথায় তোমার মন সাড়া দেয় কেন জান?"

—"কেন?"

—"কেন ব'লতে পারি যদি তুমি অস্বীকার না কর ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কনক জবাব দিল—"না অস্বীকার করব কেন ?"

আমি বলিলাম—"নাই বা শুনলে আমার কথা কনক।"

কনক মিনতির স্বরে বলিল—"না জবাব তোমাকে দিতেই হবে।"

—"দেখছ কনক বাইরে কত দুর্যোগ ?"

—"হ্যাঁ।"

—"এ বর্ষা যেন আর থামবে না।"

—"আমার কথার জবাব দাও।"

—"আমার কিন্তু জবাব দিতে ইচ্ছে ক'রছে না। এত দুর্যোগের দিনে কোন কথা বলতে ইচ্ছে ক'রছে না। তা-ছাড়া জবাব শুনেই বা লাভ কি ?"

কনক অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল—"জবাব আমি শুনবই তা যত মন্দ জবাবই হোক ?"

কনকের চোখের দিকে মুহূর্ত চাহিয়া লইলাম।

কনক আস্তে আস্তে তাহার মুখ নত করিল।

আমি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম—"তুমি আমায় ভালবাস ব'লেই খুব সম্ভব আমার কাজে সাড়া দিতে তোমার মন চেয়েছে।"

সেদিন কনক আর কোন কথার জবাব দেয় নাই। আমার উপাধানের উপর মাথা রাখিয়া আমার উপাধানকে অশ্রুসিক্ত করিয়াছিল।

ভালবাসিয়া সুখ আছে আবার জ্বালাও আছে। ভালবাসা পাওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে আবার বেদনাও আছে। আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম কনক আমাকে ভালবাসে কিনা ? কনক অশ্রুসিক্ত উপাধানে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়াছিল। কনক আজ ইহজগতে নাই কিন্তু তাহার ভালবাসার বেদনা আজও বহিয়া বেড়াইতেছি। সে রাত্রিতে

কনকের সহিত আমার আর কোন কথা হয় নাই। একজন মৃত্যুপথযাত্রী অপরজন জীবনস্রোতে বেগবান যাত্রী—দুইজনের মধ্যে আর কি কথা থাকিতে পারে? দুই একদিনের মধ্যেই কলিকাতা রওনা হইলাম। ইহার কয়েকদিন পরে কনকের এক পত্র পাইলাম। ইহাই তাহার প্রথম ও শেষ পত্র।

শ্রীচরণেষু

মাণিকদা, তুমি যাবার পর হ'তেই আমি শয্যাগত হ'য়ে পড়ি। এখন আর উঠে হেঁটে বেড়াতে পর্যন্ত পারি না। ক্রমশঃ আমি মরণের দিকে এগিয়ে আসছি। মৃত্যু আমার একদিন কাম্য ছিল কিন্তু এখন আর মরতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কেন জান? যদি বাঁচতুম তবে তোমার সঙ্গে দেশের কাজ করতুম। মনে ক'রেছিলুম তোমাকে যখন ইহজীবনে পাবই না তখন কাজের দ্বারা দুজনে একই পথে যাত্রা করব। এটা অবশ্য আমার মনের কথা। জানি যত মহৎ কাজেই আমাকে ব্রত করি তোমার নাগাল আমি পাব না। তবুও সান্ত্বনা থাকত যে অন্ততঃ তোমার কাজের ভার খানিকটা লাঘব ক'রতে পারব। সে আশা আর সফল হ'ল না এ জীবনে। রোগ নিয়েও যদি বেঁচে থাকতে পারতুম তবুও তোমার কাজের সার্থকতা দেখে যেতে পারতুম। দেশ স্বাধীন হ'লে আমাদের মত হতভাগিনীদের জন্য কিছু কোরো। এ জীবনে কোন শান্তি পেলুম না পরলোকে যেন শান্তি পাই এই আশীর্বাদ কোরো। পরলোকে আমার কি কামনা তা তোমাকে না লিখলেও বুঝতে পারছ. কিন্তু ইহলোকে আমার একটি কামনা রইল তা তোমাকে ক'রতেই হবে। সেটি হ'চ্ছে আমাদের মত হতভাগিনী নারীদের কথা দেশের লোক যেন ভাবে। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে একবার, শেষ দেখা দিয়ে যাও। আমার প্রণাম নিও। ইতি

সেবিকা—কনক।

কনকের পত্র আমি দেরীতে পাই। কারণ চিঠি যখন আসিয়াছিল তখন আমার কোন একটা ঠিকানায় একটানা থাকিবার মত অবস্থা ছিল না। ফিরিয়া একই সঙ্গে কনকের পত্র ও কনকের মায়ের পত্র পাই।

কনকের মা লিখিতেছেন—

"কনক গত কাল আমাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে।"

মানুষের জীবন বৃক্ষের মত। বৃক্ষ যেমন একটী মূল কাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া শাখা প্রশাখায় বাড়িয়া ওঠে একটী শাখার সহিত যেমন অন্য শাখার সম্বন্ধ থাকে না বা দুই একটা শাখা শুখাইয়া গেলে যেমন অন্য শাখাগুলি শাখাপল্লবের বাড়িতে থাকে মানুষের জীবনও সেইরূপ। কনকের মৃত্যুসংবাদ আমাকে বেদনা দিলেও আমার জীবনের গতি কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।

১২

স্কুল খুলিয়াছে। কিন্তু রাজসাহী যাওয়া আর হইল না। কারণ অত দীর্ঘ পথ আমি একা যাইতে পারি না, আর পিতৃদেবের ছুটী মিলিল না যে আমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দেন। সেইজন্য আমাকে তিন মাইল দূরে গোপালপুরে ভরতি করা হইল। এই ব্যাপারে গোবর্ধন খুব খুশী। কারণ সেও ঐ স্কুলে পড়ে! আমরা গ্রামের দশ বার জন বালক ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতাম। কারণ লেখাপড়া শিখিলে যে 'দুধভাত' ভবিষ্যতে মিলিবে এ আপ্ত বাক্য সকলের জানা ছিল। লেখাপড়া যে কতদূর হইত তাহা আমি জানি না। স্কুলের দীর্ঘ-দিনের ইতিহাসে এই স্কুলের কোন ছাত্রকে ভবিষ্যত জীবনে কৃতিমান হইতে শুনি নাই। যে সব ছাত্র দুধভাত খাইতেছে তাহা এই স্কুলের

অধীত বিদ্যার জোরে নয় তাহাদের নিজ নিজ অবিদ্যার জোরেই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। গোপালপুরের এক খেয়ালী জমিদারের সহযোগে কয়েকজন উচ্চাকাঙ্খী ভদ্রলোক এই স্কুলটী গড়িয়া তোলেন। প্রয়োজন মত ইটের দেওয়াল তুলিয়া ঘর করা হইয়াছে। একসঙ্গে সব ঘরগুলি তৈয়ারী হয় নাই। কোন গৃহের টালির ছাদ, কোনটী বা টীন, কোনটী বা খড় দিয়া আচ্ছাদিত। পলাস্তারারূপ বাজে খরচ করা হয় নাই। কারণ যে টাকায় পলাস্তারা করা হইবে সেই টাকায় আর একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিলে চলিবে। স্কুল ঘরের মেঝেগুলি অপেক্ষা ড়িষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা পরিষ্কার। আটদশটি কক্ষে নানামাপের বেঞ্চ ও চেয়ার টেবিল রক্ষিত। উচ্চশ্রেণীর চারিটা কক্ষে হাইবেঞ্চ আছে। অন্যশ্রেণীতে বেঞ্চ আছে এই যথেষ্ট। হাইবেঞ্চ রাখার প্রশ্ন কর্তৃপক্ষের আদৌ মনে হয় নাই। আর হইলেই বা কি, অর্থসঙ্গতি থাকিলে ত হাই বেঞ্চ হইবে।

গ্রামের এক ভদ্রলোক আমাকে ভরতি করিবার জন্য লইয়া গেলেন। হেডমাষ্টার নগেন রক্ষিত চেয়ারে বসিয়া আছেন। একটি কক্ষকে দুই-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একটি আলমারী ও একটী ম্যাপব্যাক দিয়া এই পার্টিসন তৈয়ারী করা হইয়াছে। অন্যকোন পার্টিসনের ব্যবস্থা নাই। এক অংশ হইতে অপরাংশ দেখা বা যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই। আর একটি চেয়ারে একটি রুগ্না বালিকা বসিয়া আছে। আমাকে ও বিশুকাকাকে দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"আসুন, আসুন বিশ্বনাথ বাবু। কি, ছেলে ভরতি করবেন না কি? তা এ সময় ত ভরতি হবার অসুবিধা খুব। বছরের শেষের দিকে—ও দাঁড়িয়ে আছেন? এই খেন্তি নাম্‌না, দেখছিস্ না ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন?" এই বলিয়া খেন্তিকে খ্যাঁকাইয়া উঠিলেন।

হেডমাষ্টার মহাশয় পুনরায় বলিতে সুরু করিলেন—"কি করি মহাশয়, মেয়েটা জ্বরে ভুগে ভুগে এমন খাই খাই করছে যে বাড়ীতে থাক্‌লেই

কেবল খাবে? আর এই অসুখে খেলে বাঁচতে হবে? তাই এখানে এনে বসিয়ে রেখেছি।" খ্যান্তমনি অতিকষ্টে চেয়ার থেকে অবতরণ করিল। দেখিলেই বোঝা যায় তাহার মন এবং শরীর কোনটাই চেয়ার হইতে অবতরণ করিতে রাজী নয়। বিশু কাকা তুই একবার 'থাক্ না বসে' বলিয়া উক্ত চেয়ারে উপবেশন করিলেন?

—"হ্যাঁ সার্টিফিকেট আছে? কোথায় পড়ত?"

—"আজ্ঞে সার্টিফিকেট নাই। কারণ ও রাজসাহীতে পড়ে। কেবল নিয়ে যাবার লোকের অভাবে ওর রাজসাহী যাওয়া হ'ল না। কে যাবে মশায় সেই কত দূর ধাপধাড়া গোবিন্দপুর।"

—"দেখুন বিশুবাবু আজকালকার লোকের এক ধারণা সহরে ছেলেদের পড়াব। আরে সহরে কি পড়া হয়, ঐ ইংরাজীটা ছাড়া। কই পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে অঙ্কেতে পেরে উঠুক দেখি?"

—"সে ত বটেই—পাড়াগাঁয়ে অঙ্কের রেওয়াজ ত বেশী।"

—"তা সার্টিফিকেট না হলেও চলবে। আপনি একটা ডিক্লেয়ারেশনে লিখে দেন যে এর আগে কোথাও পড়ে নাই। তবে মশায় জানুয়ারী হ'তে মাইনেটা লেগে যাবে। অনাবশ্যক ছয় সাত মাসের মাইনে দিতে হবে।"

—আজ্ঞে সেটা একটু কম সম কোরে—"

—"ওটি বলবেন না বিশুবাবু—স্কুলের আইন সে হবার যো নাই।"

—"আজ্ঞে সেই ছিষ্টিকে ভরতি"—

—ও, সৃষ্টিধরকে ভরতির সময় তখন মশায় তিন রকম খাতা ছিল। ইনস্পেক্টারকে যে খাতা দেখাতে হ'ত সেটাতে ঠিক মাইনে লেখা হ'ত।"

—"যাই হোক কমসম ক'রে—"

—"আ হা অনুরোধ ক'রতে হত না। দেখুন না এমন একটা সৎ প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছি মশায় কত কষ্টে তাও পেছু লেগেছে। নিমাইবাবুকে

মেম্বার করি নাই বলে ইন্‌স্‌পেক্টার অফিসে দরখাস্ত ক'রে দিলে। সেই থেকে খাতা একরকমই রাখছি। দরকার কি মশায়? কার মনে কি আছে কে বলতে পারে?" অপর অংশে দৃষ্টিপাত করিয়া চাপাকণ্ঠে বলিলেন—"নিমাইয়ের দলের লোক ও মাষ্টারদের মধ্যে রয়েছে। যদি ফাঁক ক'রে দেয় তবে বুড়ো বয়সে—গোকুল এডমিসনের খাতাটা নিয়ে এস ত? হ্যাঁ কোন ক্লাসে পড়?"

—"ফোর্থ ক্লাস—"

—"বেশ—এলজেবরার কতদূর হ'য়েছে?"

—"সাতের এক্‌সারসাইজ"

—"দেখলেন? আর আমাদের বার তের হয়ে গেছে। অঙ্কতে সহরে বড় কাঁচা। যাক্ আর প্রশ্ন করব না। জানি পারবে না তবে মিছিমিছি এক ক্লাস কম ক'রে আর একটা বছর লোকসান কোরব না। হ্যাঁ আমি কাঁচা ছেলেদের নিয়ে এক ঘণ্টা কোচিং ক্লাস করি—তাতে কিন্তু প'ড়তে হবে। দুটা করে টাকা মাসে লাগবে?"

—"সে আর এমন বেশী কি?"

—"না আমি কম ক'রেই নিই—অন্য সব স্কুলে চার টাকা পাঁচ টাকা ক'রে নেয়। আমি মশায় অত পয়সার হেঁই হেঁই করতে পারি না। এতেই কত ছেলে আট দশ টাকা ক'রে বাকি ফেলে? হ্যাঁ এখন বই কোথায় পাবে? গোকুল দেখত আলমারীতে স্পেসিম্যান বইগুলোর মধ্যে কি কি বই ফোর্থ ক্লাসের আছে?"

গোকুলবাবু না দেখিয়াই উত্তর করিলেন—"সে হ'য়ে যাবে কোন রকমে।"

—"ছাখ গোকুল বিশুবাবু যখন ধ'রেছেন তখন খাতির রাখতেই হবে। ঐ বিল্ডিং ফি-টা আর নিয়ে কাজ নাই।"

বিশু কাকার খাতিরে দুই টাকা বিল্ডিং ফি রেহাই দেওয়া হইল।

—"ওরে ও নেপাল—কাজের সময় ব্যাটাকে—"

—"তাকে যে বাড়ী পাঠালে বাবা"—খেন্তী জবাব দিল।

—"ও তাও ত বটে, তবে যাতো মা—হ্যাঁ এটা থার্ড পিরিয়ড নয়? হ্যাঁ অরুণবাবু যে ক্লাসে আছে সে ক্লাসে নিয়ে যা।" খ্যান্তমনি আমার পথ প্রদর্শক হইয়া আমার ক্লাস দেখাইয়া দিল। ক্লাসে পঁচিশ ত্রিশজন নির্জীব ছেলে নোংরা পোষাক পরিয়া বসিয়া আছে। দেখিলেই মনে হয় কতক গুলি বাছাই করা দরিদ্র ছেলেকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ক্লাসে অবশ্য অরুণবাবু ছিলেন না। তাহার তালিযুক্ত জুতা জোড়াটী পড়িয়া আছে। কোন সময়ে ঐ জুতাটী নিউকাট ছিল বর্তমানে অবশ্য উহা চটি জুতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। খ্যান্তমনি ঐ জুতা দেখিয়াই অরুণবাবুর ক্লাস বুঝিতে পারিয়া আমাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

আমি জড়সড় হইয়া ক্লাসে ঢুকিলাম। অপর ছাত্ররা প্রবেশ মাত্র ধরিয়া লইল নিশ্চয়ই আমি ভরতি হইয়াছি। সেইজন্য চারিদিক হইতে প্রশ্ন আসিতে লাগিল 'হোয়াট ক্লাস ডু ইউ রীড্ (কোন ক্লাসে পড়?) হোয়াট ইজ ইওর নেম? (তোমার নাম কি?)' ইত্যাদি। নূতন ছাত্র দেখিলে স্কুলের ছেলেরা অত্যন্ত ইংরাজীনবীশ হইয়া ওঠে। একটি ছাত্র প্রশ্ন করিল "হোয়াট বেঞ্চ ডু ইউ রীড্ (তুমি কোন বেঞ্চেতে পড়)?"

এরূপ অভূতপূর্ব প্রশ্ন ইতিপূর্বে শুনি নাই। কোন প্রশ্নেরই অবশ্য আমি জবাব দিই নাই। তবে ইচ্ছা করিলে জবাব দিতে পারিতাম। কিন্তু শেষোক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই কঠিন। তাই হতভম্ব হইয়া ঐ প্রশ্নের জবাব খুঁজিতে লাগিলাম। গোবর্ধন পশ্চাতের এক বেঞ্চে বসিয়াছিল। সে উত্তর করিল—"ডোণ্ট ইয়ার্কি ও (ইয়ার্কি কোরো না) ফার্ষ্ট বেঞ্চ রিডিং ফার্ষ্ট বেঞ্চে নয় শুধু ফার্ষ্ট বেঞ্চ ফার্ষ্ট। সিটীং কর মাণকে ফার্ষ্ট বেঞ্চের একবারে গোড়ার দিকে"—ফার্ষ্ট বেঞ্চের প্রথম ছাত্র রাখহরি সন্ত্রস্ত হইয়া সরিয়া গেল। আমি ঐ স্থান দখল করিয়া বসিলাম। অরুণ বাবু দূর হইতে—'বড় গোলমাল হ'চ্ছে—বড় গোলমাল হ'চ্ছে'—

বলিয়া প্রবেশ করিলেন এবং তাহার লম্বা ছড়িটী টেবিলের উপর সজোরে মারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'মেক্ নো নয়েজ, মেক্ নো নয়েজ', বলিয়া একবার মাঠের দিকে চাহিলেন। বলিলেন—"আঃ এত ঘাস দেখে নড়িয়ে দিয়ে এলুম তবু ঘাসে মুখ দেওয়া হচ্ছে না।" আরুণ বাবু স্কুলে আসিবার সময় একটি গাভী লইয়া আসেন। সেটীকে খুঁটা পুঁতিয়া দীর্ঘ রজ্জুদ্বারা তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে বাঁধিয়া দেন। ছাত্ররাও কখনও কখনও গাভীটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়। পরে অন্যান্য শিক্ষকদের ইহা লইয়া পরিহাস করিতে শুনিয়াছি। অরুণ বাবু বরাবর একটী রুগ্ন গাভী খরিদ করিয়া থাকেন। তারপর গাভীটী হৃষ্টপুষ্ট এবং দুগ্ধবতী হইলে বিক্রয় করিয়া আর একটী রুগ্ন গাভীর সন্ধান করেন। এইরূপে তিনি একটী উপরি রোজগারের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। অন্যান্য শিক্ষকরা তাঁহার এই রোজগারের জন্য ঈর্ষা করিতেন। এমন কি, একবার চক্রান্ত করিয়া হেডমাষ্টারের কাছে অভিযোগ করেন যে অরুণ বাবু গরু লইয়া নিজে এবং স্কুলের ছাত্রদিগকে দিয়া ঐ গরু তত্বাবধান করানর' দরুণ ছাত্রদের পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে। হেডমাষ্টার মহাশয় এই অভিযোগের জন্য যথারীতি এক সার্কুলার জারী করিলেন "কোন শিক্ষক স্কুলে গরু লইয়া আসিতে পারিবে না।" অরুণ বাবু এই সার্কুলারের প্রতিবাদে চাকুরী ছাড়িয়া দেন—কিন্তু অত অল্প বেতনে বাহিরের কোন শিক্ষক না পাওয়ায় অনেক তোষামোদ করিয়া স-গরু অরুণ বাবুকে পুনর্নিয়োগ করিতে হয়। সেই হইতে অরুণ বাবু একসঙ্গে গরু এবং মানব-শিশুর তত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন।

গোবরা বলিল—"কেন ঘাসে মুখ দিচ্ছে না জানেন ?"

—"কেনরে ?"

—"আজকে গেদে ঘাস খাইয়ে দিয়েছি ইস্কুল বসবার আগে। সকাল সকাল ইস্কুল এসেছিনু তাই ঘাস কেটে রেখেছিনু কি না—?"

এমন সময় আমার দিকে অরুণ বাবুর দৃষ্টি পড়িল। তিনি সস্নেহে কাছে ডাকিলেন—আমি নিকটে গেলাম। আমি কোথায় পড়িতাম কোন ক্লাসে পড়িতাম গত পরীক্ষায় কিরূপ নম্বর পাইয়াছিলাম সব একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দিয়ে ভাত খেয়েছি আজ। আমি যাহা খাইয়াছিলাম তাহা বলিলাম।

—"অ্যাঁ, মাছের ঝোল ? মাছ কোথায় পেলে ?"

—"পুকুরে ধরা হ'য়েছিল।"

—"পুকুরে খুব মাছ বুঝি ?"

গোবর্ধন পশ্চাৎ হইতে উত্তর দিল—"ওদের পুকুরে খুব মাছ স্যার—তাছাড়া বাবুর আবার মাছ না হ'লে ভাত রোচেনা। পুকুরে ধরা না হ'লেও ওর ঠাকুমা মাছ কিনে খাওয়াবে ?

—"তা হ'লে বেশ ভাল অবস্থা বলতে হবে"—অরুণ বাবু প্রশ্ন করিলেন।

—"হ্যাঁ স্যার ওরা বড়মানুষ।"

আমাকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"মাছ না হ'লে বুঝি ভাত খেতে পার না ? ছ্যাট্‌স ব্যাট হ্যাবিট্‌ (খারাপ অভ্যাস) যা পাবে তাই খাবে। এখন না হয় মাছ জুটছে—" এই বলিয়া অরুণ বাবু চুপ করিয়া গেলেন। এখন বুঝতে পারি প্রশ্নের সেই বিরতিকালে অরুণ বাবু অতীত জীবনের মৎস্যসমুদ্রে একবারের জন্য ডুব দিলেন—তারপর বলিলেন—"ছেলেবেলায় আমারও অমনি বদ্‌ অভ্যেস্‌ ছিল যে—।" তারপর আমি কখন কি খাই, রাজসাহীতে কি খাইতাম ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি যথাযথ জবাব দিতে লাগিলাম। অরুণ বাবু মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুদিয়া আমার জবাবগুলি ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন—এমন কি বাড়ীতে রান্না কেমন করে ইত্যাদিও জিজ্ঞাসা করিলেন। যদিও তখন আমি নিতান্ত বালকমাত্র তবুও আমার মনে

হইয়াছিল অরুণ বাবু শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা সেই সব বস্তুর রসাস্বাদ করিতেছেন—

অরুণ বাবু বলিলেন—"আমার মা কি চমৎকার রান্না করত রে"—এমন সময় ঘণ্টা বাজিয়া গেল। অরুণ বাবু অনিচ্ছাসত্বেও একবার আমার দিকে একবার অদূরে গাভীটীর দিকে তাকাইতে তাকাইতে ক্লাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বাংলা দেশে শিক্ষার উপর অনুরাগ প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই আছে। কি ধনী কি দরিদ্র তাঁহারা চান তাহাদের আপন গ্রামে যাহাতে একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। বাংলা দেশে যতগুলি স্কুল আছে এই সকল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের চেষ্টাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাহারা পরিচালনা করেন তাঁহারা সর্বদাই নিজের দলের প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করেন ফলে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দলাদলির কেন্দ্ররূপে বিরাজিত। গোপালপুর স্কুলটীও ঠিক এইভাবে চালিত ফলে স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা অপেক্ষা তাহার যত কিছু কর্মপ্রচেষ্টা দলাদলির কাজেই ব্যয়িত হইত। একদিন হেড পণ্ডিত রামচরণ বাবুর ক্লাসে হঠাৎ হেডমাষ্টার মহাশয় আসিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয় সর্বনাশ হয়েছে ইনস্‌পেক্টার নাকি শীঘ্রই আসছেন এবং না খবর দিয়ে হঠাৎ পরিদর্শন করবেন।" পণ্ডিত মহাশয় হেডমাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিয়া ঘামিয়া উঠিলেন, যেন কোন পুলিশ অফিসার এখনি তাঁহাকে চৌর্য অপরাধে গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে। পণ্ডিত মহাশয় নিরীহ ভালমানুষ ভয় করিবার তাঁহার কিছু নাই; কিন্তু স্কুলের যত কিছু দুর্নীতিপরায়ণ কাজ স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে দিয়া করাইয়া লন। হেডপণ্ডিত মহাশয় বাধ্য হইয়া এইসব কাজে সাহায্য করেন। তিনি ইংরাজী জানা পণ্ডিত নহেন এবং স্কুলের আইন অনুসারে ইংরাজী না জানা পণ্ডিতকে স্কুলে রাখা চলে না। কিন্তু

বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিব, আমি বোর্ডিংএ থাকি ভুলক্রমে আমি আকবরের রাজত্ব পড়িতেছি তাহার জন্য তিনি আমাকে কিরূপ ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন আজও তাহা মনে আছে। কারণ উপর্য্যুপরি দুইবার আকবরের প্রশ্ন পড়িবার পর যে বালক পুনরায় আকবর পড়ে তাহার মত গাধা ছেলে আর দ্বিতীয় নাই। সেইদিন এবং তাহার বহু পূর্ব হইতে এই সার সত্য আমাকে বুঝাইবার জন্য আমাকে লম্বকর্ণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজ যখনই ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখনই—অশোক, আওরঙ্গজেব, সিরাজদ্দৌলা, লর্ড ক্লাইভ এবং ভিক্টোরীয়ার প্রোক্লেমেশেন ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কিছু পঠিতব্য বিষয় থাকিতে পারে বলিয়া আমার মনে পড়ে না। কারণ ইতিহাস পড়াইবার জন্য অভয় বাবুকে স্কুলে রাখা হয় নাই। ইতিহাসে পাশ করাইবার জন্য তাঁহাকে রাখা হইয়াছে। সেই বছর ঐ কয়েক চেপ্টার পড়িতে পারিলেই তিরিশ নম্বর পাইবার কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে না। অভয় বাবু মধ্যে মধ্যে ছড়ি নাচাইয়া যখন বলিতেন—"ওরে জানিস আমার সাবজেক্টে কেউ কোনদিন ফেল করে নাই" এবং ইন্‌স্‌পেক্টার তাঁহার এইরূপ প্রশংসনীয় কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া পরিদর্শন পুস্তকে তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন! বাংলাদেশে এইরূপ আদর্শ শিক্ষক প্রায় সকল স্কুলেই আছেন, যাঁহারা পড়ান' অপেক্ষা পাশ করানর কৌশল সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কয়েকদিন হইল স্কুল খুলিয়াছে, কার্ত্তিক কয়েকটি লঙ্কার চারা লইয়া উপস্থিত। সেই লঙ্কার চারা কয়টী অরুণবাবুর জন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। প্রথম ঘণ্টায় পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশ। তিনি বলিলেন—"কি-রে কার্ত্তিক ঐ চারাগুলো কিসের?"

—"আজ্ঞে ওগুলো লঙ্কা চারা।"

—"ও তাই নাকি, কার জন্য এনেছিস?"

—"আজ্ঞে থার্ড মাষ্টারের জন্য—"

—"অরুণবাবুর জন্য ? তা আমাকে কয়েকটা দে না—"

—"আজ্ঞে স্যার উনি আরও বেশী চেয়েছেন এক কাঠা জায়গায় বসাবেন কি না তা এতে কুলোবে না।"

—"ও অরুণ বাবুর কিছুতেই পেট ভরে না। জানিস তিনি লঙ্কা পর্যন্ত বিক্রী করেন। আমি গত বছর দুটো চেয়েছিলুম তা বললেন গাছে ধরে নি—অথচ দেখি গাছ ভরতি লঙ্কা। আমরা বাবু পয়সার জন্য এতটা নিচু নজরের কাজ করতে পারি না।"

আমরা সকলেই পণ্ডিত মহাশয়ের কথার একবাক্যে সায় দিলাম। একজন শিক্ষক অপর শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করিতেন এবং ছাত্রদের কাছে সমালোচনা করিতে দ্বিধা করিতেন না, ছাত্ররাও ঐ সকল সমালোচনায় যোগ দিত এবং একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপর শিক্ষকের নিকট সমালোচনা করিত। গোবর্ধন পণ্ডিত মহাশয়ের লঙ্কাচারার প্রয়োজন দেখিয়া বলিল "স্যার কার্ত্তিক না দেয় আমি কাল আপনাকে এনে দেব"। পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "দিস ত বাবা আমিও কাঠাখানেক জায়গায় বসাব।" গোবর্ধন পরের দিন লঙ্কাচারা আনিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় খুশী হইয়া বাড়ী লইয়া গিয়া রোপণ করিলেন! কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল চারাগুলি আদৌ লঙ্কাচারা নহে সেগুলি কালমেঘের চারা। কালমেঘের গাছ যখন ছোট থাকে তখন অবিকল লঙ্কা গাছের চারার মত দেখায়, তাই গোবর্ধন যখন কালমেঘের চারাগুলি লঙ্কা চারা বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দিয়াছিল পণ্ডিত মহাশয় সেগুলি লঙ্কাচারা বলিয়াই সযত্নে রোপণ করেন। পণ্ডিত মহাশয়কে কখনও ছাত্রদের প্রহার করিতে দেখি নাই। কিন্তু এইরূপ প্রতারণায় পণ্ডিত মহাশয় এমন ক্রুদ্ধ হন যে গোবর্ধন যে সেদিন জীবন্ত স্কুল হইতে বাহির হইয়াছিল ইহাই আশ্চর্য্য।

এই স্কুলের কথা লিখিতে গেলে বিরাট একটি গ্রন্থ লেখা যায়। আমি আর তাহার চেষ্টা করিয়া পাঠকদের সময় নষ্ট করিব না তবুও যখন এই সব দরিদ্র শিক্ষকদের কথা মনে হয় একটা জাতির যাঁহারা স্রষ্টা তাঁহার কিরূপ কঠোর জীবনযুদ্ধে পঙ্গু হইয়া আছেন ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। দুই চারজন প্রতিভাশালী লোক যখন এই পরাধীন দেশে দেখিতে পাই তখন বিস্ময়বোধ হয় ঐ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়াই তাঁহারা মানুষ হইয়াছেন এবং ঐ সব দরিদ্র শিক্ষকদেরই সাধনার ধন তাঁহারা। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটীবহুল ব্যবস্থার জন্যও যে কত ছাত্রের জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। এইগুলিকে শিক্ষাকেন্দ্র না বলিয়া দরিদ্রের বাথান বলিলেই চলে। দারিদ্র মানুষকে বড় করিতে পারে না, অতএব দরিদ্র শিক্ষক কেমন করিয়া ছাত্রদের মানুষ করিয়া তুলিবে? দারিদ্র মানুষকে কতখানি ছোট করিয়া দেয় একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই স্কুলের প্রসঙ্গ শেষ করিব। গোপাল-পুরে কোন বিবাহ হইলে স্কুলে দশটাকা করিয়া চাঁদা দেওয়ার নিয়ম ছিল। যখন স্কুল গড়িয়া উঠে তখন এই ধরণের আয়ের উপরও স্কুলকে অনেক-খানি নির্ভর করিতে হইত। পরে আর প্রয়োজন না থাকিলেও বিবাহের সময় ঐ দশটাকা আদায় করা হইত। হেডমাষ্টার মহাশয় ঐ টাকার কোন অংশ লইতেন না বাকি নয়জন শিক্ষকের মধ্যে ঐ টাকা বণ্টন করিয়া দিতেন। নয়জন শিক্ষককে দশ টাকা ভাগ করা কঠিন এক পয়সা থাকিয়া যায়। সেইজন্য ঐ এক পয়সার সুপারি কিনিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। একবার এক পয়সায় দশটী সুপারি হওয়ায় ভাগের পর একটী উদ্বৃত্ত সুপারি অরুণবাবু লওয়ায় অন্যান্য শিক্ষকদের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি "আমরা অরুণবাবুর মত অত ছোট লোক নই, চক্ষুলজ্জা বলিয়া অরুণবাবুর কিছু নাই—আমরা অরুণবাবুর মত একটা সুপারি লইয়া ছেঁড়ামি করিতে পারি না।"

এই স্কুলেই জীবনের শৈশব হইতে কৈশরে পদার্পণ করিয়াছি। পৃথিবীর রূপ যেন চোখের সামনে বদলাইয়া যাইতেছে। মাটী, গাছপাতা আকাশ বাতাস যেন নবরূপে প্রকাশ পাইয়া কেমন যেন একটা হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়াছে। এতদিন বৈঁচি না পাকিলে অতদূরে কখনও বেড়াইতে যাইতাম না এখন বৈঁচি না থাকুক ঐ কণ্টক সমাকীর্ণ গুল্মগুলি কেমন যেন এক রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেনেদের কল্যাণী যাহাকে কোনদিন খেলিতে লই নাই, এমন কি কল্যাণীর বাবা আসিয়া কত অনুযোগ করিয়াছে, কল্যাণী খেলিতে গেলে আমরা তাহাকে 'দুর' 'দূর' করিয়া কেন তাড়াইয়া দিই। সে খুব বেশী দিনের কথা নয়, ইতিমধ্যে কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেদিন কল্যাণীকে হঠাৎ দেখিয়া মনে হইল কল্যাণীকে খেলিতে না লইয়া এতদিন কি ভুল করিয়াছি। কল্যাণী আর সে কল্যাণী নাই তাহার ময়লা কাপড় শ্রীহীন বেশ দেখিয়া কোন বালকই খেলার সাথী করিতে চাহিত না। সে যেন আজ অপূর্ব মাধুরী লইয়া নূতনরূপে ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্বশুরবাড়ী হইতে কল্যাণী ফিরিয়াছে পথে হঠাৎ আমার সহিত দেখা, আমাকে দেখিয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ মাণিকদা?" "ভাল আছি" এই কথাটা বলিতে যেন জিহ্বা তালুদেশে আটকাইয়া গেল। অথচ কিছুদিন আগে একটা মরা সাপ লাঠির আগায় জড়াইয়া কল্যাণীকে ভয় দেখাইয়াছি "আমাদের সঙ্গে খেলতে এলে কোমরে এই সাপটা জড়িয়ে দেব।" আর আজ যেন মনে হইতেছে কল্যাণী আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ধন্য করিয়া গেল। রোগা কাল্টা একটা মেয়ে কয়েকটা বছর না ঘুরিতেই "তন্বী শ্যামা" রূপে একজন কিশোরের মনে অকারণ একটা ঝড় তুলিতে পারে কে কবে কল্পনা করিয়াছে? সৃষ্টির রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। স্রষ্টা যেন অপরূপ দৃশ্যপট সহকারে একটা অপূর্ব নাটক মঞ্চস্থ করিয়াছেন আমরা কৌতুহলী দর্শকবৃন্দ যবনিকার কাছে

অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। মঞ্চের অভ্যন্তর হইতে দু একটা হালকা ঐক্যতান শোনা যাইতেছে। এখনি যবনিকা উঠিয়া গেলে মঞ্চের অভ্যন্তরে অপূর্ব নাটক দৃশ্যপট সুর-সংযোগে এক নূতন জগতের সৃষ্টি করিবে। কল্যাণীকে দেখিয়া মনে হইল সে যেন কোন স্বপ্নলোক হইতে ভাসিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আমি তাহার দিকে যেন এক রহস্যময় না-জানা বস্তুর মতই অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি! কল্যাণীকে যেন বার বার দেখিতে ইচ্ছা করে। একটা বৈঁচির ঝোপ একগুচ্ছ কাঁটা বইত নয় বেশীর ভাগ সময় যার পাতা থাকে না ফল ত দূরের কথা অনাবশ্যক সেই বৈঁচি ঝোপটা দেখিতে ছুটিয়া যাই।

১৩

আমাদের বাড়ীর কাছে বিপিন সরকারের বাড়ী। বিপিন সরকারের পুত্রবধূ দ্বিরাগমন করিয়া আসিয়াছে। মা বলিলেন "সরকারদের নতুন বৌ এসেছে এখুনি মিষ্টি খেতে দেবে, যা বৌ দেখে আয়।" মায়ের কথায় ছুটিয়া সরকারদের বাড়ী গেলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম লাল চেলি পরিয়া একটী বালিকা বধূ। বয়স তের চৌদ্দ, নিটোল স্বাস্থ্য। সরকার গিন্নী সকলকে বধূ দেখাইতে ব্যস্ত। নতুন বৌ চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং সরকার গিন্নী মাথায় ঘোমটা খুলিয়া সকলকে দেখাইতেছেন। কেহ বা বধূটীর প্রশংসা করিতেছে এবং কেহ বা সমালোচনা করিতেছে। বয়োজেষ্ঠ্যরা আশীর্বাদ করিতেছে। গোবর্ধনও বৌ দেখিতে আসিয়াছে। বৌ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। গোবর্ধন বলিল—"কি দেখ্‌ছিস্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—তোরও অমনি বৌ আসবে একদিন, এখন চ' ঘোষেদের গাছে জাম খেয়ে আসি।" আমারও এইরূপ বধূ আসিতে পারে কথাটা শুনিয়া কেমন যেন লজ্জা হইল। গোবর্ধনকে বলিলাম—"যাঃ অসভ্য

কোথাকার।" গোবর্ধনের সহিত জাম খাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা খাইতে হইল। কারণ এইরূপ কথার পর আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। গোবর্ধন বলিল—"তুই মাইরী শুধু শুধু দেরী ক'রে দিলি। এই সময় আবার ঘোষেদের বড় কর্তা জাম তলায় খোঁজ নেয় কেউ জাম খেতে আসে কি না। আচ্ছা মাইরী বৌ এসেছে ত তার কি দেখছিলি?" গোবর্ধনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলাম না. মনে মনে গোবর্ধনের উপর ক্রুদ্ধ হইলাম। গোবর্ধন বলিল "আজ আর তোর জন্যে হয় ত জাম খাওয়া হবে না বৌ দেখতে যেয়ে শুধু শুধু জাম খাওয়াটা নষ্ট হবে বোধ হয় আজ।" গোবর্ধনের বধূ অপেক্ষা জামের দিকে আকর্ষণ বেশী। আমার কিন্তু সেদিন বারে বার নব বধুর কথাই মনে পড়িতেছিল। সেদিন পুনরায় বৈকালে সরকারদের বাড়ী ছুটিয়া গেলাম। নূতন বৌ আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। ইহার পূর্বে কোন বধূ আমাকে ঘোমটা দেয় নাই। আমাকে ঘোমটা দেওয়ায় আমার মর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল। মনে হইল আমি যে সে লোক নহি, আমাকে দেখিয়া এরপর গ্রামের নব বধূরা ঘোমটা দিবে।

বাড়ী আসিয়া ছটুকে বলিলাম "ছটু জানিস্ নতুন বৌ আমাকে দেখে ঘোমটা দেয়। এরপর থেকে তুই আমাকে 'আপনি' ব'লে কথা বলবি?" ছটু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ওঃ—বাবুকে আবার 'আপনি' ব'লতে হবে। বাবুকে দেখে নতুন বৌ ঘোমটা দিয়েছেন ব'লে কত যেন মান বেড়েছে?" ছটু এমন গুরু ব্যাপারকে লঘু করায় বলিলাম—"কি আমাকে 'আপনি' বলবি না? জানিস্ আমি বড় হ'য়েছি সরকার-বৌ আমাকে দেখে ঘোমটা দেয়?" ছটু বলিল—"আচ্ছা তোমার বৌ এলে তখন 'আপনি' বলব।" ছটুও আর খুব ছেলে মানুষ নাই তাহার বয়স হইয়াছে। সেও এখন সময়োচিত কথা বলিতে শিখিয়াছে। কিন্তু ছটু এমন করিয়া জাগ্রত মর্যাদাবোধকে ঘা দিবে তাহা ভাবি নাই। আমার মনে হইল সরকারদের

বৌ যে আমাকে দেখিয়া সত্যই ঘোমটা গ্যায় তা ছটু বিশ্বাস করে নাই। তাই বলিলাম—"চল্ না দেখে আসবি কেমন ঘোমটা না গ্যায়।" ছটু আমার কথায় কৌতুহল পরবশ হইয়া বলিল—"চল দেখি কেমন তোমায় দেখে ঘোমটা গ্যায়?" ছটু ও আমি সরকারদের বাড়ী ছুটিয়া গেলাম। নূতন বৌ দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার শাশুড়ী সরকার গিন্নী নূতন বৌয়ের চুলের বিনুনি করিতেছিলেন; আমাকে দেখিয়া নূতন বৌ তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিতে গেলে সরকার গিন্নী বলিলেন—"কাকে দেখে ঘোমটা দিচ্ছ বৌমা —ও আমার ঘরের ছেলে তা'ছাড়া ওত দুধের ছেলে, বয়সই বা কি? ওকে দেখে ঘোমটা দিতে হবে না। ও তোমার বামুন ঠাকুরপো হ'ল।" শাশুড়ির বাক্যে নূতন বৌ খুসী হইয়া ঘোমটা খুলিয়া দিয়া হাসিয়া আমার দিকে চাহিল। খুসীতে তাহার মুখখানি ভরা। কিন্তু তাহার এই হাসিতে আমি খুসী হইতে পারিলাম না। বিশেষ করিয়া ছটু দাঁড়াইয়া আছে। নতুন বৌ ঘোমটা না দেওয়ায় আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলাম। ছটু বলিল—"কি গো মশায় আপনাকে দেখে নূতন বৌ তা হ'লে ঘোমটা গ্যায়?" ছটুর এইরূপ উক্তিতে জ্বলিয়া গেলাম এবং ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহার দুই গালে চড় লাগাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

গোবর্ধন আমার সন্ধানে ফিরিতেছিল। পথে দেখা হইতে তাহাকে আমার দুঃখের কাহিনী বলিলাম। সরকারদের বৌটা এত পাজী এবং অসভ্য যে তার তুলনা নাই। পুরুষ মানুষ দেখিলে ঘোমটা গ্যায় না—তুই দেখিস গোবরা ঐ মেয়ে যদি ঝগড়াটে না হয় তবে আমার নাম মিথ্যে, এমন কি ভবিষ্যতে ঐ বৌ কখনও শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করিবে না ইত্যাদি নানারূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিলাম। আমার এত দুঃখেও গোবরার ভ্রুক্ষেপ নাই—গোবরা দাঁত বার করিয়া জবাব দিল—"তোকে দেখে ঘোমটা দিতে যাবে কেন?"—গোবরা কিছুক্ষণ পরে আমার মর্মবেদনা

বুঝিল এবং অনেক গবেষণা ও চিন্তার পর সে আবিষ্কার করিল 'যেসব মানুষ বিড়ি বা তামাক খায় না তাহাদিগকে দেখিয়া সাধারণতঃ বধূরা ঘোমটা দেয় না। বিড়ি বা তামাক না খাইলে বৌয়েরাই বা জানিবে কি করিয়া যে আমরা বড় হইয়াছি।' গোবর্ধনের কথা খুবই সমীচীন মনে করিলাম। কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাইলাম 'আমি যেন হুঁকা কলিকা লইয়া নূতন বৌয়ের কাছে আগুন চাহিতেছি এবং নূতন বৌ ত্রস্তে ঘোমটা টানিয়া উনানের একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে অঙ্গার ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

গোবর্ধনকে বলিলাম—"বিড়ি খাবি মাইরী?"

—"দূর বিড়ি পাব কোথায় যে খাব?"

কথাটা খুবই ঠিক, বিড়ি কোথায় পাওয়া যায়? সকল দোকানেই বিড়ি পাওয়া যায় কিন্তু তাহারা সকলেই আমাদের চেনে। আমরা বিড়ি কিনিতে গেলে এখনি প্রশ্ন করিবে "বিড়ি কে খাবে?" যতই বিড়ির কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম ততই বিড়ি যে অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু তাহা বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে অনেক চিন্তার পর উভয়ে স্থির করিলাম কুলীনগ্রামে যাইয়া বিড়ি কিনিতে হইবে। আমি কখনও কুলীনগ্রাম যাই নাই। আমাদের গ্রাম হইতে তাহা তিন চার মাইল দূরে। গোবর্ধন দুই একবার গিয়াছে। পরের দিন ভোরে চারিটীমাত্র পয়সা সংগ্রহ করিয়া কুলীনগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কুলীন গ্রামের কোন দোকানদার আমাদের চেনে না, তথাপি ভয়ে ভয়ে একটি বেনের দোকানে যাইয়া চার পয়সার বিড়ি চাহিলাম। দোকানদার বলিল—"লাল স্থতো না সাদা স্থতো দেব?" দোকানদারের প্রশ্নে বিমূঢ় হইয়া গেলাম। চাহিলাম বিড়ি, আর বলে কিনা লাল স্থতো না সাদা স্থতো দোব? তবে কি আমাদের ছেলে মানুষ ভাবিয়া বিড়ি দিবে না?

গোবর্ধন বলিল—"ওগো দোকানী স্থতো চাই নাই বিড়ি চেয়েছি। এখন আমরা বড় হ'য়েছি, হ্যাঁ আমরা বুঝি বিড়ি খেতে পারি না।"

দোকানদার বলিল—"কেন পারবে না। তোমাদের চেয়ে কচি ছেলেরা বস্তা বস্তা বিড়ি ফুঁকে দিচ্ছে আর তোমরা পারবে না? তবে জিজ্ঞাসা করছি লাল সুতো মার্কা, না সাদা সুতো মার্কা বিড়ি দেব?" এই বলিয়া দোকানি চার পাঁচ তাড়া নানা প্রকারের বিড়ি দেখাইল। একটি বিড়ির তাড়ায় দেখিলাম একটি গোলাপ ফুল হাতে করিয়া দুইজন যুবক যুবতি দাঁড়াইয়া আছে এইরূপ ছবির লেবেল। আমরা ছবির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বলিলাম ঐ ছবিওয়ালাটা দাও। দোকানি বলিল—"ওটা গোলাপসুন্দরী বিড়ি, বড় কড়া তোমরা ছেলে মানুষ খেতে পারবে কি?" কি, এ ব্যাটা দোকানিও আমাদের ছেলেমানুষ মনে করিয়া উপেক্ষা করিতেছে? দোকানির কথায় রাগ হইল বলিলাম—"খুব পারব? যত কড়াই হোক আমরা আর নেহাৎ ছেলেমানুষ নই।" আমরা চার পয়সায় তিন তাড়া গোলাপসুন্দরী বিড়ি লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যে পথে সাধারণতঃ লোক চলাচল করে সেই পথে বাড়ী ফেরা সমীচীন মনে হইল না। কি জানি পথে যদি কাহারও সহিত দেখা হইয়া যায়। বহু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ীর পথ ধরিলাম। দূরে যদি কোন লোক যাইতেছে তখনি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি। নিশ্চয়ই ঐ লোকটা আমাদের চেনে এবং আমরা যে ঐরূপ ঘুরিয়া বাড়ী যাইতেছি ইহার কারণ হয়ত সে জানে। নিশ্চয়ই আমরা বিড়ি কিনিতে কুলীন-গ্রামে গিয়াছিলাম তাহা না হইলে—কুলীনগ্রামে আমাদের কি দরকার থাকিতে পারে? মনে হইতে লাগিল গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা জানিয়া গিয়াছে যে আমরা কুলীনগ্রামে বিড়ি কিনিতে গিয়াছি। মনে হইতে লাগিল গ্রামের সহস্র চক্ষু শাসন করিবার জন্য উদ্যত আছে। ভয়ে ভয়ে গোবরাকে বলিলাম—"গোবরা ফেলে দে মাইরী—আর বিড়ি খেয়ে কাজ নাই।" গোবধন ফেলিতে রাজী হইল না। যে জিনিষ পয়সা দিয়া সংগ্রহ করিতে হয় গোবর্ধন তাহাকে অমূল্য বস্তু মনে করে। সে

বলিল—"দূর চার চারটে পয়সা নষ্ট হবে?" অগত্যা শঙ্কিত অন্তরে বাড়ী ফিরিলাম; গোবর্ধন গ্রামে পৌঁছিবার পূর্বে একটী ছোট তাল গাছের শাখার অন্তরালে তিন তাড়া বিড়ি লুকাইয়া রাখিল। বিড়ির উপর আমার সেরূপ আগ্রহ নাই, কিন্তু গোবর্ধনের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম—"গোবরা তোর ত খুব বুদ্ধি মাইরী—"

গোবর্ধন উত্তর করিল—"এত আর ইংরীজি গ্রামার নয় যে চট্ ক'রে বুদ্ধি খেলিয়ে উত্তর দিবি? এ সব বাবা—"

গ্রামার অপেক্ষা এ সব বিষয়ে যে বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন তাহা স্বীকার করিলাম। তাই গোবর্ধনকে সমর্থন করিয়া বলিলাম—"তুই বুদ্ধি না খেলালে এখুনি মুস্কিল হ'য়েছিল আর কি?" বিড়ি তিন তাড়া রাখিয়া যাইতে আপত্তি না থাকিলেও ছবি তিনটি ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা ছিল না। পথে ঠিক হইয়াছিল তিনটি ছবির দুইটী আমি লইব কারণ ছটুকে একটি দিতে হইবে। গোবর্ধন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হইয়াছিল কারণ বিড়ি কেনার পয়সা চারটি আমিই দিয়াছিলাম। অতএব গোবর্ধনের চেয়ে আমার দাবীই অধিক। আমি ভাবিলাম গোবর্ধন যদি পরে আসিয়া তিনটি ছবিই লইয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে? তাই বলিলাম—"ছবি তিনটে নিয়ে যাই চল গোবরা।" অনেক তর্কের পর ছবি তিনটি ছিঁড়িয়া লইলাম। আমি দুইটী ছবি এবং গোবর্ধন একটি লইল এবং আমরা উভয়ে একটি করিয়া বিড়ি লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী আসিয়াই ছবি দুইটী বইয়ের প্রথম পাতায় যত্নসহকারে আটা দিয়া সাঁটিয়া দিলাম। গোবর্ধন ও আমি ঠিক করিয়াছিলাম সরকার বাড়ীতে যখন কেহ থাকিবে না তখন বিড়ির জন্য আগুন চাহিতে নূতন বৌয়ের কাছে যাইব। প্রায় এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিবার পর সে সুযোগ মিলিল। একদিন বৈকালে গোবর্ধন ও আমি দুইটী বিড়ি লইয়া নূতন

বৌয়ের কাছে গেলাম। অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলাম—"নূতন বৌদি একটু উনোন হতে আগুন দাও ত বিড়িটা ধরিয়ে নিই।" সেই সঙ্গে লক্ষ করিতে লাগিলাম বিড়ি হস্তে আমাদের দেখিয়া নূতন বৌ ঘোমটা দেয় কি না। কিন্তু এক অঘটন ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ঘোমটা ত দূরের কথা নূতন বৌ বলিল—"ওকি ঠাকুরপো! বিড়ি খাওয়া কি? তোমরা ছেলে মানুষ বিড়ি খেতে শিখেছ এরমধ্যে? দাঁড়াও আমি বামুন কাকিমাকে ব'লে দিচ্ছি।" নূতন বৌয়ের কথায় সমস্ত পুরুষত্ব জল হইয়া গেল। হাত জোড় করিয়া বলিলাম—"বৌদি এই নাক্খৎ কানমলা দিচ্ছি মাকে বোল না যেন।" আমরা যদি আর বিড়ি না খাই তবে সে বলিবে না এই প্রতিশ্রুতি দিল। আমরা কালী দূর্গা ওলাইচণ্ডি প্রভৃতি সাংঘাতিক সাংঘাতিক দেব দেবীর দিব্য দিয়া বলিলাম "আর জীবনে বিড়ি খাইব না।" গোবর্ধন ও আমি কোনরূপে পলাইয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

আমি বাহির হইয়াই বলিলাম—"দেখেছিস গোবরা বউটা কেমন পাজী—আমি বলি নাই খুব ঝগড়াটে হবে? ও নিশ্চয়ই বলে বেড়াবে লোককে।"

—আরে বলুক না তখন বুঝবে গোবর্ধনের ঢিলের জোর—মাথাটা আস্ত থাকবে?"

ঐরূপ দুষ্ট বৌয়ের মাথা আস্ত রাখিলে বহু অনর্থের কারণ হইবে সেইজন্য গোবর্ধনের বাক্যে আমিও সায় দিলাম। একটা ছোট্ট বৌ আমাদের মত বড় মানুষকে এমন করিয়া কাবু করিতে পারে ইহাতে কাহার না রাগ হয়?

বাড়ী ফিরিলাম। সর্বনাশ ছটু আমার বইয়ের ছবি লইয়া মাকে দেখাইয়াছে মা ও ঠাকুরমা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আমি পাকা বিড়িখোর হইয়া গিয়াছি। বাড়ী পৌছিবামাত্র মা ত ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় বসাইয়া

দিলেন। অন্যদিন হইলে ঠাকুরমা আড় হইয়া মায়ের মারে বাধা দিতেন এমন কি প্রয়োজন হইলে মাকে গালিগালাজ করিতেন। আজ কি না সেই ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন—"তা এই বয়সে বিড়ি খেলে কে আর ভাল বাসবে? আসুক ওর বাবা এখন আর মেরে কাজ নাই বৌমা ওর বাবা এসে ছেলের গুণ দেখুক?" তখনও জানি না ছটুর জন্য মার খাইতেছি। মনে করিলাম নতুন বৌ এ কথা প্রকাশ করিয়াছে। মনে মনে নতুন বৌয়ের উপর ক্রুদ্ধ হইলাম। পুনরায় মায়ের নিকট নাকেখৎ ও কানমলা খাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম "জীবনে আর বিড়ি খাইব না?" বিড়ির যে কিরূপ আস্বাদ তখনও আমরা গ্রহণ করি নাই। কিন্তু বিড়ি খাওয়ার সকল শাসন সেদিন সহ্য করিতে হইয়াছিল। ঠাকুরমা সিদ্ধান্ত করিলেন—"মাণিক আমার দুধের ছেলে ও বিড়ি খাওয়ার কি জানে ঐ গোবরা পোড়ারমুখো ছাড়া কে আর এই সব কুকাজ শেখাবে?" বিড়ির ব্যাপারে গোবধনের কোন দোষ ছিল না। গোবর্ধনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় মনে মনে ব্যথিত হইলাম। গোবর্ধন পরে শুনিয়া বলিয়াছিল— "আমি জানি যত দোষ 'নন্দ ঘোষ'এর।"

সেদিন ছোট্ট একটি বালিকাবধূ কেমন করিয়া তাহার চেয়ে বয়সে বড় দুইজন কিশোরকে শাসন করিয়াছিল এবং আমরা অবনত মস্তকে তাহার শাসন বাক্য মানিয়া লইয়াছিলাম আজও তাহা মনে পড়ে। কৈশোরে পদার্পণ করিয়াও আমার যখন পৃথিবীর বুকে স্বাধীন হইয়া চলিতে পারিতে-ছিলাম না তখন একজন বালিকা বধূ কেমন অনায়াসে একটি বয়স্কা যুবতীর আসন দখল করিয়া বসিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। আমরা পুরুষ মানুষ ভাবি আমরা সংসারে চলিবার পক্ষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা বেশী উপযুক্ত। কিন্তু কেন জানি না আমার সেইদিন হইতে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে নারী সর্ববিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী মানসিক বলে বলীয়সী।

আমাদের স্কুলে ইন্‌স্‌পেক্টার আসিয়াছেন। ইন্‌স্‌পেক্টার একটি সাইকেল চড়িয়া আসিয়াছিলেন। গোবর্ধন ইতিপূর্বে সাইকেল দেখে নাই। আমি রাজসাহীতে দেখিয়াছি! গোবর্ধন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সাইকেল চড়ার কায়দা লক্ষ্য করিয়াছিল। একদিন মধ্যাহ্নে (তখন স্কুলের ছুটী) গোবর্ধন ও আর কয়েকজন সঙ্গী আসিয়া বলিল—আজ তাহারা সাইকেল চড়া শিখিতে যাইতেছে। যতদুর মনে পড়ে দশ ক্রোশের মধ্যে সাইকেল কাহারও ছিল না—কেমন করিয়া যে সাইকেল শেখা হইবে আমি বুঝিতে পারিলাম না। গোবর্ধন বলিল—"দেখবি যখন সাইকেল চড়া শিখিয়ে দেব তখন বুঝতে পারবি।" সেই সঙ্গে তাহারা একটি পরিকল্পনা পেশ করিল এই যে—সাইকেল চড়া শিক্ষা হইলে আমরা সকলে রেঙ্গুন চলিয়া যাইব। গ্রামে থাকিলে আর আমরা বেশীদিন বাঁচিব না কারণ মার খাইতে খাইতে আর বেশীদিন জান লইয়া টেকা যাইবে না। গোবর্ধনের কথার সারবত্তা বুঝিতে দেরী হইল না। কিন্তু রেঙ্গুনের সহিত সাইকেলের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে এবং রেঙ্গুন ত সমুদ্র পার হইয়া যাইতে হয় সাইকেল সেখানে কি কাজে লাগিবে বুঝিতে পারিলাম না। বিষ্টু বলিল "তুই আচ্ছা লোক মাইরী—রেঙ্গুন ত জাহাজে করে যাবো। সেখানে গেলেই যে বাঙ্গালীদের ধ'রে ধ'রে চাকরি দ্যায় একশ টাকা মাইনে আর একটা করে সাইকেল।" বিষ্টুর এক মামা নাকি রেঙ্গুনে থাকে সে এর মধ্যে বাড়ি আসিয়া তাহার চাকরির কথা বলিয়া গিয়াছে। গোবর্ধন বলিল—"সাইকেল কি হাতীও সেখানে খুব সস্তা এমন কি হাতী চাইলেও দিতে পারে—তবে দরকার কি হাতী নিয়ে যদি আবার শুঁতিয়ে মুতিয়ে দ্যায়। ওবাবা শুঁতলে আর 'বাবা' ব'লতে হবে না।" না হাতীর

ত্রিসীমানায় যাওয়া ঠিক হইবে না একথা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম, সাইকেল ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। সেইজন্য আমরা কয়েকজন বালক বৈশাখ মাসের দ্বিপ্রহরে বিনা সাইকেলে সাইকেল চড়িবার মত অভিনয় করিয়া মুখে কিড়িং কিড়িং বলিতে বলিতে সারা দুপুর প্রায় দুই মাইল রাস্তা উর্ধ্বশ্বাসে বারে বারে দৌড়াইতে লাগিলাম।

হরিচরণ অত্যন্ত দরিদ্র। রেঙ্গুন যাওয়ার উৎসাহ তাহারাই বেশী। সাইকেল শেখা হইলে অবশেষে যদি যাওয়া না হয় তাই সে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে চাহে। বিষ্টু অনেক মাথা ঘামাইয়া বলিল "হ'রে তোর ভাবনা কি? যারা সাইকেল শিখেছে—তা'দিকে দলিলে সই করতে হবে। সই করার পর কেউ যদি যেতে রাজী না হয় তখন মরবে ছ'মাস জেল খেটে।"

বিষ্টুর কথা সকলে সমর্থন করিল। সাইকেল শিখিতে কয়েক দিন দেরী হইবে। ইতিমধ্যে রেঙ্গুণ যাইবার সকল বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সাইকেল শিক্ষা যে কবে শেষ তাহা গোবর্ধন ছাড়া কেহ বলিতে পারে না। বিষ্টু দলিল লিখিয়া হাজির হইল। দলিল লিখন পত্র নামক পুস্তক হইতে দলিলের খসড়া করিয়া লেখা হইল।

"আমরা যদি কোন কারণে রেঙ্গুন যাইতে না পারি বা না যাই তবে এক শত টাকা জরিমানা দিব এবং ছয় মাস জেল খাটিব।"

সাত আট জন বালক আমরা উক্ত দলিলে সহি করিলাম। পুরাতন খাম হইতে টিকিট ছিঁড়িয়া ঐ দলিলের মাথায় আঠা দিয়া সাঁটিয়া, ষ্ট্যাম্পের কাজ সারা হইল। কমলাকান্ত বয়সে আমাদের অপেক্ষা ছোট ছিল— দলিল সহি করিয়া অবধি তাহার মনে স্বস্তি নাই। তাহার ইচ্ছা ছিল সাইকেল শিখিয়া রেঙ্গুন না যাওয়া কিন্তু গোবর্ধন রাজী হইল না কারণ সে সাইকেল শিখাইতেছে। কমলাকান্ত বলিল—"সাইকেল গোবরাকে

শেখাতে হবে কেন ? আমি নিজেই শিখে নিতে পারি—ভারি ত মুখে কিড়িং কিড়িং ক'রতে ক'রতে দৌড়ুনো বই ত নয় !"

—"কি মুখে কিড়িং কিড়িং ক'রে দৌড়োন বই ত নয়, তবে পারিস নাই কেন শিখতে এখনো ?"—গোবর্ধন সরোষে জিজ্ঞাসা করিল। কবে যে সাইকেল শেখা শেষ হইবে আমরাও জানিতাম না। গোবর্ধনের মর্জির উপর তাহা নির্ভর করিতেছে—কখনও কৃষ্ণধনকে বলে "তোর আর দুই এক দিন লাগবে, কখনও আমাকে বলে তোর দ্বারা হবে না"—ইত্যাদি। সত্যকারের একটা সাইকেল লইয়া পরীক্ষা করিবার উপায় নাই যে শিক্ষা হইয়াছে কি না। কারণ এখানে কাহারও সাইকেল নাই ! অতএব গোবর্ধনের মর্জি ছাড়া গত্যন্তরও নাই। হরিচরণ শীঘ্রই রেঙ্গুন যাইতে চাহে কিন্তু গোবর্ধনের সাইকেলের ক্লাস আর শেষ হইতেছে না। গোবর্ধন মধ্যে মধ্যে আশা দেয়—"আর দু'চার দিনের মধ্যেই হ'য়ে যাবে এর মধ্যে সব জোগাড় ক'রে নে" এই বলিয়া আমাদের আশ্বস্ত করিল। সেই সঙ্গে সে বলিল—আমার সব জোগাড় হ'য়ে গেছে। —সর্বনাশ, গোবর্ধনের রেঙ্গুন যাইবার সব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে ! গোবর্ধনকে সকলে বলিল—"কি সব জোগাড় করিল ভাই—ক' টাকা সঙ্গে নিয়েছিস ?" গোবর্ধন গম্ভীর হইয়া জবাব দিল—"আমার সব ঠিক হ'য়েছে গেছে—চল দেখবি চল—" আমরা সকলে গোবর্ধন কি সব জোগাড় করিয়াছে দেখিতে গেলাম। গোবর্ধনের প্রায় অধিকাংশ সরঞ্জামই কোন গাছের কোটরে বা কাহারও গোয়ালের মাচায় সঞ্চিত থাকে। গোবর্ধন গোহালাদের গোয়ালের মাচা হইতে কতকগুলি জিনিষ বাহির করিল। আমরা দেখিলাম প্রায় পাঁচ সাত সের বাবলার আঠা এবং একটি বিস্কুটের টিনে প্রায় আধ টিন কড়ি এবং আরও তুচ্ছ সব কয়েকটা জিনিষ। আমরা বলিলাম "আঠা রেঙ্গুনে কি কাজে লাগবে ?"

—"কি কাজে লাগবে? জানিস রেঙ্গুনে একশ টাকা দুশো টাকা ক'রে বাবলা আঠার সের? সে দেশে একদম বাবলা আঠা নাই। অমন কলকাতা সহর সেখানে বাবলা আঠা মেলে না যেখানে বাঘের দু'চোখ পাওয়া যায় ত রেঙ্গুনে বাবলা আঠা পাওয়া যাবে?" সত্যই ত, কলিকাতায় বাবলা আঠা দুস্প্রাপ্য। যদু মজুমদার মহাশয় গোবর্ধনের নিকট হইতে বাবলা আঠা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান। গোবর্ধন একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—বাবলা আঠা কলকাতায় মেলে না? মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন—কলকাতায় কি বাবলা গাছ আছে এখানকার মত?

আমরা গোবর্ধনের বুদ্ধির তারিফ করিলাম এবং মনে মনে হিংসাও করিলাম। নগেন চুপি চুপি বলিল—"চ' বাবলা আঠা জোগাড় করিগে—" গোবর্ধন কথাটা শুনিতে পাইয়া বলিল—"আর বাবলা আঠা পেতে হয় না, তল্লাটের গাছের আঠা আর আমি রাখি নাই।" সাত আঠ সের বাবলা আঠা যখন গোবর্ধন সংগ্রহ করিয়াছে তখন সে স্থানে আর আঠা নাই তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। গোবর্ধনকে বলিলাম—"কড়ি কি হবে?" গোবর্ধন বলিল—"রেঙ্গুনে ত কড়িরই চলন সেখানে পয়সা ফয়সার দরকার হয় না।" যাহা হোক তবু ভরসার কথা যে কড়ি সংগ্রহ করা যাইবে। পূর্বে প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়ীতে কড়ির সিকা আনলা থাকিত স্ত্রীলোকেরা ইহা কুটীরশিল্প হিসাবে তৈয়ারী করিত। আমি অনায়াসে বাড়ীর ঐরূপ আনলা হইতে প্রচুর কড়ি সংগ্রহ করিলাম।

আমরা যখন সাইকেল শিখিতাম পাশের গ্রামের বাজিৎপুরের কয়েকটি ছেলে আসিয়া আমাদের ঐরূপ দৌড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বাজিৎপুর আমাদের গ্রাম হইতে মাত্র আধ মাইল দূর। কয়েক বিঘা আবাদী জমি ও এক খণ্ড পতিত ভূখণ্ড আমাদের উভয় গ্রামকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে মাত্র, নতুবা একটি গ্রামের এপাড়া ওপাড়া বলা চলে। আমরা বাজীৎপুরের বালকদিগকে সকল কথা বলিলাম তাহারাও আমাদের

প্রস্তাব সমর্থন করিল এবং সাইকেল শিখিয়া রেঙ্গুন যাইবে স্থির হইল। বাজিৎপুর ও হরিণপুরের মধ্যে পতিত ভূখণ্ডকে লোকে চণ্ডিতলা বলে। চণ্ডীতলা হইতে আমরা দৌড়াইতে সুরু করিতাম। একদিন সাইকেল শিখিতে শিখিতে বাজিৎপুরের ছেলেরা বলিল—"আমাদের চণ্ডিতলা"। আমাদের গ্রামের ছেলেরা বলিল—"না আমাদের"। এই লইয়া উভয় দলের মধ্যে কথা কাটাকাটি সুরু হইয়া পরে গালাগালি আরম্ভ হইল। গোবর্ধন বলিল—"গালাগালির কি দরকার চণ্ডিতলা কা'দের তা যুদ্ধ ক'রে দখল প্রমাণ করা উচিৎ। ইতিহাসে পাণিপথের যুদ্ধ পড়িস্ নাই? যুদ্ধ ছাড়া ঐ স্থান আমরা কা'কেও দখল দিতে পারি না।" সকল বালকই গোবর্ধনের ঐতিহাসিক নজীরে সন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধের দিন স্থির করিল। যথা নির্দিষ্ট দিনে আমরা রণসজ্জায় সজ্জিত হইলাম। লাঠি—তীর ধনুক প্রভৃতি নানাপ্রকার আয়ুধে আমরা সজ্জিত হইলাম। পটলা অত্যন্ত সাধু ভাষায় বলিল—"উহারা অনেক বিছুটী গাছ সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের দ্বারা আমাদের প্রহার করিবে।"

বিষ্ণু শঙ্কিত হইয়া বলিল—"বিছুটীর যে জ্বলন মাইরী?

গোবর্ধন উপেক্ষার সহিত বলিল—"লে লে বিছুটী আবার অস্ত্র, ওর ওষুধ নাই মনে করিস্ গোবর মাখ্‌লে আর গায়ে বিছুটী লাগবে না।" গোময় লাগাইলে যে বিছুটীর জ্বালা যায় তাহা জানিতাম। সকলে গোবর্ধনের নির্দেশ মত সারা অঙ্গে গোময় মাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমরা যে স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সেই স্থানে কয়েকটি আমগাছ ও তালগাছ ছিল। গোবর্ধন পর্যবেক্ষণ মানসে একটি তাল বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং আমরাও কয়েকজন তাহার নির্দেশ মত তীর ধনুক লইয়া আমগাছে উঠিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজিৎপুরের সৈন্যদল দেখা গেল। তাহারা কেরোসিনের টীনে রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের কোনরূপ

বাদ্যভাণ্ডের আয়োজন ছিল না। বাজিৎপুরের ছেলেদের যুদ্ধ সাজ দেখিয়া আমাদের উৎসাহ কমিয়া আসিল এমন কি আমাদের সেনাপতিরও মুখ হইতে কোন কথা শুনিতে পাইলাম না তাহাতে উৎসাহ আরও দমিয়া গেল। বাজিৎপুরের সেনাপতি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে। উমাপদর বাবা ডাক্তার, তাহার একটি ছোট রুগ্ন ঘোড়া আছে। তাহাকে দেখিলে আমরা 'পক্ষীরাজ' বলিতাম। অর্থাৎ ঐরূপ ঘোড়ায় কোন ভদ্রলোকে চড়ে না। কিন্তু আজ যখন সেই ঘোড়ায় উমাপদ সেনাপতিরূপে অবতীর্ণ হইল তখন আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। যুদ্ধে যে হার অনিবার্য তাহা বুঝিলাম। কেষ্ট গাছের উপর হইতে বলিল—"ওরে পটলা গোবর মাখাই সার হ'ল দেখছি।"

উমাপদ অশ্বারোহণে আমাদের দিকে আগাইয়া আসিল। সে তখন যুদ্ধের মতলবে আসে নাই। তাহার সৈন্যদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া যুদ্ধ কি ভাবে আরম্ভ হইবে তাহার আলোচনার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু গোবর্ধনের ইঙ্গিতে আমরা আমগাছ হইতে 'মরিবাঁচি' করিয়া উমাপদর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। দশ পনের জন বালক যখন আমরা অশ্বপুঙ্গব তথা সেনাপতির ঘাড়ে উচ্চ বৃক্ষ হইতে পতিত হইলাম সেনাপতি অশ্ব হইতে নীচে পড়িয়া গেল। অশ্বপুঙ্গব ইতিপূর্বে এইরূপ অবস্থায় না পড়ায় ঊর্ধ্বশ্বাসে সেনাপতিকে ফেলিয়া পলায়ণ করিল। আমাদের সৈন্যদল রণহুঙ্কারে দিগন্ত কাঁপাইয়া উমাপদর উপর কিল চড় এবং বিছুটীর চাবুক লাগাইয়া প্রায় সংজ্ঞাহারা করিয়া ছাড়িল। সেনাপতির এইরূপ দুর্দশা দেখিয়া বাজিৎপুরের ছেলেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। অনায়াসে আমরা যুদ্ধ জয় করিলাম। কিন্তু উমাপদ যে উত্থানশক্তি রহিত তাহার কি হইবে? উমাপদ অবশ্য এত প্রহার খাইয়া দুঃখিত হয় নাই। কারণ যুদ্ধ করিতে আসিয়া সে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু আমাদের পক্ষের সেনাপতি যে রণনীতি

মানিয়া চলে নাই সে বারবার সেই অভিযোগ করিতে লাগিল। গোবর্ধন বলিল—"যুদ্ধে কি সেনাপতি ব'লতে আসে কেমন ক'রে যুদ্ধ ক'রতে হবে? আমরা যে তোকে কেটে দিই নাই এই ঢের!" উমাপদকে আমরা তুলিয়া আনিয়া কেষ্টদের বাড়ীতে তুলিলাম। কেষ্ট ও তাহার বিধবা মা ছাড়া বাড়ীতে কেহ থাকে না। ঐ স্থানে তুলিলে কোনরূপ হাঙ্গামার সৃষ্টি হইবে না জানিয়া তাহাকে ঐ স্থানেই তোলা সমীচীন মনে করিলাম। উমাপদর প্রহারের কথা অবশ্য প্রকাশ হয় নাই। আমরা ছেলেদের দল, বাহিরে যাহা করিতাম তাহা কোন বয়স্ক লোককে কদাচিৎ প্রকাশ করিতাম না। বাজিৎপুরের ছেলেরাও যে তাহাদের সেনাপতির দুর্দশার কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিবে না তাহা জানিতাম। এবং উমাপদও আমাদিগকে সেইরূপ আশ্বাস দিয়াছিল।

গোবর্ধন কয়েকদিন পরে বলিল যে সকলের সাইকেল শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে এইবার রেঙ্গুন যাওয়ার দিন স্থির করিতে হইবে। সত্যই রেঙ্গুন যাইতে হইবে এমন কথা ইতিপূর্বে মনে স্থানও দিই নাই। পটলা আমার মনের অবস্থা জানিত—বলিল—"তাইত কি হবে মাণকে—আমার ভাই রেঙ্গুণ যাবার ইচ্ছা ছিল না নেহাৎ সাইকেল শেখার লোভে দলিলে সই ক'রেছি, এখন কি হবে বল দেখি?" আমিও পটলার কথার জবাব দিতে পারিলাম-না। কারণ নিজের ফাঁসির আদেশ নিজেই সহি করিয়াছি। রেঙ্গুণ যাওয়ার কথায় আমার সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল। হয় রেঙ্গুণ যাইতে হইবে নতুবা জেলে যাইতে হইবে। একদিন দুদিনের জন্য জেল নয়, ছয়মাসের জন্য জেল। রাজসাহীতে আমি জেল দেখিয়াছি। দাদামহাশয় ঠিকেদারী করিবার সময় জেলের মধ্যে অনেক কাজ করিতেন আমি ও পরাণ দা দুই একবার দাদামহাশয়ের সহিত জেল দেখিতে গিয়াছি। সেখানকার কয়েদীদের অশেষ দুর্গতির

কথা স্মরণ হইতেই মুখ শুখাইয়া গেল। ইহাপেক্ষা রেঙ্গুণ যাওয়া সোজা। কিন্তু রেঙ্গুণ যাইলে আর বাড়ি ফিরিতে পাইব না। কারণ বাড়ি ফেরার আর পথ থাকিবে না। আর ফিরিলে পিতৃদেব জীবন্ত রাখিবেন না তাহাও বুঝিতে দেরী হইল না। রেঙ্গুণ যাইতে আরও অসুবিধা আছে। ঠাকুরমার কাছে নহিলে শুইতে পারি না। বিশেষ করিয়া রাত্রিকালে ভূতের উৎপাত আছে। গোবরাকে আদৌ বিশ্বাস নাই। সে যে আমাদের অনায়াসে ভূতের মুখ ঠেলিয়া দিতে পারে তাহা জানি কিন্তু উপায় কি? গোবরাকে দেখিলেই জেলের ওয়ার্ডার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কি কুক্ষণেই যে সাইকেল শেখার প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলাম!

পটলা আমাকে চুপি চুপি বলিল যে তাহার সাইকেল শেখা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সত্যকারের সাইকেল চড়িলে সে নিঃসন্দেহে পড়িয়া যাইবে। সে যখন সাইকেল চড়িতেই পারিবে না মিথ্যা রেঙ্গুণ যাইয়াই বা কি হইবে? আমি অবশ্য পটলার মত মিথ্যা কথা বলিতে পারিলাম না কারণ গোবর্ধন নিজে আমার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছে আমি খুব দ্রুত সাইকেল চালাইতে পারি এবং এই জন্য আমার অহংকারও কম ছিল না আমি বলিলাম—"সাইকেল চড়তে শেখাই সার রেঙ্গুন গেলে যে সাইকেল পাওয়া যাবে তার কি কোন স্থিরতা আছে।" পটলা বলিল "রস্‌কেরও যাবার ইচ্ছা নাই।" রসিকের যাইবার ইচ্ছা নাই শুনিয়া কিঞ্চিৎ আলোক রশ্মি দেখিতে পাইলাম। পটলা বলিল—"অনেকের যেতে মন নাই কিন্তু গোবরা আর কেষ্টার ভয়ে স্বীকার করছে না।" রসিককে জিজ্ঞাসা করিলাম কি উপায় রেঙ্গুনে যাওয়া বন্ধ করা যায়? রসিকের বাবা উকিলের মুহুরী তাই রসিকের আইন সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা বেশী। রসিক বলিল—"ন্যাথ মাণকে কোন উপায়ে ঐ দলিলখানার নকল জোগাড় কর। তাতে কি লেখা আছে ভাল ক'রে দেখতে হবে।"

ভয়ে ভয়ে গোবর্ধনের কাছে প্রস্তাব করিলাম দলিলটার নকল দিতে হইবে। গোবর্ধন ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল—"কি, ফন্দি আঁটা হ'চ্ছে যে রেঙ্গুন যাবে না—বাবা শক্ত ঘানি নাও যাও ছয়মাস শ্রীঘর ঘুরে এস।" অনেক তোষামোদের পরে অবশেষে দলিলের নকল দিতে রাজী হইল—কিন্তু তাহার জন্য চারি আনা ফি লাগিবে। কি করিব, বাধ্য হইয়া তিনজনে চারি আনা পয়সা জোগাড় করিয়া গোবর্ধনের নিকট অতিকষ্টে দলিলের নকল লইলাম। রসিক আমি ও পটলা বারংবার পড়িয়াও দলিলের দ্বিতীয় কোন অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। পরিষ্কার লেখা আছে "রেঙ্গুন যাইতে না পারিলে বা কোন কারণে যাওয়া না হইলে ছয় মাস জেল খাটিব।" রসিক বলিল—"এই দলিল নিয়ে একবার জয়নগরের জজসাহেবকে দেখাতে হবে। আমি দু একবার বাবার সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেছি আমাকে সে চেনে।" রসিকের কথায় খুব একটা ভরসা পাইলাম না, কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয় তৃণখণ্ড অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর নাই। অগত্যা রসিকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রসিক আমি ও পটলা জজসাহেবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। জয়নগরের জজসাহেবের খুব নাম। এখন তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। জাজিয়তি করিবার সময় তিনি কয়েকজনের ফাঁসী পর্যন্ত দিয়াছিলেন। আমরা তিনটি বালকে জজসাহেবের কাছে দরবার করিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর জজসাহেবের দেখা মিলিল। জজসাহেবকে দেখিয়া আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হইবার উপক্রম হইল। বিরাট বপু। পটলা চুপি চুপি বলিল—"চল্ মাইরী, পালিয়ে যাই—ফাঁসী দিয়ে দিলে রক্ষে নাই।" আমাদের দেখিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো তোমাদের কি চাই?" মনে মনে বলিলাম "কিছুই চাই না তোমার কাছ হইতে রেহাই চাই।" রসিক কিন্তু মরিয়া হইয়া বলিল—"একটা মোকদ্দমার যুক্তি চাই।" রসিকের কথা

শুনিয়া জজসাহেব হাসিয়া উঠিলেন। এমন টানিয়া টানিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিতে আমি ইতিপূর্বে কাহাকেও দেখি নাই। হাসি যে এমন মারাত্মক ব্যাপার তাহা জানিতাম না। তিনি যত হাসিতে থাকেন ততই আমার মনে হইতে লাগিল কোন অদৃশ্য রজ্জু আমার গলার নিকট ঝুলান রহিয়াছে। এখুনি জজসাহেবের আদেশে ঘ্যাঁচ করিয়া টান দিয়া আমাকে পরলোকে পাঠাইয়া দিবে! রেঙ্গুণ বা জেল যাওয়া ঢের সোজা এখন জজসাহেবের কাছে রেহাই পাইলে হয়। মনে মনে রসিকের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু জজসাহেবের নিকট হইতে কি করিয়া বিদায় লই তাহার উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না।

রেঙ্গুন যাওয়া আমাদের হয় নাই কিন্তু সেই কয়দিন যে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটিয়াছিল তাহা মতে পড়িলে হাসি সম্বরণ করা যায় না। একে একে সকলেই রেঙ্গুন যাওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেও ভয়ে সে কথা কেহ স্বীকার করে নাই। গোবধন আমার প্রাণের বন্ধু, কোনদিন তাহার কোন অকল্যাণ চিন্তা করি নাই, কিন্তু সেই কয়দিন অহরহ গোবর্ধনের মৃত্যু কামনা করিয়াছি। গোবর্ধন হঠাৎ একদিন রায় প্রকাশ করিল আর রেঙ্গুন যাওয়া হইবে না। রেঙ্গুন না যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে সে বলিল সেখানে গেলে মানুষের জাত থাকে না। হরিচরণ গোবর্ধনের এই মত পরিবর্তনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"কি যাবি না তবে জেল খাটবি নাকি?" গোবর্ধন ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল "জেল ত খাটবো, কই জেল দে না দেখি কেমন মুরোদ?" গোবর্ধন জেল খাটিতে রাজী কিন্তু জেল খাটাইবে কে? হরিচরণ আর কোন উত্তর করিতে পারিল না। আমরাও গোবর্ধনের উত্তরে বিস্মিত হইয়া গেলাম। এমন জটিল সমস্যার সে এত সহজে সমাধান করিল ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। এমন না হইলে সে আমাদের নেতা?

মানুষ অহেতুক ভয়ে ভীতিগ্রস্ত হইতে অভ্যস্ত। রেঙ্গুন যাওয়ার

জন্য আমরা যে ভয় খাইয়াছিলাম তাহা হয়ত নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া এই ভয়ের কারণ দেখান যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিরাও ঠিক এমনি করিয়াই অহেতুক ভয় খায় এবং অনাবশ্যক অভিভূত হইয়া পড়ে। বাল্যকালে খানিকটা প্রকৃতির কোলে মানুষ হওয়ায় ভবিষ্যত জীবনে অনেক অহেতুক ভয় হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বাল্যকালে আমরা যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলাম সেই পরিবেশ হয়ত নগরবাসী সভ্য সমাজ অনুমোদিত নয় কিন্তু এ কথা আমি জোরের সহিত বলিতে পারি জীবনযুদ্ধে সৈনিকোচিত শিক্ষাই আমরা ঐ পরিবেশের মধ্য হইতে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সেইজন্য ভবিষ্যত জীবনে অনেক অহেতুক ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

১৫

যে বৎসর আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই সেটি আমার স্মরণীয় বৎসর। সেই বৎসর ছটুর বিবাহ হইয়া গেল। ঠাকুরমা ছটুর বিবাহের পর স্বর্গারোহণ করিলেন। ঠাকুরমার মৃত্যুর তিনমাস পরেই একদিন খবর আসিল পিতৃদেব সন্ন্যাস রোগে তাঁহার চাকুরীস্থলে মারা গিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর বুঝিতে পারিলাম এই সংসারারণ্যে বাঁচিতে হইলে পিতার মত পরমাত্মীয় দরকার। এই বোধ যে ঠিক সেদিন হইয়াছিল তাহা নহে। ইহার পর হইতেই বুঝিতে আরম্ভ করি কি হারাইলাম। জননীর হাহাকার এবং প্রতিবেশীর সান্ত্বনার মধ্যেই কোনরূপে পিতৃশোক ভুলিয়াছিলাম। সেদিন অবশ্য আমি শোকে অভিভূত হই নাই কারণ পিতার মৃত্যু আমাকে নূতন যাত্রা পথের ইঙ্গিত দিতেছিল। সেদিন আমার মনে হইয়াছিল আমি যেন কোন নূতন জগতে প্রবেশ করিতেছি

সেই নূতন জগতে চলার পথে কেহ যেন আমাকে বাধা দিবার রহিল না। এক কথায় বলিতে গেলে পিতার মৃত্যুতে যতটা না শোকার্ত্ত হইয়াছিলাম তদপেক্ষা মুক্তির আনন্দ পাইয়াছিলাম বেশী। এতদিনে যেন কোন বদ্ধ কারাগারের দ্বার মুক্ত হইল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পনর টাকা বৃত্তি পাইয়া পাশ করিলাম। মা বলিলেন "তোর বাবার ইচ্ছা ছিল তুই যতদুর প'ড়তে পারবি ততদুর পড়াবেন। কিন্তু তোর দুর্ভাগ্য যে তা আর হল না। সংসারে যা আয় তাতে কোনরকমে দুবেলা দুমুঠো পেটে খেতে পাওয়া যাবে কিন্তু এই আয়ে তোকে পড়ান যাবে না। আর আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন রাজসাহী যেয়ে তাঁর কাছে অনায়াসে পড়তে পারতিস্। তোর মামার ত অবস্থা তেমন নয় যে পড়াবে?" প্রবেশিকা পরীক্ষার পর প্রায় সকল ছাত্রেরই উচ্চশিক্ষালাভে আগ্রহ হয়। আমারও সেদিন উচ্চশিক্ষালাভের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। পিতৃদেবের মৃত্যুর ফলে যে আমার আশা আকাঙ্ক্ষা এমন ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে কে জানিত? এই প্রথম পিতৃশোক অনুভব করিলাম। সেইরাত্রে অনেকক্ষণ আমার স্বর্গীয় পিতার জন্য অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। অনেক যুক্তি পরামর্শের পর স্থির হইল আমি রাজসাহী যাইয়া কলেজে পড়িব। দুই চার মাসের খরচ কোনরূপে জোগাড় করিয়া লইয়া রাজসাহী যাত্রা করিলাম। বাকি খরচ টিউসনি করিয়া কোনরূপে জোগাড় করিয়া লইতে হইবে। উচ্চ জ্ঞান লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষাই সেদিন আমাকে রাজসাহী টানিয়া লইয়া গিয়াছিল নতুবা একজন বালক কোন কিছু নিশ্চয়তার কথা না জানিয়া ঐরূপ অন্ধকারে পা বাড়াইত না।

আমার মাতামহের বাড়ীতে উঠিলাম। মাতুল মহাশয় সেই বাড়ী এক নূতন ঠিকাদারকে ভাড়া দিয়া দেশের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। ঠিকাদারের নাম মোহিতলাল বসু, শৈশবে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।

তিনি আমার মাতামহের নিকট আসিয়া কখনও কখনও ঠিকাদারির বহুবিধ আলোচনা ও পরামর্শ করিতেন। মোহিত বাবু আমাকে অতি যত্ন সহকারে আপ্যায়িত করিলেন। আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন "দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি।" মোহিত বাবুর স্ত্রী মোহিত বাবুর প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়া বলিলেন "থাক্ না এখানেই বামুনের ছেলে দুটো ভাত খেলে পরকালের কাজ হবে।" মোহিত বাবুর স্ত্রীর পরকালের কাজের জন্যই হোক আর আমার ভাগ্যের জোরেই হোক আমি মোহিত বাবুর গৃহে রহিয়া গেলাম। মোহিত বাবুর দুইটি পুত্র। বড় বিদেশে কোথায় ডেপুটিগিরি করেন তাঁহার ছেলেমেয়ে সংসার তাঁহার কাছেই থাকে। ছোট ছেলে হীরেন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত ঠিকাদারী করেন। হীরেন বাবুর দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। প্রথম পুত্র সে বছর আমার সহিত প্রবেশিকা পাশ করিয়াছে। সেও কলেজে পড়িবে। তারপর এক কন্যা তারপর এক পুত্র এবং সব শেষ আর এক কন্যা।

যদিও ঐ গৃহ আমার মাতামহের গৃহ যেখানে শৈশবে দুইটী বৎসর কাটাইয়া গিয়াছি, তবু আজ যেন তাহা পরের বাড়ী মনে হইতে লাগিল। অশোক আমার সহিত পড়িবে। আমার যে সহপাঠী তাহাকে আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী। আমি জীবনে এতখানি অসহায় এবং অসম্মান বোধ আর কখনও করি নাই। মনে হইতে লাগিল—না, আমার আর উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কাজ নাই আমি আমার হরিশপুরে ফিরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচি। মোহিত বাবু আমার সকল স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তথাপি আমার মনে হইল আরও প্রচুর যেন আমার প্রয়োজন আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা নিতান্ত নগন্য। সেদিন কেন যে আমার ঐ সব কথা মনে হইয়াছিল তাহা আজও বুঝিতে পারি না। মোহিতবাবুর নিকট আমার এমন কি

দাবী থাকিতে পারে যে তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বেশী করিবেন?

মোহিতবাবুর স্ত্রী আমায় গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন। ছোট পুত্রবধূকে ডাকিয়া আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মোহিতবাবুর স্ত্রী বলিলেন "বাবা এ তোমার ছোট মামি মা হয় যখন যা দরকার হবে একে বলবে। কোন লজ্জা করবে না।" আমি প্রণাম করিতে গেলে ছোট মামিমা বলিলেন "ছিঃ ছিঃ বামুনের ছেলে প্রণাম কি?" এই বলিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আমাকে আশির্বাদ করিলেন। ছোট মামিমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। মনে হইল রাজসাহীতে আমি থাকিতে পারিব। ছোট মামিমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পরে শুনিয়াছিলাম মোহিত-বাবু টাকার দিকে খেয়াল না করিয়া বাছাই করা সুন্দরী দুই পুত্রবধূ করিয়াছেন। হ্যাঁ সুন্দরী বটে! ছোট মামিমা প্রায় আমার মায়ের সমবয়সী কিন্তু দেখিলে মনে হয় যেন একটি কিশোরী। তাঁহার স্নিগ্ধ শান্ত লাবণ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

অশোকের সহিত সহজেই ভাব হইয়া গেল। যদিও অশোককে আমার সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হইতে লাগিল তথাপি একমাত্র বয়সে সমান থাকায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা এক জায়গায় দাঁড়াইতে পারিব মনে করিলাম। অশোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি সাবজেক্ট নেবেন মনে করেছেন, সায়েন্স না আর্টস?"

আমি বলিলাম, "আপনি কি নেবেন?"

—"আমি সায়েন্স প'ড়ব ঠিক করেছি আই, এস, সি প'ড়ে ইঞ্জি-নীয়ারীং প'ড়ব। আমাদের ত ঠিকাদারী লাইন, বাবা ব'লেছেন ইঞ্জিনীয়ারীং পড়িয়ে ভাল ক'রে ব্যবসায়ে নামাবেন।"

আমার অবশ্য কোন লাইন নাই। পড়িতে হয় পড়িতে আসিয়াছি। স্রোতের জলের তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছি। কোন নির্দিষ্ট

পথ নাই। জলস্রোতে তৃণের মত যেখানে ঠেকিবে সেইখানে আটকাইয়া যাইব। আমাদের জীবনে আবার মতামত কি? তাই উত্তর দিলাম— "এখনও কিছু ঠিক করি নাই, যা হোক পড়া যাবে।" —"এখনও ঠিক করেন নাই বলেন কি? ভবিষ্যতে কি ক'রবেন তা'ত এখন হ'তেই ঠিক ক'রে নিতে হবে। আপনি যা রেজাণ্ট ক'রেছেন তাতে সায়েন্স নিলে আপনার খুব উন্নতি হবে। মেডিকেলে প'ড়তে চান তাও পারবেন। আজকাল ভারতবর্ষে সাইন্টিষ্টের অভাব আছে, ছেলেদের বিজ্ঞান পড়া খুবই দরকার।"

অশোকের কথায় অবাক হইয়া গেলাম। এ যেরূপ কথাবার্তা বলিতেছে যে কোন স্কুলের মাষ্টার ইহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন কলেজে প'ড়লে সংস্কৃত কাব্যে কি রস আছে তখন বুঝবি। এখন যে ফাঁকি দিচ্ছিস তখন বুঝতে পারবি। সংস্কৃত কাব্যে এমন কি পঠনীয় বস্তু থাকিতে পারে জানিনা। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা পড়িয়া সংস্কৃত কাব্যে কি থাকিতে পারে একরকম ধারণা হইয়া গিয়াছিল। 'আলবালে' জলসিঞ্চনরতা শকুন্তলা অপেক্ষা তাহার হরিণটা অনেকটা আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যদি সম্ভব হয় তবে একটি হরিণশিশু সংগ্রহ করিয়া পালন করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল কিন্তু সংস্কৃত কাব্য মোটেই আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।

সংস্কৃত কাব্য আমাকে আকৃষ্ট না করিলেও অশোকের মত আমার পৈতৃক কোন লাইন নাই যে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনীয়ারীং বা যা হয় একটা কিছু পড়িব। পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় উচ্চশিক্ষালাভ কালে সংস্কৃত কাব্যে যে কিরূপ রস আছে তাহা বুঝিতে পারিব এইমাত্র উচ্চ শিক্ষার একটা ধোঁয়াটে আন্দাজ হইয়াছিল তাই অশোকের কথার উত্তরে আমি বলিতে পারিলাম না আর্টস পড়িব কি সায়েন্স পড়িব।

আমার জন্য বাহিরের একটা ঘর ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। দেখিলাম

আমার প্রয়োজনীয় প্রায় সকল জিনিষই ঠিক করা আছে। ঘরটী পাইয়া আমি খুশী হইলাম। ঘরের একদিকে খাট একটি অন্যদিকে একটি আলমারী ও তাহার পাশে একটি টেবিল এবং কয়েকটি চেয়ার। এই ঘরটীর সহিত যে আমার পরিচয় নাই তাহা নহে। এ আমার মাতামহের বাড়ী কিন্তু তবুও সেদিন যেন এই ঘরটীকে আমার সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইয়াইছিল। প্রথমদিন রাত্রে আমি যখন শয্যাগ্রহণ করি তখন আমার অতিপরিচিত কক্ষে যেন আমি নবাগতরূপে প্রবেশ করি। এই গৃহে পূর্বের যে মমত্বময় পরিবেশ ছিল আজ যেন তাহার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। শয্যাগ্রহণ করিয়া মনে হইল—না এখানে আমি একদিনও কাটাইতে পারিব না। রাজসাহী আসিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছি, আর আমার কলেজে পড়িয়া কাজ নাই। এইরূপ সে রাত্রে কত চিন্তাই না করিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। কখন যে প্রভাত হইয়াছে তাহাত বুঝিতে পারি নাই। জানালার নিকটে কে একজন বলিতেছে "ওরে ডাক্ না খোকন, কি যে ছাই নাম ব'ললে মণীবাবু না কি? বল চা হ'য়ে গেছে এত ঘুম কি?" জানালার দিকে চাহিয়া দেখিলাম একজন কিশোরী ঐ কথা বলিয়া আমার নিদ্রা-ভঙ্গের চেষ্টা করিতেছে। তাহার পাশেই খোকন দাঁড়াইয়া। প্রভাত সূর্যের লাল আভা কিশোরীর শুভ্র বদনে প্রতিফলিত হইয়াছে। মনে হইতেছে কে যেন তাহার গণ্ডদেশে আবির ছড়াইয়া দিয়াছে। কিশোরীর অপূর্ব মুখশ্রী ও দেহ সৌষ্ঠব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। মুগ্ধ হইয়া কিশোরীর দিকে চাহিতেই সে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া খোকনের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। প্রভাত সূর্যের রশ্মি সবুজ আমগাছটাকে সোনালি করিয়া দিয়াছে। বিগত রজনীর চিন্তা-ভারাক্রান্ত মনের অবসাদ মুহূর্তে ঘুচিয়া গেল। সেদিনের সে প্রভাতকে আমার জীবনের প্রথম প্রভাত বলিয়া মনে হইয়াছিল। একটি মাকড়সার

জালকে সোনালি সূর্যের আভায় মনে হইতেছিল কে যেন সোনার জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। সেই দিনের সেই 'পরম' প্রভাতে মনে মনে আমি যে সোনার জাল রচনা করিয়াছিলাম আজ সে কথা স্মরণ হইলে কত বেদনা এবং কত আনন্দই না বোধ হয়।

অবাক হইয়া কিশোরীর গমনপথে চাহিয়া রহিলাম। শকুন্তলা কাব্যের শকুন্তলার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে কি না জানি না তবে হরিণশাবক অপেক্ষা শকুন্তলা যে অনেকাংশে শ্রেয়ঃ তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। রাজা দুষ্মন্তের ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই সেটুকু বুদ্ধি ভগবান তখন হইতেই দিয়াছিলেন তাই অতি সহজেই সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিলাম। পরিচিত কক্ষ নব সাজসজ্জায় নূতন মনে হইতে লাগিল। বৃহৎ দরদালানে যেখানে আমার মাতামহের আমলের একটা ভাঙ্গা খাট, তাহার নীচে স্তূপীকৃত অব্যবহার্য তৈজসপত্রাদি থাকিত ঠিক সেই স্থানটিতে পরিপাটী করিয়া সাজান আছে একটী টেবিল এবং কয়েকটী চেয়ার; একপাশে একটী মিটসেফ্। টেবিলটি শুভ্র চাদরে ঢাকা। টেবিলের উপর একটি ফুলদানিতে কয়েকটি তাজা গোলাপ। চা খাওয়া অভ্যাস আছে কিন্তু এমন সমারোহ করিয়া চা পান কখনও দেখি নাই। আমাদের স্কুলের কথা মনে পড়িয়া গেল। চতুর্থ শ্রেণীর চেয়ারের একটি পায়া ভাঙ্গা ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাহা সারান হয় নাই। শিক্ষক মহাশয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়াইতেন এবং যখন পাঠ দিতেন তখন উক্ত চেয়ারকে দেওয়ালের একপাশে আটকাইয়া এমন কায়দায় রাখিয়া বসিতেন যে দেওয়ালটি ঐ ভগ্নপায়ার কাজ করিত। স্কুল নয় ঘরের মধ্যে একাধিক চেয়ার সাজাইয়া যাহারা চা পান করিতে পারে—না জানি তাহারা দেবলোকের অধিবাসী না গন্ধর্ব্ব লোকের অধিবাসী! বিশেষ করিয়া উক্ত চেয়ারের একটিতে যখন সেই কিশোরী বসিয়া আছে তখন সুরলোক বা গন্ধর্বলোক হইলেও

হইতে পারে। মোহিত বাবু সহাস্যে বলিলেন—"কি দেরী হ'য়ে গেল উঠতে? রাত্রে বুঝি ঘুম হয় নাই, না মায়ের জন্য মন কেমন করছিল? আহা দাঁড়িয়ে রইলে যে ব'সে পড়।" এই বলিয়া মোহিত বাবু একটি শূন্য চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। গোবর্ধন একবার স্কুলের চেয়ারে বসিয়াছিল; থার্ডমাষ্টার ইহা দেখিয়া কিরূপ বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন সে কথা মনে পড়িয়া গেল। গুরুজনের সামনে চেয়ারে বসা ঠিক হইবে কিনা ভাবিবার অবকাশ পাই নাই। মণিকা বলিল "বসে পড়ুন শিগগির আপনার জন্য চা খেতে পাইনি এখনও।" মণিকার কথায় বসিয়া পড়িলাম। মণিকা সেই কিশোরী। সর্বনাশ আমার জন্য মণিকা চা পান করে নাই। দেরী করিয়া উঠিবার জন্য অপরাধী মনে হইতে লাগিল। মণিকা, মণিকার ঠাকুরমা চেয়ারে উপবিষ্টা, মণিকার মা আমাদের চা পরিবেশন করিয়া একটি চেয়ার দখল করিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। আমি মিশনারী ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের ছাড়া কোন নারীকে কখনও চেয়ারে বসিতে দেখি নাই; মিশনারীদের আচার ব্যবহারের সহিত আমাদের কোন মিল ছিল না। তাহারা খৃষ্টান, আমাদের মত তাহাদের খাদ্যখাদ্যের বিচার নাই। রেবেকা মিটার নাম্নী এক বিধবা মহিলা সেই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। পরাণদা একেবারে স্বচক্ষে তাহাকে ডিম খাইতে দেখিয়াছিল, সেইদিন পরাণদা মন্তব্য করিয়াছিল ও যখন ডিম খায় তখন নিশ্চয়ই একাদশীর দিনে ভাত খায়—ইত্যাদি, ইহারা হিন্দু ঘরের মহিলা কিন্তু আচরণে খৃষ্টানের মত। মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে বসিয়া চা পান করিবে বিশেষ করিয়া হিন্দুঘরের বধুর শ্বশুরের সহিত এক টেবিলে খাওয়া আমার ধারণার অতীত। আমি যে শুধু আশ্চর্য হইয়া গেলাম তাহা নহে আমার মনে হইল ইহাদের সহিত আমি কেমন করিয়া বাস করিব কেমন করিয়া বাকি দিন গুলি কাটাইব।

—"কই চা খাচ্ছেন না যে—অশোক জিজ্ঞাসা করিল। তাড়াতাড়ি

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গেলাম—মণিকা বলিল—"টোষ্ট খেলেন না একবারেই চায়ে চুমুক দিলেন যে বড় ?"

টোষ্ট—সে আবার কি ? মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। কোনরূপে টোষ্টের অজ্ঞতা চাপা দিবার জন্য বলিলাম—আমি সকালে কিছু খাই না।

মাণিকার ঠাকুরমা বলিলেন—"সেকি পূজা আহ্নিক কর নাকি বাবা—তা আগে বল নি কেন ঠাকুর ঘরে সব ব্যবস্থা ক'রে দিতুম। বামুনের ছেলে পূজো আহ্নিক ক'রবে বই কি। ওরা পাড়াগাঁয়ে মানুষ, ওরা ত এখন সহরের মত ম্লেচ্ছ হ'য়ে যায়নি ? যাক্ যা হয়ে গেছে গেছে—আর তবে খেতে হবে না—পরে চা ক'রে দেব। তুমি স্নান ক'রে গিয়ে পূজো সেরে তারপর চা খাবে।"

পূজা আহ্নিক আমি কোনদিন করি না। পৈতা হইবার পর এক বৎসর গায়ত্রী ইত্যাদি জপ করিয়াছি। তারপর আর কোনদিন কিছু করি নাই। কিন্তু অশোকের ঠাকুরমার কথার উত্তরে বলিতে পারিলাম না যে আমার পূজা করার অভ্যাস নাই। বাধ্য হইয়া স্নান করিয়া পূজা করিতে বসিতে হইল। পূজার আসনে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলাম। গায়ত্রী ধ্যান করিতে করিতে দেখি গায়ত্রী ও মণিকা একাকার হইয়া গিয়াছে। পূজার আসন ছাড়িয়া উঠিতেই দেখি মণিকা দুয়ারে দাঁড়াইয়া।

—"আপনার পূজা হ'ল ? চলুন, আপনার চা তৈরী হ'য়েছে।" চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিলাম।

—"আপনি টোষ্ট খান্ ত ?"

চুপ করিয়া রহিলাম।

—"বলুন না—আপনি যে বামুন মানুষ, কি খেলে জাত যাবে না যাবে আমি জানব কেমন করে ?

মণিকার মুখে চোখে দুষ্টামির হাসি। আমি টোষ্ট কি বস্তু জানি

না, তাহা আহার করিলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বজায় থাকে কি না জানি না। মণিকার কাছে স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও লজ্জা হইতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

—"টোষ্ট খেলে বামুনের জাত যায় না জানেন? ওতে ময়দা ছাড়া আর কিছু নাই। নিন, খেয়ে নিন?—" মণিকার মুখে আবার সেই দুষ্টুমিভরা হাসি।

—"মা এখন রান্নাঘরে গেছেন—আপনাকে খাওয়াবার ভার এখন আমার উপর বুঝলেন? শিগগীর খেয়ে নিন—আমাকে এখুনি প'ড়তে ব'সতে হবে—আমি আবার মাথা মোটা—আপনাদের মত একবার বসলেই পড়া হয়ে যায় না। স্কুলে বকুনি খেতে হবে।"

মণিকা পড়ে? আশ্চর্য হইয়া গেলাম। যাহার ইতিপূর্বেই শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া উচিৎ ছিল সে কি না শ্বশুরবাড়ী না যাইয়া স্কুলে যাইতেছে? কৌতূহল হইল মণিকা কোন ক্লাসে পড়ে জানিতে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হইতে লাগিল। যত কথা মণিকাই বলিতেছে আমি একটি কথাও তাহার সহিত বলিতে পারি নাই। আর নিরুত্তর থাকা সমীচীন মনে করিলাম না তাই বলিলাম—"আপনি কি বই পড়েন?"

মণিকা হাসি চাপিয়া বলিল—"ক'টি বইয়ের নাম ক'রব?"

—"আপনি কি পড়বেন ঠিক ক'রেছেন আই এস সি না আই এ?" মণিকা জিজ্ঞাসা করিল।

তবে কি মণিকা এ আই আই এস সির খবর রাখে? মণিকার বিদ্যার পরিমাপ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। কি জানি হয়ত আমার অপেক্ষা বেশীই বা পড়িয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। তাই অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত জবাব দিলাম—"এখনও কিছু ঠিক করি নাই।"

—"সে কি ক'বে আবার ঠিক ক'রবেন ? আপনি কি অঙ্কতে কাঁচা ? তাহ'লে সায়েন্স পারবেন না ?"

সায়েন্স পারিব কি না পারিব জানি না তবে ইহাদের এখানে যে একদিনও টিকিতে পারিব না তাহাই মনে হইতে লাগিল। যদিও অঙ্কে আমি দুইটী লেটার পাইয়া পাশ করিয়াছি তথাপি মনে হইল মণিকা বুঝি এখনি অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে অপদস্থ করিবে। তাই জবাব করিলাম "না অঙ্ক আমি তেমন ভাল রকম জানি না।"

আমারও অঙ্ক ভাল লাগে না। কি বিশ্রী বলুন ত এলজাব্রাটা ? মণিকা তাহলে এলজাব্রার খবর রাখে ? মণিকার বিদ্যার পরিমাপ করিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম—"এলজাব্রার কোন অঙ্ক আপনার ভাল লাগে না।"

—"সবই বিশেষ ক'রে পরশু হ'তে ইকোয়েসন ধরিয়েছে। এ আর কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।"

—"আপনি কোন ক্লাসে প'ড়ছেন ?"

—"সেকেণ্ড ক্লাসে।"

—"ইকোয়েসনও খুব সোজা।"

—"হ্যাঁ সোজা না ছাই–যা কঠিন লাগে। আমার ইস্কুল যেতে ইচ্ছে করে না। রোজ বকুনি, রোজ বকুনি।"

মণিকা স্কুলে যাইয়া ইকোয়েসন করিতে পারে না বলিয়া বকুনি খায়। মণিকার অবস্থা শুনিয়া বেদনা বোধ করিলাম। মনে হইল বলি ইকোয়েসেন এমন কি শক্ত আমি দুদিনে শিখিয়ে দেব কিন্তু লজ্জায় বলিতে পারিলাম না।

মণিকা বলিতে লাগিল—"দেখুন ইংরাজী গ্রামার আর ট্রানশ্লেসানও আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না কি করি বলুন ত ?"

মণিকার মাথায় অঙ্কও ঢোকে না আবার গ্রামার ট্রানশ্লেসন ঢোকে না শুনিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গেল। মণিকার মাথায় এই দুরূহ

বিষয় কি করিয়া ঢোকে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মণিকা যদি অঙ্ক ও গ্রামার ট্রেনপ্লেসন না করিতে পারে তবে যেন আমার জাহাজডুবি হইয়া যাইবে এইরূপ মনে হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিব আমি নিরুপায়। মণিকাকে এ বিষয়ে আমি কোন সাহায্য করিতে পারি এ কথা বলিতে পারিলাম না। একজন কিশোরীকে একজন কিশোর কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে সেদিন ইহার কোন সূত্রই বাহির করিতে পারি নাই। সেদিন মনে হইয়াছিল সায়েন্স বা আর্টস লইয়া পাশ করার কৃতিত্ব অপেক্ষা যদি মণিকার মাথায় এলজাব্রা ও নেসফিল্ড ঢুকাইতে পারি তাহা হইলেই সার্থক মনে করিব। আমার জীবনে সেদিন যেন সকল প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছিল একমাত্র প্রয়োজন মণিকাকে কি করিয়া অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করাইতে পারি। মণিকা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"আপনিও যে ছাই অঙ্কে কাঁচা বলছেন। দাদা ত সায়েন্স নিতে যাচ্ছে—অঙ্কে কিন্তু আমার মত পণ্ডিত। একটা অঙ্ক ক'রে দিতে বললে একটা খাতা নষ্ট হ'য়ে যায় তবুও অঙ্ক মেলে না। নিক্ না সায়েন্স, বুঝবে ঠেলা। ইংরাজীটা একটু জানে বলে পাশ করেছে।"

আমি বলিতে পারিলাম না অঙ্ক আমি ভাল জানি। আমি বলিতে পারিলাম না যে অঙ্ক শিখাইতে যদি তোমাকে না পারি তবে আমার রাজসাহীতে থাকার সার্থকতা কি? কোনরূপে জবাব দিলাম—"অঙ্ক চেষ্টা ক'রলে আপনিই মিলে যাবে এমন কিছু শক্ত বিষয় নয়।"

মণিকা সবিস্ময়ে বলিল—"বাবা, অঙ্ক আবার শক্ত বিষয় নয়? বলেন কি?"

—"চেষ্টা করলে শিখতে কষ্ট হবে না।"

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল—"শিখিয়ে দেবেন তা হ'লে। আপনার চা খাওয়া হ'য়ে গেছে? আমি এখন যাই।" আমিও উঠিয়া পড়িলাম। আমার ঘরে আসিয়া বসিলাম। আমার সমগ্র চিন্তা তখন

মণিকাকে কি করিয়া অঙ্ক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করাইতে সমর্থ হই। এখনি খুব সম্ভব মণিকা খাতা বই লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। তাই কল্পনার সাহায্যে মণিকাকে অঙ্ক কষাইতে লাগিলাম। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও মণিকার দেখা মিলিল না।

মণিকার উপর মনে মনে চটিয়া গেলাম। বড় লোকের মেয়েদের মেজাজের সন্ধান পাওয়া আমার মত গরীবের পক্ষে সম্ভব নহে এই মনে করিয়া সেদিন অহেতুক ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই মোহিত বাবুর বাড়ীর আপনজন হইয়া উঠিলাম। আমি যে পরের বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতে আসিয়াছি সে কথা ভুলিয়া যাইতে দেরী হইল না। ইহাদের বাড়ীর আদব কায়দার সহিত বেশ পরিচিত হইয়া উঠিলাম। অশোক আর আমি এক সঙ্গে কলেজে যাই, খেলি, গল্প করি। অশোক আমাকে ছাড়া থাকিতে পারে না আমিও অশোককে ছাড়া থাকিতে পারি না। এইরূপ উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়া গেল। মণিকার সে সলজ্জ আড়ষ্টভাব কাটিয়া গিয়াছে। অঙ্ক শিখিতে সে আসে নাই কিন্তু তাহার আগমন আর দুর্লভ ছিল না। অশোকের ঠাকুরমাকে আমি দিদিমা বলিতাম আমি যে ব্রাহ্মণ তিনি সব সময়েই আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। খাওয়া থাকা সকল ব্যাপারেই আমার জাতি সম্বন্ধে তিনি সজাগ থাকিতেন। ফলে হরিশপুরে আমি যতটা না ব্রাহ্মণ ছিলাম, যতটা না ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করিতাম রাজসাহীতে তদপেক্ষা আমাকে বেশী পালন করিতে হইত। ক্রমশঃ আমি ত্রিসন্ধ্যা জপ ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অশোক প্রভৃতি ছেলেরা যদি কোন কারণে আমার শুচিতার বিঘ্ন ঘটাইত তবে তাহারা তাহাদের ঠাকুরমার কাছে ধমক খাইত। মণিকা সাধারণতঃ বকুনি খাইত বেশী কারণ সে আমার পূজা আহ্নিকের মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া দিত

এবং ঠাকুরমার চক্ষে তাহা ত্রুটী হীন হইত না। মণিকা যেদিন বকুনি খাইত সেদিন আমি অত্যন্ত লজ্জা ও বেদনা বোধ করিতাম।

একদিন সকাল বেলায় স্নান করিয়া পদ্মা হইতে একঘটি জল লইয়া পূজার ঘরে রাখিয়াছি কি কারণে মণিকা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ঐ জলপাত্র ছুঁইয়া ফেলিল। মণিকার ঠাকুরমা নিকটেই ছিলেন তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"বলি চোখের মাথা খেয়েছিস্ কি যে পুজোর জল ছুঁয়ে দিলি।" মণিকা অপরাধের গুরুত্ব বুঝিলেও ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"ভারি ত বামুন?"

—"কি বললি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? ভারি ত বামুন! এক্ষুনি ঝাঁটা মেরে মুখ থেঁতো ক'রে দেব।"

—"কোথাকার কে এসে বামনাই ক'রবে আর আমাদের হ'য়েছে জ্বালা—এখানে থাকতে হ'লে অতসব চ'লবে না।"

—"কি বললি এখানে ওসব চলবে না? তোর ঘর পোড়ারমুখী?"

—"আমার না হোক তোমার বামুনের ঘর ত নয় যে কথায় কথায় খোঁটা সহ্য করব।" এই বলিয়া মণিকা দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মণিকা এইরূপ রূঢ় বাক্য বলিতে পারে তাহা ভাবিতেও পারি নাই। প্রথমদর্শনে যাহাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম রাজপ্রাসাদে বাস করিতে পারিব—কিন্তু সেই মণিকাই এইরূপ অশোভন ব্যবহার করিয়া আঘাত করিবে তাহা কল্পনার অতীত।

স্থির করিলাম আর একদিনও রাজসাহীতে থাকিব না। আজ মণিকা যে অশোভন ব্যবহার আমার উপর করিয়াছে তাহাতে আর একদিনও এখানে থাকা চলে না। যে মণিকাকে প্রথম দিন দেখিয়া স্থির করিয়াছিলাম রাজসাহীতে পরের গৃহে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে পারিব তাহা যে কতখানি ভুল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। যদিও এতদিন আমি মণিকার সঙ্গ কামনা করিয়া আসিয়াছি কিন্তু মণিকা কখনও আমার সহিত সেরূপ অবাধ মেলামেশা করে নাই। অঙ্কে নিতান্ত কাঁচা হইলেও মণিকা আমার সাহায্য চায় নাই। অশোকের নিকট যখন সে অঙ্ক কষিতে আসিত, অশোক যখন সেই অঙ্ক আমার সাহায্যে মিলাইয়া মণিকাকে দিত, তখন আমি ক্ষুব্ধ হইতাম কিন্তু তাহার জন্য মণিকার উপর কখনও রাগ করি নাই। একজন অনাত্মীয়া কিশোরী যে একজন অনাত্মীয় যুবকের সহিত খুব সহজভাবে মিশিতে পারিবে এইরূপ আশা আমি কোনদিন করি নাই। যদিও মণিকা দূরে দূরেই থাকিত তবুও আমি এই কিশোরীকে লইয়া আমার হৃদয়ের নিভৃত কোণে কত মনোরম আকাশকুসুম রচনা করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। অশোকের সহিত আমার সৌহার্দ হইয়াছিল আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ভালবাসা ও প্রেম জন্মিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আমার জীবনে একটি পরম লাভ হইয়াছিল। তবুও কেন জানিনা আমার মনে হইত মণিকার জন্যই আমি আশাককে ভালবাসি। শৈশবের সেইদিন যেমন মনোদির জন্য রাজসাহীতে ধূলি মাটি হইতে সমগ্র পরিবেশ মধুর মনে হইত, শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে মণিকার জন্যই রাজসাহীর আলো বাতাস সব কিছু মধুময় মনে হইত। ভরা বর্ষায় রাজসাহীর ভয়ঙ্করী পদ্মার বুকে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটিতাম এবং অশোকের অক্ষমতাকে তখন

স্বীয় কৃতিত্বে ম্লান করিয়া দিতাম তাহা কিসের জন্য? মণিকার জন্য বইত নয়? যদিও মণিকা কোন দিন আমার পদ্মার ঢেউয়ের সহিত এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম দাঁড়াইয়া দেখিত না কিন্তু অশোক যখন বাড়ীতে আসিয়া আমার এই সাঁতারের কথা বেশী করিয়া জানাইয়া তাহার মাকে ও ঠাকুরমাকে পরিচয় দিত "পাড়া গাঁয়ের ছেলেরা বড় ডান্‌পিটে হয় ঠাকুমা," মণিকা তখন দূরে আমার কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া নীরবে বিস্ফারিত নেত্রে এই ডানপিটে ছেলের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। তখন আমি পদ্মার স্রোতে জীবনবিপন্ন করিয়া যে সাঁতার কাটিতাম তাহা সার্থক মনে হইত। ছেলেবেলায় আমি সুকণ্ঠ ছিলাম—অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করিয়া পদ্মার ধারে দিনের পর দিন আমি অশোককে যে গান শুনাইতাম সে কি শুধু অশোকের জন্য? আমার গান যে অশোকের মুখ দিয়া শাখাপল্লবে বিস্তারিত হইয়া একদিন না একদিন মণিকার কাণে পৌঁছিবে এই জানিয়াই ত আমার সমগ্র সাধনাকে অশোকের নিকট প্রকাশ করিতাম। আমি পড়াশুনা সকল বিষয়েই অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছিলাম, ঐ ক্ষুদ্র বালিকার কাছে যেন আমি কোন বিষয়েই ছোট হইয়া না যাই, কিন্তু একি মণিকা সেই কল্পনাকে ধুলিসাৎ করিয়া আমাকে পথের ধারে কুটার মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবে কে জানিত? আর একদিনও রাজসাহীতে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মুস্কিল হইল কথাটা কি করিয়া পাড়ি। মোহিত বাবু ও তাহার পরিবারবর্গ সকলেই আমার সুবিধা অসুবিধা সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে আমার থাকিতে কোন অসুবিধা না হয় তাহা দেখিয়া আসিতেছেন। আমি কি করিয়া নিমকহারামের মত এই অসঙ্গত প্রস্তাব করি। বিশেষ করিয়া মণিকার ব্যবহার শুধু যে আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে তাহা নহে বাড়ী শুদ্ধ লোক তাহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া মণিকাকে অশেষবিধ ভৎর্সনা করিয়াছে এই অবস্থায় কি করিয়া আমি এই

প্রস্তাব করিব। এক মণিকার জন্যই কি আমাকে রাজসাহী ত্যাগ করিতে হইবে এই যুক্তি কি মানিয়া লওয়া যায়? উচ্চ শিক্ষা, ভবিষ্যৎ, সকল কিছুই মণিকার জন্য ত্যাগ করিব? মনে হইল আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হইলে আজই আমার চলিয়া যাওয়া উচিত। তখন মণিকার ব্যবহার যে কোন অনুগ্রহপ্রার্থীর উপর দাতার ব্যবহারের ন্যায় মনে হইল। আজ মণিকা যে ভাবে আমাকে অপমান করিল কাল যে অশোক করিবে না কে বলিতে পারে? দরিদ্রের সহিত ধনীর ব্যবহার কোথাও মনুষ্যোচিত হয় এরূপ কথা ত শুনি নাই। মণিকা আমাকে ভবিষ্যতের অনেক লাঞ্ছনা হইতে আজ রক্ষা করিয়াছে। না, রাজসাহীতে আর থাকা চলিবে না। যখনই রাজসাহী ছাড়িবার বিষয় স্থির করিয়াছি তখনই যেন কে আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল "না তোমার রাজসাহী ছাড়া চলিবে না।" অন্তরের অন্তস্থলে দৃষ্টি দিয়া দেখিলাম মণিকা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কি করিব আমাকে যাইতেই হইবে আর আমার এখানে থাকা ঠিক নয়।

রাজসাহী ত্যাগ করিব ঠিক করিলাম কিন্তু কথাটা মোহিত বাবুর নিকট পাড়িবার জন্য সারাদিন সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম—এমনি করিয়া ভারাক্রান্ত মন লইয়া দিনটা কাটিয়া গেল। রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ করিয়াছি এমন সময় দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া দেখি ছোট মামীমা দাঁড়াইয়া—আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কি মামি মা আমায় কিছু বলছেন্?" সচরাচর এইরূপ সময়ে ছোট মামিমা বাহিরের ঘরে আসেন না। ছোট মামীমা বলিলেন—"তুমি একবার উপরে চল, মণিকা আজ সারাদিন কিছুই খায় নাই।" এই বলিয়া ছোট মামিমা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন—মণিকা সারাদিন কিছু খায় নাই শুনিয়া বিস্মিত হইলেও আমি কি করিতে পারি ভাবিয়া পাইলাম না। ছোট মামীমার সহিত যাইব কি না এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছি, ছোট

মামীমা বলিলেন—"তোমাদের ছেলেমানুষী দেখে আর পারি না। মণিকা জেদ ধ'রেছে তুমি ক্ষমা না করলে সে কিছুই খাবে না। সারাদিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খাওয়াতে পারি নাই।" ছোট মামিমা আমাকে ভাবিবার অবকাশ না দিয়া চলিয়া গেলেন। কি করিব আমি মণিকার ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

উপরের একটি ছোট ঘরে মণিকা একাই থাকে। সেই ঘরে সে পড়াশুনাও করে। দেখিলাম মণিকা উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। আমি যাইয়া একটি চেয়ারে উপবেশন করিলাম, মণিকা যেমন নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়াছিল তেমনি শুইয়া রহিল। আমার প্রবেশ সে বুঝিতে পারিল কিনা জানা গেল না। আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু মণিকা ঠিক যেমন ছিল তেমনি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল—অগত্যা আমাকে বলিতে হইল—"মণিকা তুমি নাকি সারাদিন খাও নাই?" মণিকা আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। কিছুদূরে তাহার খাবার ঢাকা আছে। ছোট মামিমা নীচে দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন।

বুঝিলাম মণিকাকে খাওয়াইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। অগত্যা মণিকাকে ডাক দিলাম—খাও নি কেন মণিকা? মণিকা কোন উত্তর দিল না। বাধ্য হইয়া আবার ডাক দিলাম—"তুমি খাওনি কেন? আমি ঠিক ক'রেছি কাল এখান হ'তে চ'লে যাব। যদি তোমাদের কোন অসুবিধা ক'রে থাকি আশা করি তা ভুলে যাবে।" দোষ ক'রেছি ক্ষমা কর ইত্যাদি বলিতে যাইতেছিলাম—কিন্তু দোষ ত কিছু আমি করি নাই তাই ঐ কথা বলিয়া আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলাম। মণিকা উঠিয়া বসিল। কোন কথা বলিল না। মণিকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি উদগত অশ্রু চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইতেছে। মণিকা সুন্দরী—কিন্তু কতখানি সুন্দরী কোন দিন মাপিয়া দেখি নাই। আজ একান্তে মণিকাকে মনে হইল ইহার রূপের পরিমাপ করা যায় না। অভিমানক্ষুব্ধ মুখমণ্ডলের লাবণ্য যেন

স্বাভাবিক সৌন্দর্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। চোখের সহিত পদ্মের তুলনা কবিরা সাধারণতঃ করিয়া থাকেন মণিকার সজল নয়ন দেখিয়া সেই কবিবাক্য সত্য মনে হইল। দুই একটা চূর্ণ কুন্তল তাহার কপোল দেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কৃষ্ণ কুন্তল তাহার শুভ্র কপোলে পড়িয়া এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমি মুগ্ধ হইয়া মণিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এইরূপ কিছুক্ষণ থাকিবার পর আমার মনে হইল—না মণিকার ঘরে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা ঠিক হইবে না। তাই তাহাকে বলিলাম—"আমি চ'লেই যাচ্ছি যখন তখন তোমার খেতে আপত্তি কি থাকতে পারে?" মণিকাকে আমি অভিযুক্ত করিলাম যেন আমি না যাইলে সে আহার গ্রহণ করিবে না। আমার মনের অবস্থাও তখন সহজ ছিল না। যদিও মণিকার নিকট আসিয়া আমার সকল অভিমান সকল ক্ষোভ মুহূর্তে ঘুচিয়া গিয়াছিল—আমি মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিলাম যে মণিকা তাহার অন্যায় বুঝিতে পারিয়াই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই অনশন গ্রহণ করিয়াছে। তথাপি কেবলমাত্র নিজেকে মণিকার সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্যই যেন ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলাম-"মণিকা আমি যখন চ'লেই যাচ্ছি তখন খেতে আপত্তি কি?"

আমার রূঢ়বাক্যে মণিকা আহতকণ্ঠে জবাব দিল—"তা হ'লে আপনি আমার জন্যই চ'লে যাবেন ঠিক ক'রেছেন?—আমার অপরাধের বুঝি ক্ষমা নাই?"

—"তোমার আবার অপরাধ কোথায় মণিকা—দোষ ত আমারই—আমি যদি তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় না নিতাম তবে ত আর তোমাকে এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় প'ড়তে হ'ত না?"—মণিকাকে আঘাত দিবার জন্যই কথাগুলি বলিলাম—নতুবা অত কথা বলিবার আবশ্যক ছিল না। পুনরায় বলিলাম—"যাক্ খেয়ে নাও—আমার জন্য আর কখনও তোমায় বকুনি খেতে হবে না।"

মণিকা ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব করিল—“ভারি ত বকুনি—বকুনিকে আমি ভয় করি না।”

—“বকুনিকে তুমি যদি ভয় না কর, তবে আজ খেলে না কেন?”

—“খাই কি ক’রে? আপনাকে যে যা তা বললুম সেটা যে অন্যায় হ’য়েছে তা কি জানি না?”

—“ও তাই না খেয়ে বুঝি প্রায়শ্চিত্ত ক’রছ?”

মণিকা লজ্জিত হইয়া জবাব দিল—“তা কেন, আমার এমনি খেতে মন যাচ্ছে না।”

—“সারাদিন না খেয়ে এখনও খেতে মন যাচ্ছে না এ ত আর সত্যি কথা নয়। যাক্ খেয়ে নাও। তোমার মা আমায় ডেকে নিয়ে এলেন তোমাকে খাওয়াবার জন্য—শুধু শুধু উপবাস দিয়ে বাড়ীশুদ্ধো লোককে এমন ব্যতিব্যস্ত ক’রে তুলেছ কেন বল দেখি? যাও ছেলেমানুষি ক’র না উঠে খেয়ে নাও।”

—“আমি খাই না খাই তাতে আপনার কি?”

বুঝিলাম ইহা অভিমানের কথা। অবস্থাটা লঘু করিবার জন্য বলিলাম —“আমার আর কি? পেট জ্বলছে তোমার তবে আমার ত একটা কর্তব্য আছে—তুমি এমন কিছু অন্যায় কর নি যার জন্য এত বড় প্রায়শ্চিত্ত ক’রছ—বিশেষ ক’রে আমিই যখন তোমার উপবাসের কারণ।”

—“আমি যদি না খাই তবে কি ক’রবেন আপনি?”

—“কি আর ক’রব। মনে দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কি ক’রতে পারি?”

—“আমি আপনাকে অপমান করলুম—আর আমার জন্য আপনি দুঃখ পাবেন?”

মণিকাকে ইচ্ছা করিয়াই আঘাত দিবার জন্য বলিলাম—“তুমি অপরাধ ক’রলে কোথায় মণিকা—অপরাধ আমার—আমি গরীব লোক বলেই ত—”

—"ওসব কথা যদি বলেন তবে আমি আর একদম খাব না। মায়ের কাছে যে বাহাদুরী নেবেন—মণিকাকে কেউ খাওয়াতে পারে নাই আপনি পেরেছেন—সে কথা বলবার সুযোগ পাবেন না।"

বুঝিলাম মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। মণিকাকে আঘাত দিতে চাইলেও সে আর রাগ করিবে না। তাই হাসিয়া উত্তর করিলাম—"তবে লক্ষী মেয়েটীর মত খেয়ে নাও না। আমিও মামিমার কাছে তোমাকে খাওয়াবার জন্য মেডেলটা পেয়ে যাই।"

—"ইস্ মেডেল পাওয়া অত সোজা নয়! আগে কথা দেন আমার উপর রাগ করেন নাই?"

—"তোমার উপর রাগ করতে যাব কেন? কি এমন তুমি অন্যায় করেছ?"

—"ঐ ত বাঁকা কথা হ'ল? অন্যায় আমি ক'রেছি সে আপনিও জানেন আমিও জানি। বলুন আমাকে ক্ষমা করলেন—"এই বলিয়া মণিকা আমার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িল।

—"ছিঃ ছিঃ পায়ে ধরছ কেন মণিকা আমি কি তোমার উপর রাগ ক'রতে পারি—"

কথাটা বলিতেই নিজের কানেই যেন অশোভন শোনাইতে লাগিল। আমি যে রাজসাহী হইতে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম সেকি মণিকার উপর রাগ করিয়া? তাহার উপর রাগ করিবার কি থাকিতে পারে? অশোক যদি আমাকে মণিকার মত অপমান করিত তাহা হইলেও আমাকে রাজসাহী হইতে চলিয়া যাইতে হইত। কিন্তু মণিকার ব্যবহার শুধু যে আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে তাহা নহে কোথায় যেন আঘাত দিয়াছে। মণিকার জন্য যদি আমাকে চলিয়া যাইতে হয় তবে যেন সে বেদনা আমি সহ্য করিতে পারিব না। একটু আগেও এ কথা ভাবি নাই। মণিকার দিকে চাহিয়া মনে হইল যত প্রতিজ্ঞাই করি মণিকার জন্য রাজসাহী

ছাড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। মণিকা সারাদিন আমার জন্ত আহার গ্রহণ করে নাই। তাহার কত না কষ্ট হইয়া থাকিবে তবুও মণিকা যে আমার জন্যই আহার গ্রহণ করে নাই এই কথা ভাবিয়া মন আনন্দে ভরিয়া গেল।

মণিকাকে আমার পায়ের নীচে হইতে জোর করিয়া ধরিয়া যেখানে খাবারের থালা ঢাকা ছিল সেখানে বসাইয়া দিলাম। মণিকা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

—"তবে তুমি খাও মণিকা আমি শুইগে।—"

—"না আপনি চলে গেলেই আমি খাওয়া বন্ধ ক'রে দেব।" হাসিয়া জবাব করিলাম—"আর বাহাদুরীতে কাজ নাই—তুমি না খেলে আমার পেট কাঁদবে না, তোমারই—"

—"খুব হ'য়েছে অত কথায় কাজ নাই, আপনি বসুন ত।"

মণিকা আহার করিয়া হাত মুখ ধুইয়া একটি চেয়ার টানিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খুব আমার উপর রেগে গিয়েছিলেন কি বলুন?"

—"তোমার উপর রাগ করতে যাব কেন?"

—"আমি অমন ক'রে আপনার অসম্মান করলুম আর আপনি রাগ ক'রলেন না, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?"

—"না সত্যিই তেমন কিছু রাগ করিনি তবে দুঃখ অবশ্য হ'য়েছিল।"

—"তাই বুঝি এখান হ'তে চলে যেতে চেয়েছিলেন।"

—"হ্যাঁ আমি চলে যাব স্থির ক'রেছি।"

—"অ্যাঁ একবারে স্থির ক'রে ফেলেছেন? আগে জানলে আর খেতে বসতুম না।"—মণিকা বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইল।

—"আগে জানলে খেতে বসতে না, কেমন?"

—"আপনি রাগ ক'রতে পারেন বলেই ত আজকে খাওয়া বন্ধ ক'রতে হ'ল—না খাওয়ার যে কষ্ট সে আর আপনি জানবেন কি ক'রে?"

—"না খাওয়ার কষ্ট যে কি আমি না হয় নাই জানলুম কিন্তু তুমি অনাবশ্যক আমার জন্য কেন কষ্ট পেতে গেলে ?"

—"দেখুন মাণিকদা সত্যি কথা বলতে কি আমার না খেয়ে যতটা না কষ্ট হ'য়েছে আপনাকে অসম্মান করার জন্য আমি যে কি মনোকষ্ট পেয়েছি তা কেমন ক'রে আপনাকে জানাবো। আপনি না ক্ষমা ক'রলে সত্যিই আমি শান্তি পাচ্ছি না—বলুন আমার অপরাধ নেন নাই ?"

মণিকার অপরাধ আমি গণনার মধ্যেই আনি নাই। মণিকা আমাকে যে অসম্মান করিয়াছিল তাহাতে আমি যত দুঃখই পাইয়া থাকি মনের কোন অন্তস্তল হইতে কে যেন পূর্বেই মণিকাকে ক্ষমা করিয়া বসিয়াছিল। এই ক্ষমায় যেন আমার হাত ছিল না। তবুও আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম কারণ মণিকাকে ক্ষমা করিবার কোন বাস্তব পথ আমি খুঁজিয়া পাই নাই মণিকা যে এমন করিয়া সংকট হইতে রক্ষা করিবে তাহা আদৌ ভাবি নাই। মণিকার ব্যবহারে আমি যেমন ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম—মণিকার ব্যবহারে আবার তেমনি মুগ্ধও হইলাম। এমনি হয়, মানুষের মন জলের স্রোতের মত কোথায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন সে ভিন্ন মুখে ছুটিতে থাকে আবার বাঁধ দিলে তার পূর্বপথ ধরিয়া চলিতে থাকে।

মণিকা বলিল—"কই আমার কথায় জবাব দিলেন না যে ?"

—"এমন কি অপরাধ ক'রেছ যে তার জন্য সারাক্ষণ অনুরোধ করতে হবে ? সত্যি কথা ব'লতে কি মণিকা আমি রাগ করিনি একটুও।"

—"সে আমি জানতুম। আপনি আমার উপর রাগ ক'রতে পারেন না।" মণিকার উত্তরে কি যেন নূতন সুরের আভাষ পাইলাম। আমি যেন এই সুরের সন্ধানে এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ মণিকার কণ্ঠে সেই সুরের আভাষ পাইয়া সমগ্র অন্তর এক অপূর্ব পুলকে শিহরিয়া উঠিল। মণিকার কথার আমি কোন জবাব দিতে পারিলাম না। মণিকাও অনেকক্ষণ কোন কথা বলিল না। মনে হইল মণিকার কথায়

কোথায় যেন কিছু অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে তাই সে আবার সঙ্গতি বজায় রাখিবার জন্য সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কোথাও যেন খেই খুঁজিয়া পাইতেছে না। সামনের আমগাছে একটা পেঁচা সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কেঁচম্যাচ করিয়া উঠিল। রাত্রি যে গভীর হইয়াছে এই কথাই যেন সে জানাইতে চায়। সে যেন আমাদের সতর্ক করিয়া দিল তোমরা যে পথ ধরিয়াছ তাহা গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেখানে কোথাও আলো নাই। ঐ পথে পা বাড়াইও না পথ হারাইয়া ফেলিবে। মণিকার দিকে চাহিলাম দেখিলাম লজ্জাবনত মুখে সে বসিয়া আছে। আমার ও বসিয়া থাকিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল। তাই বলিলাম "মণিকা অনেক রাত হ'য়ে গেছে তবে উঠি।" মণিকা কোন উত্তর করিল না। উঠিয়া পড়িলাম। মনে হইল মণিকা হয়ত আর একটু বসিতে অনুরোধ করিবে—যদিও সে অনুরোধ রক্ষা করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কি আশ্চর্য মণিকা যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। পায়ের বুড়া আঙ্গুলে করিয়া নত নেত্রে কি যেন সে আঁকিতেছে। যে চিত্র তাহার মনে অঙ্কিত হইয়াছে সেই চিত্র পদনখ দিয়া আঁকিবার চেষ্টা করিতেছে। কেমন যেন একটা অজানা বেদনা লইয়া মণিকার কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলাম। মণিকার দিকে আর চাহিয়া দেখি নাই। তবুও সেদিন মনে হইয়াছিল দুইখানি ব্যাকুল নয়ন আর একটু বসিতে অনুরোধ করিতেছে।

শয্যা হইতে উঠিয়া দেখি মণিকা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া, দরজা খুলিয়া দিলাম। এমন করিয়া কখনও সকাল বেলায় মণিকাকে আমার জানলার কাছে দাঁড়াইতে দেখি নাই। দরজা খুলিয়া দিলেও তাহাকে আহ্বান করিতে পারিলাম না। মণিকা যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। মণিকা আমার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—কেমন যেন আমি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। গত রজনীর সমস্ত

কথা মনে পড়িয়া গেল। সকালে না হোক অন্য সময় মণিকার সহিত জানালার ধারে কত কথাই বলিয়াছি কই তখন ত এরূপ অস্বস্তি বোধ হয় নাই। মণিকার দিকে চাহিতেও যেন সাহস হইতেছে না। এক-টুক্‌রা কাল মেঘ পূর্ব আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল প্রভাত-সূর্যের রাঙ্গা আলোকে কাল মেঘটা রাঙ্গা হইয়া গেল।

মণিকা তখন জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মনের মধ্যে যেটুকু কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়াছিল মণিকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

—"আপনার উঠতে আজ দেরী হ'য়ে গেল। ঠাকুমা আপনাকে ডাকতে বললেন। তাঁর ধারণা আপনি আজ রাগ ক'রে হয়ত পূজো ক'রতে ঠাকুর ঘরে যাবেন না। তাই আমাকে বললেন "যাও যেমন কর্ম এখন তোমাকেই যেয়ে ডেকে আনতে হবে" তাই ডাকতে এলুম আপনাকে। চলুন অনেক বেলা হ'য়ে গেছে পূজো ক'রে চা খেয়ে পড়তে ব'সতে অনেক বেলা হ'য়ে যাবে। আপনি আবার ভাল ছেলে, পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হ'লে আমার দোষ দেবেন তখন।"

মণিকা সাধারণতঃ এই ধরণের কথা বলে না। তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল—আরও কথা শুনিবার জন্য ইচ্ছা হইল। তাই বলিলাম—"আমার আজ শরীর খারাপ এখন পূজোটুজো ক'রতে পারব না।"

"সে কি—আপনার দুটী পায়ে পড়ি আগে পূজোটা সেরে এসে অসুখ বিসুখ বা হ'য়েছে বলবেন। নইলে ঠাকুমা আমায় বকে মাথা নেবে।" —তাহার চোখে মিনতি।

—"অসুখ ক'রলে পূজো করা নিষেধ তা জান?"

—"অত সব জানি না,—নেন উঠুন। আবার আমাকে বকুনি খাওয়াবেন না আমার রাগ জানেন ত এরপর আর একদম খাওয়াতে

পারবেন না। চলুন যা হোক নমঃ নমঃ ক'রে সেরে দেবেন চলুন। নয়ত চা খেতে পাবেন না যে ?"

—"অসুখ ক'রেছে কিছুই খাব না। তুমি যাও।—"

মণিকা নিজের ঠোঁটের উপর অঙ্গুলি চাপাইয়া বলিল—"ব্যস আর কথা নয়। যান উঠে পূজো সেরে নিন আমি সব জোগাড় ক'রে রেখেছি —শিগ্ গির উঠে পড়ুন। আমি চল্লুম—আমার হুকুম তামিল্ না ক'রলে তখন বুঝতে পারবেন ?" মণিকা চলিয়া গেল। মণিকার হুকুম তামিল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

১৭

বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী গেলাম না। কতকটা দীর্ঘপথ এবং অনাবশ্যক খরচ বলিয়া, খানিকটা মণিকার জন্য। অশোক আসিয়া সংবাদ দিল জ্যাঠামহাশয় বড়দিনের ছুটিতে আসছেন। অশোকের জ্যাঠামহাশয়কে কখনও দেখি নাই। তিনি পশ্চিমের কোন সহরে ডিপুটি গিরি করেন। বাড়ীর সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল ঘর দোর প্রভৃতি পরিষ্কার চলিতে লাগিল। অশোকের বিছানা আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি ঘর প্রায় সকল সময় তালাবদ্ধ থাকিত; সেটি অশোকের জ্যাঠামহাশয়ের জিনিষপত্রে ভরা। সে ঘরটি পরিষ্কার করিয়া ঝাড়া মোছা চলিতে লাগিল। মণিকা খুবই কাজে ব্যস্ত। জ্যাঠামহাশয়ের কন্যা অর্পণা মণিকার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও মণিকার বন্ধুর মত। তাই মণিকা খুবই খুশী, অশোকের মনেই কেবল উৎসাহ নাই। কাল সকালের ষ্টীমারে অশোকের জ্যাঠামহাশয় আসিবেন। কে কে ষ্টীমার ঘাটে যাইবে, কি সব বাজার করিতে হইবে এই সব জল্পনা কল্পনা করিতে রাত্রি হইয়া গেল। অশোক আজ আমার ঘরেই শুইতে আসিল।

আমি তখন শয্যা গ্রহণ করিয়াছি। অশোক বলিল—"মাণিক ঘুমুলি নাকি ?"

—"না, জেগেই আছি।"

—"এ আবার এক ঝামেলা কদিন যাবে—বুঝলি মাণিক। তার চেয়ে তোদের দেশে বেড়িয়ে এলে হ'ত।" কিরূপ ঝামেলা জুটিতে পারে কল্পনা করিতে পারিলাম না। তাই চুপ করিয়া রহিলাম। অশোক বলিয়া যাইতে লাগিল—"মেয়ে ত আর কারো পাশ করে না। আসছেন এখন আমাকে নিয়ে যত মাড়ুনি হবে।" জানিতাম অপর্ণা আমাদের সহিত পাশ করিয়াছে এবং ভাল করিয়া প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে বলিয়া মধ্যে মধ্যে অশোককে বাড়ীর লোক খোঁটা দিত। কারণ অশোক দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে। অশোকের অসুবিধা কোথায় বুঝিতে পারিলাম। অপর্ণার সহিত আমার কোন প্রতিযোগিতা নাই। সেইজন্য অপর্ণা ঠিক কেমন ধরণের মেয়ে সেই কথা চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

সকালে উঠিয়া দেখিলাম ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া মণিকা অশোক অশোকের ছোট ভাই মণ্টু ও মোহিত বাবু ষ্টীমার ঘাটের দিকে রওনা হইলেন। মণিকার ছোট বোন কণিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল সেও ষ্টীমার ঘাটে যাইবে। মণ্টু যদি যাইতে পারে তবে সেই বা যাইতে পারিবে না কেন ইহাই তাহার ক্রন্দনের সহিত বক্তব্য বিষয়। তাহারা কণিকার ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া ঘোড়ার গাড়ী চালাইয়া দিল।

ছোট মামিমা আসিয়া বলিলেন—"এই কাঁদছিস্ কেন মুখপুড়ি, এই যে তোর মাণিক দা যে গেল না।" কণিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল—"মাণিকদা যে 'পর' তাইত গেল না। জ্যাঠামণি ত মাণিকদার জ্যাঠামণি হয় না—"

—"নে নে খুব হ'য়েছে—মেয়ের এদিকে নাই ওদিকে আছে, কে পর

কে আপন এরই মধ্যে তত্ত্ব রাখতে আরম্ভ ক'রেছে পাকা মেয়ে কোথাকার ?" পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"যাও বাবা মাণিক পূজো সেরে নিয়ে চা খেয়ে নাওগে—এ কদিন বাবা তোমার অসুবিধা হবে। কিছু মনে কোরো না যেন।" এই বলিয়া কণিকার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। এই কয়দিন আমার কি অসুবিধা হইতে পারে বুঝিতে পারিলাম না। কণিকার কথা তখনও কাণে বাজিতে লাগিল— "ও যে পর ও যাবে কেন ? ওর ত জ্যাঠামণি হয় না।"

ঘণ্টা দুই পরে অশোকের জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা ও অপর্ণা আসিয়া পড়িলেন। ডিপুটি বাবু কোটপ্যাণ্ট পরিয়া একেবারে হাকিমি পোষাকে গাড়ী হইতে নামিলেন। অশোকের জ্যাঠাইমা সাধারণ বাঙ্গালী গৃহিণীর পোষাকে থাকিলেও চোখের চশমা এবং স্থূল গাত্রে অলঙ্কারের আতিশয্য ডিপুটি বাবুর মর্যাদার উপযুক্ত অভিজাত্য বজায় রাখিবার মত কায়দা কানুনে যেন একটু অন্য ধরনের বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অর্পণা মণিকার গলা ধরিয়া নামিল, অর্পণা মণিকার মতই সুন্দরী সাজ পোষাকে কিছু জৌলুশ থাকিলেও চোখের চশমায় ডিপুটির কন্যার মতই মনে হইতে লাগিল। ডিপুটি বাবুর আর দুই ছেলে আসে নাই একজন বি এ টেষ্ট দিবে বলিয়া রহিয়া গিয়াছে, অপরজন মামার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে। আমি দূরে দাঁড়াইয়াছিলাম। মনে হইল ডিপুটি বাবু আমাকে দেখিয়া তাঁহার পিতাকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মণিকার দিকে চাহিয়া দেখিলাম অপর্ণার সহিত কথা বলিতেই সে ব্যস্ত। আমার যেন কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। বড় দিনে বাড়ী না যাইয়া কি ভুলই করিয়াছি এইরূপ মনে হইতে লাগিল। অশোক গাড়ী হইতে নামিয়া সোজা আমার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল—"এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ ঘরে চল যত সব ঝামেলা।" যত সব ঝামেলা এ কথা বুঝিতে অসুবিধা হইল না, কিন্তু আমার তাহাতে কি ? অপর্ণার দিকে কটাক্ষে চাহিলাম।

দেখিলাম মণিকা ও অপর্ণা কথা বলিতে বলিতে আমাদের নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছে। অপর্ণা আমার দিকে কৌতুহলপূর্ণ নয়নে চাহিল। আমি লজ্জায় মুখ ফিরাইলাম। অপর্ণা বলিল—"একে ত কখনও দেখি নাই এ কে রে মণি—?" মণিকা আমার দিকে না চাহিয়াই উত্তর দিল—"ও—ও—কেউ নয়। আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়ে। গরীবের ছেলে কি না তাই দাদু ওকে আমাদের বাড়ীতে রেখেছেন।"

"ও কেউ নয় আমাদের ঘরে থেকে পড়ে দাদু রেখেছে গরীবের ছেলে—" মণিকার মুখে এইকথা শুনিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া অপর্ণার নিকট যখন আমার এই পরিচয় দিল। আমি নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া মণিকার অভদ্র পরিচয়ের কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমি গরীব এ কথা ঠিক। আমি ইহাদের কেহ নহি এ কথাও সত্য। ইহার মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই। তবে মণিকার কথা আমার মনে এমন আঘাত করিল কেন? সত্যই ত ইহারা আমার কেহ নহে আমিও ইহাদের কেহ নহি। অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া আমি ইহাদের দ্বারস্থ হইয়াছি ইহারা আশ্রয় দিয়াছে এই যথেষ্ট। ইহার বেশী আর কিছু আশা করাই বাতুলতা। ঠিক করিলাম মণিকার নিকট বা উহাদের বাড়ির কাহারও নিকট কোনরূপ আত্মীয়তার আশা করিব না। গরীবের ছেলে গরীবের মত থাকিয়া পড়াশুনা করিয়া রাজসাহী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

মণিকার সহিত এই কয়দিন আর কথাবার্তা হয় নাই। সে অপর্ণাকে লইয়া ব্যস্ত। অশোককে দিবারাত্র তাহার জ্যাঠামহাশয়ের নানা কাজের ফরমাসে ব্যস্ত থাকিতে হয়। বাড়ী শুদ্ধ লোক ডিপুটি বাবু এবং তাহার পরিবারবর্গের জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত। মোহিত বাবু পর্যন্ত তাহার ডিপুটি পুত্রের তত্বাবধানে নিযুক্ত। তিনটী মানুষের জন্য বাড়ীতে তিনগুণ

কাজ বাড়িয়াছে। ঐ তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কোন লোকের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হইল না। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর অঙ্কের খাতা লইয়া একটা দুরূহ অঙ্ক লইয়া বসিয়াছি। এমন সময় মণিকা ও অপর্ণা আমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অঙ্কে অধিকতর মনঃসংযোগ করিলাম। যেন জানিতে পারি নাই যে অপর কেহ আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

মণিকা বলিল—"ইস—এবারেও স্কলারসিপ আপনার কেউ আটকাতে পারবে না, ভাত খেয়ে উঠতে না উঠতে অঙ্কের খাতা নিয়ে বসা হ'য়েছে।"

অপর্ণা বলিল—"আপনি বুঝি ম্যাট্রিকে স্কলারসিপ পেয়েছেন?" ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলাম—"হ্যাঁ।"

—"কত টাকা?"

—"পনের টাকা।"

অপর্ণা যেন আশ্চর্য হইয়া গেল মনে হইল। গরীবের ছেলে আমি, অন্য কোন আভিজাত্যে ইহাদের সমকক্ষ নহি, তাই মনে মনে একটু অহংকার হইল। তোমরা বড়লোক হইলেও অন্ততঃ একটি বিষয়ে ত আমার চেয়ে ছোট।

মণিকা বলিল—"পাবে না স্কলারসিপ? বইয়ের পোকা ওরকম পড়লে আমরাও পেতুম!

অপর্ণাকে একটি চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিলাম। মণিকা বলিল —"না আমাদের বসবার সময় নাই। আমরা কাল পিক্‌নিক্ ক'রব পদ্মার ধারে আপনাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। দিন চাঁদা।" পিক্‌নিকে যোগ দিব কিনা তাহা ঠিক না করিলেও বাক্‌স হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিলাম।

মণিকা বলিল—"পাঁচ টাকা লাগ্‌বে না দুই টাকা ক'রে চাঁদা ধ'রেছি।"

"—তা হোক পাঁচ টাকাই নিয়ে যাও আমি দিচ্ছি।"

অপর্ণা ও মণিকা বাহির হইয়া গেল—অপর্ণা বলিল—"পাঁচ টাকা নিলি কেন মণি? গরীবের ছেলে তিন টাকা ফেরৎ দিস্।"

—"বড়মানুষি ক'রে পাঁচ টাকা দিলে, আমার ফেরত দিতে বয়ে গেছে।"—অপর্ণার জবাবে মণিকা এই কথা বলিল। দূরে হইলেও অপর্ণার ও মণিকার কথাগুলি শুনিতে পাইলাম অপর্ণা বলিতেছে "তা মাসে মাসে পনের টাকা ত বৃত্তি পাচ্ছেন, না হয় তার থেকে আমাদের পিক্‌নিকে দিলেন—তাতে তোর অত সব কথা বলার কি আছে।"

—"তুমি দেখলে না অপুদি চাইলুম দু টাকা ফেলে দিলেন পাঁচ টাকা—আমি ভাই অতশত বুঝি না সত্যই ত ও গরীব পাঁচ টাকা দেওয়ার কি দরকার ছিল ওর। ঐ টাকা ওর কাজ লাগতে পারত।"

অপর্ণা উত্তর করিল—"কাজে লাগবে ব'লেই ত দিয়েছে রে। ও ভেবেছে—পাঁচ টাকা দিলে তুই খুশী হবি—তা কোথা তুই চ'টে লাল—বেচারা জানতে পারল না যে, যে পাঁচ টাকা সে দিয়েছে তা কতখানি অপাত্রে প'ড়েছে।"

মণিকা অসহিষ্ণু কণ্ঠে উত্তর করিল—"তুমি জান না অপুদি ওর নিজের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা—গরীব মানুষ ব'লে যে গরীবের মত চ'লবে সেরকম লোকই নয় ও।"

—"কি বড়মানুষী দেখলি ওর মধ্যে—"

—"সকল বিষয়েই আমার সঙ্গে টেক্কা দেওয়া চাই"—কথাটা বলিয়াই কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"না ঠিক আমার সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার কথা বলছি না এই আমাদের সঙ্গে আর কি? সব বিষয়েই আমাদের ওকে খোসামোদ ক'রে চ'লতে হয়।"

মণিকা ও অপর্ণা চলিয়া গেল। পাঁচটা টাকা চাঁদা দিয়া আমি যে আজ নিজেকে অসম্মানের মধ্যে টানিয়া আনিলাম কি করিয়া সেই অসম্মান

হইতে কি ভাবে মুক্তি পাইতে পারি তাহার পথ খুঁজিতে লাগিলাম। মণিকাকে আজও বুঝিতে পারিলাম না। কথায় কথায় আমাকে অসম্মান করিতেও তাহার বাধে না এবং কথায় কথায় আমার কাছে ক্ষমা চাহিতেও দেরী হয় না। না, মণিকা সম্বন্ধে আমাকে অধিকতর সতর্কতার সহিত চলিতে হইবে। ক্ষুদ্র একটি বালিকা যে এমন করিয়া আমাকে লইয়া খেলা করিবে ভবিষ্যতে তাহা যাহাতে আর না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১৮

পদ্মার ধারে কয়েকটা গাব গাছ খানিকটা স্থানকে বেশ ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। গাব গাছের নীচে আসস্তাওড়ার গাছে পদ্মার তীর পর্যন্ত সমস্ত স্থানটা সবুজ হইয়া আছে। ঐ স্থানের আসস্তাওড়া গাছগুলি কাটিয়া গাব গাছের নীচে পিক্‌নিকের স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে। অশোক, মণিকা অপর্ণা সকলেই রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। দূরের একটি গাব গাছের নীচে বসিয়া আমি তাহাদের কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমাকে কেহ কোন কাজ করিতে আহ্বান করে নাই অথচ এই পিক্‌নিকের মধ্যে প্রথম হইতেই আমাকে টানিয়া আনা হইয়াছে। আমি যে ইহাদের কেহ নহি কোন বিষয়ে ইহাদের সহিত মিলিয়া চলিতে পারি না সেদিন মর্মে মর্মে তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমি যেন নিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র। ইহারা যখন ডাকিবে তখন আহার শেষ করিয়া চলিয়া যাইব। আমি যেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি উৎসবে আমার কোন স্থান নাই। অশোক হঠাৎ বলিয়া বসিল—"মাণিক তুই যখন কিছুই ক'রছিস্ না তখন একটা গান ধর না তা হ'লে পিক্‌নিক্‌টা খুবই জমে উঠবে।" অশোকের কথায় উত্তর দিলাম

না, গান করিবার মত মানসিক অবস্থা বা পরিবেশ কিছুই ছিল না। সাধারণতঃ আমি একাই গান করি বড় জোর অশোকের কাছে। মণিকার নিকট কখনও গান করি নাই বিশেষ করিয়া অপর্ণা রহিয়াছে গান করিবার মত সাহসও আমার নাই। তাই চুপ করিয়া রহিলাম।

অপর্ণা কাছে আসিয়া বলিল—"সত্যই ত আপনি একা একা চুপচাপ ব'সে আছেন। আপনি ত খুব চালাক লোক! বেশ, কাজ না করুন একটা গান ত শোনান?"

—"আমি ভাল গান জানি না।"

—"ও গান জানেন তবে ভাল জানেন না এই ত? আমরাও কেউ কালোয়াৎ গাইয়ে নই যে আপনার ভুল ধ'রব।"—অপর্ণা উত্তর করিল। গান গাহিতে ইচ্ছা থাকিলেও কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। অপর্ণা অশোকের বারংবার অনুরোধেও গান গাহিতে পারিলাম না।

হঠাৎ মণিকা উষ্মাভরে বলিয়া উঠিল—"ওকে জান না দিদি শিবের মাথায় ফুল চড়ালে ফুল পড়া সহজ তবু ওকে গান গাওয়ান সহজ নয়।" আমি মণিকার কথা শুনিতে পাই নাই এরূপ ভাণ করিয়া জবাব দিলাম—"আমার গান কি আপনাদের ভাল লাগবে?"

—"আগে শোনান ত তারপর ভাল লাগবে কি মন্দ লাগবে ব'লতে পারব"—অপর্ণা উত্তর করিল।

গান ধরিলাম—মণিকার কথা মিথ্যা করিবার জন্য গান ধরিলাম নতুবা গান গাহিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না।

কি তুমি চেয়েছ প্রিয়, তুমিই জান না আজ
(তাই) না পাওয়ার দুখ নাই, চাওয়ার নাহিক লাজ।
কি তুমি চাহিয়াছিলে,
কি ধন আজিকে পেলে,
কিবা দাম দিলে হায়—হিসাবেতে নাহি কাজ।

আপন ভাবনি যারে—
হারায়েছ বারে বারে—
হারান রতন লাগি অশ্রু কি ঝরে আজ।

অন্তরে যতখানি আবেগ থাকিতে পারে ততখানি আবেগ দিয়া প্রাণ ভরিয়া গান করিলাম। অপর্ণা মুগ্ধ বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া আছে। মণিকার দিকে চাহিলাম। সে যেন আমার গান শোনে নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া নিজেকে কাজে লিপ্ত রাখিয়াছে। অশোক হাততালি দিয়া বরাবর আমার গানে তাল রাখিয়াছে। গান শেষ হওয়া মাত্র আর একটা হোক এই বলিয়া অশোক আর একটি গান করিতে অনুরোধ করিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অপর্ণা বলিল—"চমৎকার এই গানটা কোথায় শিখেছেন। আমায় লিখে দিবেন?

—"সুরটা কোথাও শিখে থাকব, তবে গানটা কোথাও শিখি নাই।"

—"এ গান কোথায় পেলেন?

—"এ গান আমার নিজের তৈরী"

—"আপনি গান নিজে রচনা ক'রেছেন? তাহ'লে কবিতা লিখতে পারেন বলুন!"—অপর্ণা বিস্মিতনেত্রে চাহিল।

গান রচনা করিতে পারি, কবিতা রচনা করিতে পারি একথা বলিবার আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমার মন কেমন যেন আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। মণিকা সকল বিষয়ে অপর্ণার কাছে আমাকে ছোট করিয়া দেখাইয়াছে। আমি অপর্ণার চেয়ে অনেক বড়—এক অর্থ ছাড়া, সব বিষয়েই আমি তাহার নাগালের বাহিরে এই কথাই প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম।

—"আর একটি আপনার রচিত গান শোনান না? বড় চমৎকার আপনার রচনা।"—অপর্ণা অনুরোধ করিল। আমি গান ধরিলাম।

তুমি যে করিবে ভুল—সে কথা তো ছিল জানা;

ধরা দেছ তুমি ভুলে—তাইতো করিনা মানা।
যবে তুমি পথ ভুলে
এলে মোর নদী কুলে,
আঁখি'পরে রাখি আঁখি, মনে হল চির-চেনা।
তোমার আমার মাঝে
ভুল দিয়ে গাঁথা আছে
সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেলে, জানি তুমি রহিবে না॥

সেদিন আমার যত কিছু সাধনা নিঃশেষ করিয়া অপর্ণার কাছে নিবেদন করিয়াছিলাম। আমি কোন বিষয়েই যে তাহাদের অপেক্ষা ছোট নহি শুধু যে এ কথা বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম তাহা নহে আমার সাধনা যাহার নিকট প্রকাশ করিলাম যেন যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি আজ যেন সে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

মণিকা উচ্চকণ্ঠে বলিল—"কি আজ গান শোনাই হবে না রান্না বান্না ক'রতে হবে? যদি রাঁধতে মন না যায় স্রেফ ব'লে দিলেই হয়, আমি একা যা পারি তাই রাঁধব। গান ত আর কখনও শোন নাই তাই কাজ বন্ধ ক'রে গান শুনতে হবে।"

অপর্ণা ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—ছিঃ মণি কখন কি বলিতে হয় তা জান না। লোকে শুনলে বলবে কি?"

—"ছাই বলবে—আমার বাবু সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না। গান ত আর কেউ গায় না।"

মণিকা রাগিয়া গেলে যা খুসী তাই বলিতে পারে জানিতাম কিন্তু এখানে রাগের কিছু কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। মণিকা কি যেমন করিয়া হোক আমাকে অপদস্থ করিতে চায়? আমি কি এমন অপরাধ করিয়াছি তাহার কাছে? মণিকা আমাকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া চলিবে আর আমি তাহা চুপ করিয়া সহ্য করিব? মণিকাদের গৃহে আমি

সাহায্যপ্রার্থী বলিয়াই কি মণিকা এতখানি সাহস পায়? অনেক অপমান সহ্য করিয়া আসিয়াছি আজ যেমন করিয়া হোক মণিকাকে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে মণিকাদের গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে হয় সেও ভাল।

রান্না শেষ হইয়া গিয়াছে। এই পিক্‌নিক্ অশোকদের বাড়ীর সকলকে লইয়া! অশোক বাড়ীতে সকলকে খাইবার জন্য ডাকিতে গেল। অপর্ণা আমাকে বলিল—"যান স্নান ক'রে আসুন রান্না হ'য়ে গেছে।" মণিকা অদূরে দাঁড়াইয়াছিল তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"আমি ত খাব না।"

অপর্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"সে কি আপনি খাবেন না? কেন?"

মণিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলাম—"ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

মণিকা উচ্চকণ্ঠে জবাব দিল—"আপনি কেন খাবেন না তা আমি জানব কি ক'রে। আপনার মনের খবর আমার জানার কথা নয়।"

অপর্ণা বলিল—"আপনি খাবেন না কেন? আমরা কি কোন অপরাধ ক'রেছি?"

অপর্ণার কথার উত্তর দিলাম না। আমি যে খাইব না এমনটা কিছু পূর্বেও ভাবি নাই। মণিকাকে আঘাত দিবার জন্য এবং আমি যে অনেক বিষয়ে মণিকাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই কথাই আজ তাহাদের জানাইতে চাই।

মণিকা কাছে আসিয়া খানিকটা ঝাঁঝাল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি খাবেন না কেন শুনি? এখন না খেলে অপুদি কি মনে ক'রবে বলুন ত?"

—"অপুদি তোমার কি মনে ক'রবে তা কেমন ক'রে জানব মণিকা? বামুনে যখন রাঁধে নাই তখন যে আমি খাব না সেত' তুমি আগে থেকেই

জান তবে মিথ্যে আমাকে কেন খেতে অনুরোধ ক'রছ ?"—দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলাম।

সেদিন মণিকাকে আঘাত দিবার জন্য পিকনিকে ব্রাহ্মণে রান্না করে নাই এই অজুহাতে খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা যে কত অশোভন হইয়াছিল বুঝিতে দেরী হয় নাই। মণিকাদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণে রাঁধে সেইজন্য আমার যুক্তি হয়ত খুব অশোভন ছিল না। কিন্তু আমি যে এতখানি ব্রাহ্মণত্ব দেখাইব সে কথা সেদিন কেহ ভাবে নাই' মণিকার নিকট বড় হইতে যাইয়া সেদিন আমি ছোটই হইয়াছিলাম। মণিকার উপর রাগ করিবার আমার কারণ কিছুই ছিল না। যদিই থাকে তাহার উপর রাগ করিবার কি এমন অধিকারই বা আমার আছে? তাই সেদিনের ব্যবহারে আমার নিজের মনেই কোন সমর্থন খুঁজিয়া পাই নাই—অপরে আমাকে কিরূপে সমর্থন করিবে? অশোক সেদিন আমার ব্যবহারে অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং কিছুদিন সে আমার সহিত বেশ গম্ভীর ভাবেই মেলামেশা করিয়াছিল। আমি আমার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াই সেদিন আর কাহারও উপর কোন অভিযোগ করি নাই। বরং আমার বিরুদ্ধে তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহাতে আমি কোন আঘাতই পাই নাই। মণিকার সহিত ভবিষ্যতে সাবধানে চলিতে হইবে এ কথা সেদিন সিদ্ধান্ত করিলাম। মণিকার প্রতি আমার যে দুর্ব্বলতার চোরাবালি সৃষ্টি হইয়াছে এখন হইতে সাবধান না হইলে স্বল্পমাত্র পদক্ষেপে আমি যে বালু গর্ভে ডুবিয়া যাইতে পারি তাহা বুঝিতে পারিলাম। মণিকা আমার কেউ নয়। তাহার সহিত আমার কোন আত্মীয়তা থাকিতে পারে না সেই কথা সেদিন যখন প্রথম উপলব্ধি করি তখন মনের মধ্যে যে আঘাত ও বেদনা পাইয়াছি তাহা অন্তরের মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে। ঠিক করিলাম অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি, অধ্যয়নই আমার তপস্যা। আমি

আর কোন কিছুতে আমার মনকে ভাসিয়া যাইতে দিব না। যত সহজে আজ এই কথা বলিতেছি সেদিন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যে কত কঠিন ছিল তাহা আর বলিবার নয়। সেদিন অল্পে অল্পে মনের মধ্যে যে আকাশ কুসুম গড়িয়া তুলিয়াছিলাম তাহার একটি একটি পাপড়ি বহু দুঃখে খসিয়া পড়িয়াছিল।

অশোকের জ্যাঠাইমা আমাকে একটি শিল কিনিয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পশ্চিমে তিনি যেখানে থাকেন সেখানে ভাল 'শিল' পাওয়া যায় না। যে শিল আছে তাহাতে নাকি ভাল মশলা পেশা যায় না। আমি শিল কিনিয়া আনিয়া দিলাম। অশোকের জ্যাঠাইমার সে শিল বেশ পছন্দ হইল না। তিনি বলিলেন—"আমাদের এই বাসায় যেমন শিল আছে ঠিক তেমনটি আনতে পার নাই"—ক্রমশঃ তিনি তাহার মতামত এমন ভাবে ব্যক্ত করিলেন এবং এক শিল সমন্ধে এত প্রকারের মন্তব্য করিলেন যে আমি ইতিপূর্বে এমন কথা কখনও শুনি নাই। "এই রকম শিলই হবে জানলে কি আনতে দিতুম—সেখানে ত গণ্ডায় গণ্ডায় এই রকম শিল পাওয়া যায়। তা ছাড়া এত দামই যদি লাগবে জানতুম তা হ'লে এত দূর ব'য়ে নিয়ে যেয়ে কি লাভ? মাইল টাক্ দূর হ'তে একটা সামান্য জিনিষ আনার জন্য আবার কুলি খরচ কেন? অতবড় জোয়ান ছেলে সামান্য একটা ছোট শিল আর হাতে ঝুলিয়ে আনতে পার নাই—" এ ছাড়া আকারে ইঙ্গিতে এমন বলিলেন যেন শিল হইতে আমি দুই চারি আনা লাভ করিয়া থাকিব। অশোকের ডিপুটি জ্যাঠামহাশয় কাছেই বসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন—"দেখ সামান্য শিলের জন্য খচ্-খচানি ভাল লাগে না, যদি পছন্দ না হয় তবে এখানে ফেলে রেখে যাবে। তোমাকে ত বার বার ব'লেছি অনেষ্ট (সৎ) লোক কোথাও মেলে না। যা এনেছে তাতেই সন্তুষ্ট হ'তে হবে সামান্য জিনিষ নিয়ে—"

আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। অশ্রু লুকাইবার জন্য গৃহ হইতে

বাহিরে আসিলাম। অর্পণা গৃহ মধ্যেই ছিল সেও আমার সহিত বাহির আসিয়া অত্যন্ত আহত স্বরে বলিল—"মাণিক বাবু কিছু মনে ক'রবেন না। মা বাবা আমার অমনিই তা ছাড়া আমরা ত পরশু চ'লে যাচ্ছি তখন আপনার কোন অসুবিধা হবে না।" অপর্ণার দিকে চাহিলাম। সে তাহার বাবা মায়ের ব্যবহারে লজ্জা পাইয়াছে তাই সে আমার নিকটে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছে। মরুভূমির মাঝে মরু-উদ্যান থাকে বলিয়াই জীব মরুভূমির পথে যাত্রা করিতে পারে। অপর্ণার বাবা মায়ের ব্যবহার সেদিন অপর্ণার কথায় ভুলিয়াছিলাম। অপর্ণা সেদিন বলিয়াছিল—"আপনি ত ভাল ছেলে আপনিও একদিন হয়ত বাবার মত ডিপুটি হ'য়ে যেতে পারেন ওরা আপনাকে ছোট ক'রে দেখলেও আপনি ত আর ছোট হ'য়ে যাচ্ছেন না ?"

অপর্ণা চলিয়া গেল। সেদিন দেখা করিতে আসিয়া বলিয়াছিল—"আমি চললুম মাণিক বাবু আবার দেখা হবে কত দিন পরে কে জানে? আবার দেখা হ'লে আপনার গান শুনব। খুব পড়াশুনা ক'রবেন, আবার বৃত্তি পাওয়া চাই।"

অপর্ণাকে বিদায় দিতে আমার চক্ষুর পাতা ভিজিয়া গিয়াছিল। গান আমি কখনও শিখি নাই এমনি শুনিয়া শুনিয়া গানের একটা সহজ সুর-বোধ হইয়াছিল। অপর্ণার কথায় গান শিখিবার প্রেরণা বোধ করিলাম। অপর্ণা কবে ফিরিবে তাহার পূর্বে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া অপর্ণাকে গান শুনাইতে হইবে।

প্রেমই মানুষকে বড় করিতে পারে। অপর্ণাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম কিনা জানি না কিন্তু অপর্ণা যখন আমার গান শুনিবে বলিয়া আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিল তখন সাময়িকভাবে কি মহৎ প্রেমের বিন্দুমাত্র আমাদের মধ্যে বিকশিত হয় নাই ? কবে অপর্ণা ফিরিয়া আসিয়া আমার গান শুনিবে তাহার জন্য আমি যে সাধনা সেদিন করিয়াছিলাম

তাহা কি নিছক এমনিই করিয়াছিলাম? আমাদের বাসা হইতে দেড় মাইল দূরে এক স্যাকরার বাড়ীতে গানের আড্ডা বসিত সেখানে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত চর্চা হইত। দিনের পর দিন অতি গোপনে সেই স্থানে যাইয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছি। অপর্ণা চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু যখন তাম্বুরা লইয়া কোন গানে রেওয়াজ দিতাম তখন মনে হইত অপর্ণা আমার কাছে বসিয়া সঙ্গীত শুনিতেছে কোথাও যদি বেসুর বা ছন্দপতন হয় তবে অপর্ণাকে মুগ্ধ করিতে পারিব না। মহৎ প্রেমের প্রেরণা ছিল বলিয়াই অল্পদিনে আমি একজন কৃতী ছাত্র বলিয়া সেই সঙ্গীত-আসরে নাম করিতে পারিয়াছিলাম। সেদিন যে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবার আগ্রহ আমার মনকে পাইয়া বসিয়াছিল, যে উচ্চ ভূমিতে আমি বিচরণ করিতেছিলাম কেবল মণিকা অপর্ণার কাছে যাহাতে ছোট না হই সেই জন্যই ত।

বৃত্তি লইয়া আই, এস, সি পাশ করিলাম। অপর্ণা তাহার পর আর আসে নাই। অপর্ণাকে পত্রে জানাইলাম। "আপনার শুভেচ্ছার ফলে আমি বৃত্তি পাইয়াছি, কেমিষ্ট্রীতে অনার্স লইয়া বি, এস, সি, তে ভর্তি হইয়াছি।" অপর্ণার উত্তর আসিল।

"আপনার কথা ভুলেই গিয়াছিলাম। আমার মাথা এত মোটা যে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তবে কোনরূপে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করেছি। পাটনা ইউনিভারসিটির পরীক্ষাও খুব কঠিন। মণিকার চিঠিতে আপনার বৃত্তি পাওয়ার সংবাদ পেয়েছি। কি যে খুশী হ'য়েছি তা জানাবার নয়। মণিকা লিখেছে সে নাকি ভাল পরীক্ষা দিতে পারে নাই এবার সে পাশ করতে পারবে না। তাকে একটু অঙ্কটা শিখিয়ে দেন না যাতে সে ফেল না করে। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে সে অঙ্ক ছেড়ে দেবে। অশোকদাও সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ ক'রেছে শুনে সুখীই হলুম। ফেল করে নাই এই যথেষ্ট। আমার রেজাল্ট খারাপ হওয়ায় বাবা মা খুব বকাবকি ক'রেছেন—আমি ভাল ক'রে পড়ি নি। পড়ায় ফাঁকি আমি দিয়েছি

সত্যি কিন্তু কেন জানেন? আমি গান শিখতে আরম্ভ ক'রেছি। অনেকটা সময় গানে দিতে হয়। যখন দেখা হবে তখন গান শোনাব। আপনার ভাল লাগবে কিনা জানি না। তবে এক তরফা গান শোনার ইচ্ছা নাই বলেই আর গান শোনাবার ইচ্ছাতেও কতকটা গান শিখতে আরম্ভ ক'রেছি।

একবার আসুন না এখানে; বাবা দেওঘরে বদলি হ'য়েছেন। এক-সঙ্গে তীর্থ করা এবং বেড়ান হবে। অসুবিধে হ'লেও আসবেন। আমি ত মেয়েমানুষ ইচ্ছে ক'রলেই যেতে পারি না। কিন্তু আপনাদের আমার মত বাধা নেই। যদি আসেন তবে খুব খুশী হব। না না আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি—অপর্ণা

ছোট একটি পত্রের অপর্ণা দীর্ঘ উত্তর দিয়াছে। বৃত্তি পাইয়া আমি যতখানি আনন্দ না পাইয়াছিলাম এইমাত্র আমি ততোধিক আনন্দ পাইলাম। ইহা যেন পত্র নয় আমার সার্টিফিকেট। সেদিন যে গান রচনা করিয়াছিলাম আজও কানে তাহার সুর ভাসিয়া আসে। "গানে তোমায় আমায় মিলন হবে। নাইবা হ'ল প্রাণে প্রাণে—"

মণিকা ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারিল না। মোহিত বাবু সিদ্ধান্ত করিলেন মেয়েছেলের আর পড়িয়া কাজ নাই। ফেল করিবার পর মণিকা শয্যা লইয়াছে—বিশেষ করিয়া তাহার ঠাকুরদার সিদ্ধান্ত শুনিয়া। ছোট মামিমা আসিয়া বলিলেন—"মাণিক, মণিকা বড় মুষড়ে প'ড়েছে ওকে পড়াবার আর পাশ করাবার ভার তোমাকে নিতে হবে!"

ছোট মামিমার কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম না। তাহার দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া রহিলাম। ছোট মামিমা বলিলেন—"আমার খুব পড়াবার ইচ্ছা, অপু কেমন পাশ ক'রে যাচ্ছে। শ্বশুর মশায়ের কথার উপর ত কথা ব'লতে পারব না। তুমি যদি ওঁকে রাজী করাতে পার তবে

মণিকা আসছে বছর আর একবার পরীক্ষা দিয়ে দেখে। তুমি ত জান মেয়েদের পিছনে শ্বশুর মশায় খরচ ক'রতে রাজী নন। তা না হ'লে প্রাইভেট টিউটর দিতুম। তুমি ভার নিলে হয়ত পড়াতে রাজী হ'তে পারেন।"

মণিকার জন্য মোহিত বাবুকে আমি কিছু বলিতে পারি নাই; কিন্তু মণিকার শয্যাগ্রহণ দেখিয়া মোহিত বাবু কতকটা নিমরাজী হইয়াছিলেন এবং আমিও প্রসঙ্গত মণিকাকে সাহায্য করিব জানাইয়া দিলাম। মণি-কাকে সংবাদ দিবার জন্য মণিকার নিকট গেলাম। কয়েকদিনে মণিকা বেশ কৃশ হইয়া গিয়াছে। এতদিন তাহার সহিত সাধারণ ভাবে দু' একটা কথা বলা ছাড়া আর অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করি নাই। সেইজন্য মণিকাকে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিলাম—"ফেল ক'রেছ ত কি হ'য়েছে। অমন কত লোক ফেল হয়।" দু একটা দৃষ্টান্ত দিলাম অমুক এণ্ট্রান্স ফেল করিয়া পরে ভাল করিয়া পড়াশুনা করিয়া ভাল ভাবে এম, এ পর্যন্ত পাশ করিয়া অমুক কলেজে প্রফেসারী করিতেছে। অনেক কথাই সেদিন বলিলাম কিন্তু মণিকা কোন কথারই উত্তর দিল না। যেমন শুইয়াছিল তেমনি শুইয়া রহিল। মণিকার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনুনয় করিয়া বলিলাম—"আমার কথার উত্তর দেবে না মণিকা?" মণিকা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে হবে না, আপনার জন্যেই ত আমি ফেল ক'রেছি।"

মণিকা রীতিমত আমার ছাত্রী হইয়া পড়িল। মণিকা আমার জন্য ফেল করিয়াছে এই মণিকার অভিযোগ। অর্থাৎ আমি তাহাকে কেন এতদিন পড়াই নাই। তাহার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব? মণিকা স্বেচ্ছায় কোনদিন পড়িতে চাহে নাই. আমিই বা কেমন করিয়া অনাত্মীয়া যুবতীকে পড়িবার জন্য অনুরোধ করি? মণিকাকে ভাল করিয়া পাশ করাইতে হইবে ইহাই আমার একমাত্র কামনা হইয়া উঠিল। তাহাকে

অঙ্ক শিখাইতে হইবে অন্যান্য বিষয়ও পড়াইতে হইবে। নিজের পড়াশুনা করিতে হইবে। মণিকাকে আবার প্রথম হইতে শিখাইতে আরম্ভ করিলাম। সে যদি পড়াশুনায় অবহেলা করিত বা ঠিক মত কথা না শুনিত তবে তাহাকে ভৎ´সনা করিতে ক্রুটী করিতাম না। মণিকা ছাত্রী আমি শিক্ষক।

মণিকা একদিন পড়িতে পড়িতে বলিল—"মাণিকদা আপনি যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছেন?"

—"কি হ'য়ে যাচ্ছি?"

—"কি যেন একরকম হয়ে যাচ্ছেন আপনি, সত্যি আপনি যেন আগের মানুষ আর নাই। এমন হয়ে যাচ্ছেন কেন বলুন ত?"

কানের কাছের একটা ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া বিরক্ত করিতেছিল বারে বারে হাতের বাতাস দিয়া ভ্রমরটাকে সরাইয়া দিতেছিলাম। মণিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"আহা তাড়াচ্ছেন কেন মাণিকদা, ভ্রমরে সুসংবাদ আনে। নিশ্চয়ই আপনার বিয়ের খবর আস্‌ছে।"

মণিকার দিকে চাহিলাম। মণিকা চক্ষু অবনত করিল। শান্ত কণ্ঠে বলিলাম—"তুমি পড়তে এসেছ না ফাজিলামো করতে এসেছ?" মণিকা গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। মণিকাকে ভৎ´সনা করিয়া বেশ একটু আত্মশ্লাঘা বোধ করিলাম। মনের দুর্বলতা জয় করিয়াছি মনে করিয়া বেশ একটা তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল।

মানুষের মনকে বায়ুর সহিত তুলনা করা চলে। সামান্য একটু গরম হইলে যেমন বাতাস জোরে প্রবাহিত হয় মনও তাই। সামান্য উষ্ণতাতেই মনে ঝড় উঠে। মণিকার উপর যখনই রাগ করিয়াছি তখন মনের মধ্যে ঝড় উঠিয়াছে সে ঝড়ে আর কিছু না হোক হৃদয়ের মধ্যে যে ঢেউ উঠিত তাহাকে শান্ত করিতে বেশ বেগ পাইতে হইত। এখন মণিকার সহিত

সম্বন্ধ সহজ হইয়াছে। আর যেন কোন হৃদয় বেগের স্থান নাই। যে মণিকার সহিত সামান্য কথা বলিয়া তৃপ্তি পাইতাম সেই মণিকা যদি অনাবশ্যক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত তাহাতে বিরক্ত হইতাম। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে "বেশী মেলামেশা মিলনকে ঘৃণায় পরিণত করে ;" বেশী মেলামেশার মধ্যে সর্বক্ষেত্রে ঘৃণা না আসিলেও মিলনের মাধুর্য অনেকখানি নষ্ট হইয়া যায়।

১৯

একদিন রাজসাহী আসিয়াছি, পুরাতন বন্ধু বা পরিচিতদের বিশেষ কোন খোঁজ লই নাই। মণিকার চিন্তা এতদিন সব কিছু কর্তব্যকে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল যদি বা কখনও দুই একজন বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত তখন দুই একটা কথা ছাড়া বিশেষ কিছু আগ্রহ করিয়া তাহাদের সহিত মিশি নাই। আজ যেন মনে হইতে লাগিল, না খুবই অন্যায় হইয়াছে ; রাজসাহীর পুরাণ দিনের পুরাণ সাথীদের খোঁজ করিতে হইবে। আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান চাষীপরিবারের বাড়ী। ছেলেবেলায় ঐ বাড়ীতে আমার ও পরাণদার একটি আড্ডাস্থল ছিল। মনোদির বাড়ী দূরে থাকায় যখন মনোদির নিকট যাওয়া সম্ভব হইত না তখনই আমরা সুলেমান ভাইয়ের বাড়ীতে আড্ডা দিতাম। সুলেমান ভাই তখন কলেজে পড়িত। সুলেমান ছিল পাড়ার ছেলেদের দলপতি। আমরা বয়সে খুব ছোট হইলেও সুলেমান ভাইয়ের সহিত খেলা করিতাম। এমন সুন্দর ও মধুর স্বভাবের ছেলে আমি কখনও দেখি নাই। সুলেমান তাহার চাচীর বাড়ীতে থাকিত। সুলেমানের পিতা বাহার সেখ দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করায় এই মাতৃহীন বালক তাহার চাচীর ক্রোড়ে আশ্রয় লয় এবং চাচা ও চাচীর তত্বাবধানে মানুষ হয়। সুলেমানের চাচার একমাত্র

মেয়ে ফতেমা ছাড়া আর কোন সন্তান না থাকায় তাহারা সুলেমানকে পুত্রস্নেহে মানুষ করিয়াছিল। ফতেমা আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় হইবে। সুলেমানদের বাড়ীতে আমরা প্রায়ই যাইতাম। সুলেমানরা মুসলমান এ কথা আমরা জানিতাম, কিন্তু হিন্দুর সহিত মুসলমানের কি তফাৎ তাহা তখন বুঝিতাম না। দুই চারটি বিষয়ে আমাদের সহিত খুবই পার্থক্য দেখিতাম কিন্তু অল্প বয়সে তাহা ধর্তব্য মনে হইত না। ফতেমাকে আমরা ফতেমা বলিয়াই ডাকিতাম। ফতেমার বয়স তখন তের কি চৌদ্দ হইবে। বেশ গোলগাল ফর্সা চেহারা। চোখে সুরমা দিয়া এবং পরিপাটী করিয়া কেশবিন্যাস করিয়া যখন সে আমাদের সহিত গল্প করিত তখন আমাদের মনে হইত এ যেন ঠিক আমাদের মত মানুষ নয়। তাহার কেশ বিন্যাসের ধরণ এবং চোখের সুরমা আমাদের জাতির কোন মেয়েরাই ব্যবহার করিত না। পরাণ দা একদিন বলিল—"এই ফতি—অত বড় মেয়ে কাজল প'রতে লজ্জা করে না ?"

ফতেমা বলিল—"সেকি ভাই পরাণ, কাজল কেন হবে ? এত সুরমা ; তোমরা প'রবে ? দেখবে চোখ কেমন ঠাণ্ডা থাকবে।" সুরমা পরিবার জন্য ফতেমা কত আগ্রহ প্রকাশ করিত কিন্তু তাহার কথায় রাজী হইতে পারি নাই। ফতেমাদের বাড়ীতে আমরা বেড়াইতে গেলে আম, কলা যখন যে জিনিষ থাকিত ফতেমা আমাদের খাইতে দিত। কিন্তু আমাদের কখনও জল পান করিতে দিত না। জল চাহিলে বলিত—"যাও না বাড়ী ত কাছেই জল খেয়ে এস'না এক দৌড়ে!" ফতেমার এই বিচিত্র ব্যবহারে আমরা খুবই ক্ষুব্ধ হইতাম। একদিন পরাণ দা খুবই পিপাসার্ত হইয়া ফতেমার নিকট জল চাহিল বারংবার অনুযোগ করা সত্ত্বেও ফতেমা জল দিল না। পরাণ দা রাগিয়া বলিল—"এই বোশেখ মাসে বামুনের ছেলেকে জল দিলি না দেখবি ম'লে চাতক হয়ে জন্মাবি।" ফতেমা বেদনার্ত কণ্ঠে জবাব দিল—"পরাণ ভাই আমি কি তোকে জল খাওয়াতে

পারি লোকে ব'লবে কি ? আমাদের হাতে জল খেলে যে তোদের জাত যাবে ! তোদের জাত গেলে সে পাপ ত আমাকে লাগবে তার চেয়ে মরে না হয় চাতক হব। আমি বরং একটা ডাব কেটে দিই।" আমরা দুই ব্রাহ্মণ শিশু যতবার আমাদের জাতি সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া ফতেমার নিকট জল বা খাদ্য চাহিয়াছি ফতেমা ততবারই প্রত্যাখান করিয়াছে। কখনও কখনও আমাদের জিদ দেখিয়া ময়রা বাড়ী হইতে ময়রাকে দিয়া রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন দ্রব্য এবং জল আনাইয়া খাওয়াইয়াছে। কিন্তু কখনও কোন স্বহস্তনির্মিত খাদ্য আমাদের তুলিয়া দেয় নাই। ফতেমার বাড়ীতে যাইয়া পাছে আমরা দুই ভাই জাতধর্ম ঘুচাইয়া ফেলি সেইজন্য ফতেমা মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিত—"অমন যদি করিস্ তবে আসিস না আমাদের বাড়ীতে।" একদিন পরাণ দা মুরগীর ডিম খাইবার জন্য জেদ করায়—ফতেমা বলিয়াছিল—"মা আমাদের মুরগীগুলো বেচে দিতে হবে. নয়ত এরা এসে কোনদিন ডিম নিয়ে বাড়ীতে চ'লে যেয়ে একটা কাণ্ড বাধাবে।" ফতেমা যত আমাদের জাতিরক্ষা ব্যাপারে শঙ্কিত হইত আমরা ততই দুই ভাই মজা করিবার জন্য ফতেমার নিকট খাবার চাহিয়া বিরক্ত করিতাম।

একদিন মাসিমা বলিলেন "ফতির সুলেমানের সঙ্গে বিয়ে।" মাসিমার কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। সুলেমান ফতেমার বড় ভাই। সুলেমানের সহিত ফতেমার বিবাহ কেমন করিয়া সম্ভব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সুলেমান যদি ফতেমাকে সত্যিই বিবাহ করে তবে খুবই লোক নিন্দা হইবে ভাবিয়া দুই ভাই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। পরাণ দা বলিল—"ফতিকে ব'লে দেব সুলেমান ভাইকে যেন বিয়ে না করে। আমাদের কথা শুনবে না মনে করিস্ ? বুঝিয়ে ব'ললেই শুনবে।"

ফতেমা আমাদের নিষেধ শুনিবে কি না কে জানে। সে যে নিষেধ শুনিবে না এই আমার ধারণা। কারণ ফতেমাকে কতবার চোখে সুরমা

পরিতে নিষেধ করিয়াছি সে শোনে নাই। তাই পরাণদাকে বলিলাম—"সে কি শুনবে? ত্থাখ নাই কতবার সুরমা লাগাতে বারণ ক'রেছি—শুনেছে সে কথা?" পরাণদা বলিল—"সুরমা লাগান আর বিয়ে করা ঢের তফাৎ। ও বললেই শুনবে।"

আমরা দুই ভাই ফতেমার নিকট প্রস্তাব করিলাম—"সত্যি তুই সুলেমান ভাইকে বিয়ে করিস্ না তা হ'লে লোকে নিন্দে ক'রবে।"

ফতেমা আমাদের কথা শুনিয়া রাগিয়া গেল, বলিল—"লোকে নিন্দে ক'রবে কেন শুনি?

পরাণদা রাগিয়া উত্তর করিল—"ভাল'র জন্য বলছিলুম না শুনলি বয়ে গেল।"

ফতেমা ব্যাপারটা বুঝিয়া থাকিবে তাই হাসিয়া উত্তর দিল—"আমাদের অমন বিয়ে হয় পরাণ, তোমাদের হিন্দুদের হয় না।"

পরাণদার রাগ পড়িয়া গেল। বলিল—"তাই বলতে হয়। ত্থাখ দেখি, আমরা মিছি মিছি ভেবে অস্থির।"

শৈশবের সাথী ফতেমার কথা মনে পড়িয়া গেল। সুলেমানের সহিত বিবাহ হইবার পর মাত্র দেড় বছর সে বাঁচিয়া ছিল। সুলেমান ভাই ও ফতেমার স্নেহের অনেকখানি আমরা শৈশবে পাইয়াছি আজও তাহার কথা মনে হইলে অপূর্ব আনন্দ বোধ করি। কীর্তিনাশা পদ্মার তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম এই পদ্মার অতল তলে আমার মনোদি তাহার সমস্ত স্নেহরস লইয়া লুকাইয়া আছে—আর আছে শৈশবের সাথী ফতেমা।

বিবাহের দেড় বছর পর ফতেমার এক সন্তান হয়। ছেলেটীর নাম রাখা হয় 'বাবুয়া'। বাবুয়ার যখন সবেমাত্র দেড় মাস বয়স তখন বাবুয়ার মা ফতেমা ঐ কীর্তিনাশার গর্ভে লীন হইয়া যায়। সে এক করুণ কাহিনী। ফতেমার সহিত সুলেমান ভাইয়ের কয়েকদিন হইতে

মন কষাকষি চলিতেছিল। ব্যাপারটা তুচ্ছ। ফতেমা সুলেমানকে বলিয়াছিল বাবুয়াকে কি দেবে বল? তাকে সোনার বালা দিতে হবে। সুলেমান বলে. ব্যাটাছেলেকে আবার গয়না দেয়, ও বড় হোক তখন কিছু দেওয়া যাবে। ফতেমা রাগ করিয়া ––ক নানা কথা শুনাইয়া দেয় "আমাদের বাড়ীতেই আছ আমাদেরই খাচ্ছ পরছ কখনও একপয়সা দিলে না—আজ বাবুয়াকে একটা জিনিষ দিয়ে মুখ দেখলে না? এতে তোমার সরম লাগা উচিৎ।"

কথাটা সামান্য কিন্তু সত্য কথা সামান্য হইলেও অনেক সময় বিপর্যয় আনিয়া দেয়। সুলেমান বলিল—"তোমাদের খাচ্ছি পরছি? বেশ আমি চললুম।" সুলেমান চলিয়া গেল। কোথায় গেল তাহার কেহ সন্ধান দিতে পারিল না। ফতেমার বাবা মা ফতেমাকে ভৎর্সনা করিল। ফতেমার চাচী বা সুলেমানের বিমাতা ফতেমাকে বহু গালাগালি দিতে লাগিল। যে এতদিন সুলেমানকে চাহিয়াও দেখে নাই তাহার দরদ সব চেয়ে বেশী।

একদিন পরাণদা ও আমি পদ্মার তীরে দাঁড়াইয়া আছি। ভরা ভাদরে পদ্মা গরবিনী নারীর মত দেমাকভরে দুইকূল ভাসাইয়া বহিয়া যাইতেছে। আমরা দুই ভাইয়ে অনেক দুর বেড়াইতে বেড়াইতে চলিয়া আসিয়াছি, দেখি দূরে ফতেমা দাঁড়াইয়া। আমরা ফতেমার নিকট যাইতেই ফতেমা বলিল—"ভাগ্যিস এলি ভাই বাঁচলুম ছেলেটাকে কে যে একবার ধরে তার ঠিক নাই। ধরত ভাই মাণিক বাবুয়াকে।"

একি! ফতেমা কেমন যেন সাদা হইয়া গিয়াছে! তাহার মুখ চোখে কোথাও যেন একবিন্দু রক্ত নাই। ফতেমাকে দেখিয়া কেমন যেন ভয় পাইয়া গেলাম। বলিলাম—"ফতি, সন্ধ্যেবেলায় ছোট ছেলে নিয়ে তুই এত দূরে এসেছিস বেড়াতে? তোর মা জানতে পারলে বকবে।" ফতেমা আমার কথায় কান না দিয়া অতি ত্রস্ততার সহিত

বাবুয়াকে আমার কোলে ফেলিয়া দিল। আর কেমন যেন দুর্বোধ্য ভাষায় বলিল—"তোদের সুলেমান ভাই এলে বলিস্ সে যেন সাদি ক'রে সুখী হয়।"

পরাণ দা ও আমি হতবুদ্ধি হইয়া ফতেমার দিকে চাহিতেই দেখি ফতেমা বিদ্যুৎ গতিতে পদ্মার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কীর্তিনাশা সহস্র বাহু মেলিয়া ফতেমাকে লুফিয়া লইল। একবার শ্বেত পদ্মের মত পদ্মার বুকে ফতেমা ভাসিয়া উঠিল তারপর পদ্মার গভীর জলে কোথায় লুকাইয়া গেল তাহার আর সন্ধান মিলিল না।

ফতেমাদের বাড়ীতে গেলাম। সাত আট বৎসরের একটি শিশু অবিকল ফতেমার মুখাবয়বের সহিত মিল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে এই ফতেমার ছেলে বাবুয়া। বাবুয়া আমাকে দেখিয়া বলিল—"ও দাদি দাদি দেখে যা ঠিকেদার বাবুদের বাড়ীর মাণিক বাবু এসেছে।" বাবুয়া আমাকে চেনে, আমি বাবুয়াকে চিনি না। ফতেমার মা বাহির হইয়া আসিল আমাকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিল—"কি রে মাণিক এতদিনে তোর চাচীকে মনে প'ড়ল—ফতি নাই ব'লে কি একবার তোর চাচীর খোঁজ নিতে নাই আয় বাবা কাছে এসে বোস সোনার চাঁদকে আমার দেখি আয় বাবা তোদের গায়ে যে আমার ফতির গন্ধ আছে রে বাপধন।" ফতেমার মায়ের এমন কিছু বয়স হয় নাই তথাপি মনে হইতে লাগিল শোকের আঘাতে তাহার বয়স অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। ফতেমার পিতা নাদের সেখ গৃহের ভিতরে ছিল; আমাদের কথাবার্তা শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া তাহার বদনমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল "ফতির মা দেখছিস ফতি নাই ব'লে মাণিক দু'বছর এসেছে তবু এদিকে আর আসে নাই। এস বাবা এস তুমিই ত আমার বাবুয়াকে দিয়েছ—তুমি না থাকলে ত হতভাগি

বাবুয়াকে নিয়েই জলে ঝাঁপ দিত।" বাবুয়াকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল "দেখেছিস্ কে এসেছে ও তোর মামু হয়। দে সালাম দে।"

ফতেমার বাবার ও মায়ের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিলাম। ফতেমা নাই যে এক গেলাস জল চাহিয়া ফতেমাকে বিব্রত করিব। আমাদের জাত বাঁচাইবার জন্য সেই বালিকার আকুল আগ্রহ চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। ফতেমার উদ্দেশ্যে মাথা নত করিয়া মনে মনে নমস্কার করিলাম।

বিগত দিন ফিরিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু বিগত দিনের স্মৃতি মনকে যেমন নাড়া দিতে পারে তেমন আর কিছুতেই পারে না। মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া গেলাম সে ফতেমা নাই। ফতেমার স্মৃতি আমার মনকে বর্তমানের কথা ভুলাইয়া দিল।

২০

মণিকা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে। মণিকার সাফল্য যেন আমারই সাফল্য। মণিকা বেশ ভালভাবে প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে। বাড়ীর সকলেই আমার উপর খুশী; অনাত্মীয়ের ন্যায় যেটুকু ব্যবহার মণিকার বা তাহার বাড়ীর লোকের আমার উপর ছিল সেটুকু কাটিয়া গিয়াছে। আমি যেন এখন মণিকাদের বাড়ীর লোক।

অপর্ণার এক চিঠি পাইলাম।

"মাণিক বাবু,

মণিকা পাশ ক'রেছে। এ খবর মণিকা জানিয়েছে সেই সঙ্গে ক'রেছে আপনার প্রশংসা। তার চিঠি কেবল আপনার কথায় ভরা। মণিকা লিখেছে সে আপনার কাছে প'ড়েই প্রাইভেটে আই, এ, দেবে। ওখানে মেয়েদের কলেজ নাই তাই বাবা মণিকাকে আমার কলেজে

পড়াবার জন্য লিখেছিলেন। মণিকা আপত্তি জানিয়ে আমাকে অনুরোধ ক'রেছে 'অপুদি জ্যাঠামশায়কে বলে আমার ওখানে পড়ার বন্দোবস্ত বন্ধ করতে হবে। আমি রাজসাহী ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না। এখানে মাণিকদার কাছেই আমার ভাল পড়া হবে!' মণিকার ভাগ্য ভাল তাই আপনার মত মাষ্টার জুটেছে। আপনাকে একবার দেওঘর আস্তে লিখেছিলুম এলেন না। তখন কি ছাই জানতুম যে আপনি ছাত্রী নিয়ে ব্যস্ত। তা হ'লে আপনাকে কি আসতে লিখতুম! আপনি কি নতুন গান আর রচনা ক'রেছেন? সে কি মণিকা একাই শুনবে? কয়েকখানা গান রচনা ক'রে পাঠান না। আমি তাতে সুর দেব। আপনি ত এখানে আসবেন না কারণ মণিকা আপনাকে ছেড়ে দেবে না। তাতে তার পাঠের ব্যাঘাত হবে। যদি রাজসাহী যাই গান শুনব এবং শোনাব। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

অপর্ণা"

অপর্ণার পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। অপর্ণা মণিকা সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত করিতে চায়? অপর্ণার পত্রে যেন কিসের কটাক্ষ। মণিকার সহিত সহজভাবে মিশিয়া আসিয়াছি ইহার মধ্যে এতখানি গ্লানি জমিয়া উঠিতে পারে তাহা ত কোনদিন ভাবি নাই। মণিকাকে ভাল লাগিয়াছে তেমনি অপর্ণাকেও ত লাগিয়াছে। তবে অপর্ণা মণিকার ভাল লাগাকে এমন পৃথক করিয়া দেখিল কেন? মণিকাকে দেখিয়া মনের মধ্যে প্রথম যে ঝড় উঠিয়াছিল সে ঝড় থামিয়া গিয়াছে। এমন মণিকাকে অন্য পাঁচজন বালিকা হইতেও পৃথক মনে হয় না। মণিকা অপর্ণাকে কি লিখিয়াছে কে জানে যাহার সূত্র ধরিয়া অপর্ণা অত কথা লিখিয়াছে। অপর্ণার পত্রে রাগ করিলাম না, কিন্তু ক্ষুব্ধ হইলাম। ক্ষোভের বশে উত্তর দিলাম।

"অপর্ণা,

আপনার ভয় নাই। মণিকা যদি আমাকে ছাড়িয়া আপনার কাছে না যাইতে পারে তবে বাধ্য হইয়া মণিকাকে ছাড়িয়া আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে। মণিকার কল্যাণ যেমন আপনাদের দেখা উচিৎ তেমনি আমারও দেখা উচিৎ। আমি তাহার মাষ্টার তাহার বেশী আর কিছু নহি। শিষ্যার যাহাতে সর্ববিধ কল্যাণ হয় তাহা গুরুর দেখা কর্ত্তব্য। পক্ষকালের মধ্যেই রাজসাহী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। মণিকা তখন অনায়াসে আপনার কাছে যাইয়া কলেজে ভরতি হইতে পারিবে। গান রচনা করিতে পারি নাই। রচনা হইলেই পাঠাইয়া দিব। ইতি—

আপনার মাণিকদা"

পত্রখানা ডাকে ফেলিয়া দিয়া মনে হইল পত্রখানা দেওয়া ঠিক হয় নাই এ যেন আমার অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি। যত সহজে রাজসাহী ছাড়িয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম রাজসাহী ছাড়া কি তত সহজ? যতই অপর্ণার পত্রের কথা মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ততই মনে হইতে লাগিল অপর্ণার পত্র বর্ণে বর্ণে সত্য। মিথ্যা এবং অহেতুক বলিয়া উড়াইয়া দিলে বিধাতা শুনিবে কেন? পক্ষকালের মধ্যে রাজসাহী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অপর্ণার কাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ছোট হইব না। কিন্তু রাজসাহী ছাড়িয়া যাইতে ত কই মন চাহিতেছে না! কি এমন বাধা? লেখাপড়া শেখা? কই না, যে কোনদিন আমি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে পারি! তবে কে আমাকে রাজসাহী ছাড়িতে বাধা দিতে পারে? যেদিন পড়িতে আসি সেদিনের সেই প্রথম প্রভাতের প্রথম আলোকরশ্মি যে কিশোরীর মুখে পড়িয়া আমার রাজসাহী বাসকে সহজ করিয়া দিয়াছিল আজ বিদায় বেলায় দেখি সেই মুখখানি পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অশোকের

ভালবাসা আমার পথরোধ করিতে পারিল না। ছোট মামিমার স্নেহ, অশোকের ঠাকুরমার ভক্তি কোন কিছুই আমার রাজসাহী ছাড়িবার পথে বাধা জন্মাইল না, আর ছোট্ট একটী বালিকা সে যে এমন করিয়া আমার অন্তরের সমস্ত শক্তিতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ধূলায় মিশাইয়া দিবে কে জানিত? না, কোন কিছুতেই আমার রাজসাহী ছাড়িবার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। রাজসাহী আমাকে ছাড়িতেই হইবে।

রাউলাট কমিশনের পর রাউলাট এ্যাক্ট পাশ হইয়া গেল। ভারতব্যাপী বিক্ষোভ সুরু হইল। জালিয়ানওয়ালা বাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে স্থির থাকিতে না পারিয়া মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বলিলেন "ইংরাজ তুমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবে এই আশ্বাসে আমি তোমার যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছি। যুদ্ধে জয় করিয়া তুমি দেশবাসীকে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে দেশবাসীর হাতে আরও দৃঢ় করিয়া শৃঙ্খল পরাইয়া দিলে! ইহা আমি কখনও সহ্য করিব না।" তিনি দেশবাসীকে অসহযোগের জন্য আহ্বান করিলেন। উকিলকে বলিলেন ওকালতি ছাড়, ছাত্রদিগকে বলিলেন ঐ-স্কুল কলেজ গোলামি শিখাইবার আড়ৎ, ঐ সব গোলামখানা ছাড়। চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টাররা গান্ধীর সে বাণী শুনিয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কলেজে কলেজে ছেলেরা পড়া ছাড়িয়া দিয়া গান্ধীজীর নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। হিমাচল হইতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত এক নবীন প্রাণের জাগরণ উঠিল। গোলামখানা ছাড়িয়া দিলাম।

মণিকা বলিল—"মানিকদা আপনি নাকি পড়া ছেড়ে দিয়েছেন দাদা ব'লছিল।" আমি কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছি অশোক ছাড়া আর কেউ জানে না। মণিকাকে বলিলাম—"হ্যাঁ ও গোলামখানায় গোলামি ছাড়া আর কিছুই শেখান হয় না।" মণিকা আমার কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "তবে কি

আপনি রাজসাহী ছেড়ে চ'লে যাবেন?" উত্তর করিলাম—"আর রাজসাহীতে কি কারণে থাকতে যাব মণিকা?"

মণিকা যেন পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"রাজসাহীতে আর কি করতে থাকবেন আমিও জানি। আপনার দুটি পায়ে পড়ি পড়া ছাড়বেন না। আপনার মত ভাল ছেলে কেউ স্বদেশী করবার জন্য কলেজ ছাড়ে নাই। বি, এস, সি পরীক্ষা দিয়ে রাজসাহী ছেড়ে চ'লে যাবেন আপনাকে কেউ নিষেধ ক'রবে না।"

মণিকাকে দেশপ্রেমের এক বৃহৎ বক্তৃতা দিলাম। বি, এস, সি পাশ করা অপেক্ষা যে আমি অধিকতর কৃতিত্বের পথে অগ্রসর হইতেছি এই কথা তাহাকে শুনাইলাম। ছাত্রীর কাছে মাষ্টার যেরূপ যুক্তি দিয়া বোঝায় সেইরূপ যুক্তি দিয়া বুঝাইলাম।

মণিকা ঘাড় বাঁকাইয়া দৃঢ় স্বরে বলিল—"অত কথা শুনতে চাই না। আপনার পড়া ছাড়া চ'লবে না—আপনার রাজসাহী ছাড়াও চ'লবে না।" এই বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

ভোরে উঠিয়া পদ্মায় স্নান করিতে যাওয়া আমার অভ্যাস। পরের দিন স্নান করিতে যাইতেছি দেখি মণিকা ও কণিকা কাপড় গামছা লইয়া পদ্মার বালু ভাঙ্গিয়া আগে আগে স্নান করিতে যাইতেছে। যে পথে তাহারা যাইতেছে সে পথে কেহ স্নান করিতে যায় না। মণিকা মধ্যে মধ্যে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেছে। আমাকে দেখিয়া মণিকা হাতছানি দিয়া ডাকিল। আমি মণিকার পশ্চাতে পশ্চাতে পদ্মার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। কণিকা বলিল—"দিদি তুই স্নান করে নে আমি মাকে ব'লে আসিনি—যদি আজ স্নান ক'রতে বারণ করে।" এই বলিয়া কণিকা বালুচরে বালুঘর তৈয়ারী করিতে লাগিয়া গেল। প্রভাত হইলেও সূর্য উঠিতে তখন বেশ দেরী আছে। পদ্মার অর্ধেক জল তখনও কালো এবং বাকি আধখানা জল প্রভাত কালের মতই সাদা। মণিকা যেমন

আগে আসিয়াছিল আগেই জলে নামিল। মণিকা স্নান করিতে নামিতেছে দেখিয়া আমি দূরে সরিয়া যাইবার জন্য পদ্মার তীর ধরিয়া চলিয়া যাইতেছি এমন সময় মণিকা ডাকিল—"কোথায় যাচ্ছেন মাণিকদা ?"

—"তুমি স্নান কর আমি একটু দূরে স্নান করিগে।"

—"আমি বুঝি স্নান ক'রতে এসেছি ?"

—"তবে বুঝি জলে ডুবতে এসেছ ?" কথাটা অজ্ঞাতে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

"সত্যিই তাই। বিশ্বাস না হয় এখুনি দেখতে পাবেন !" "খুব হ'য়েছে আর ফাজলামি ক'রতে হবে না। শিগ্‌গিরী উঠে পড়।" ফতেমার কথা মনোদির কথা মনে পড়িয়া গেল। মণিকাও সেই জাতের। ইহাদের জলে ডুবিতে কিছুই লাগে না। মণিকার কথায় ভয় পাইয়া গেলাম— বলিলাম "মণিকা ওঠ ছেলেমানুষি ক'রো না।"

মণিকা বলিল—"যে জলে ডুববে সে আবার ছেলেমানুষি করে মাণিকদা ? যে বিশ্বাস করে না সেই ছেলেমানুষি করে।"

বিদ্যুৎ গতিতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মণিকার হাত ধরিলাম। মণিকা হাতটা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"হাত ছাড়ুন— কণিকা দেখতে পাবে।"

—"পাক দেখতে, তুমি ওপরে ওঠ তারপর হাত ছেড়ে দেব।"

—"কেন আমি যদি ডুবি তবে আপনার কি ?"

মণিকার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া বলিলাম—"আমার কিছু নয়। তবে কি জান মণিকা রাজসাহীতে আমি যাদের ভালবেসেছি তারা এই পদ্মার কোলেই লুকিয়ে আছে। আবার তুমিও কি তাই লুকুতে চাও ?" কথাটা বলিয়া কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। মণিকার হাত ছাড়িয়া দিলাম।

মণিকা দুষ্টামি করিয়া বলিল—"আমাকে ভালবাসেন বলেই বুঝি হাতটা ছেড়ে দিলেন যাতে আমিও তাদের মত জলে ডুবি?" ত্বরিৎ গতিতে পুনরায় মণিকার হাত ধরিয়া বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম—"কি ব'লতে চাও মণিকা?"

—"কিছু না—আমি শুধু জলে ডুবতে চাই।"

—"তুমি যে শৈবলিনীর অভিনয় ক'রছ দেখছি মণিকা" এই বলিয়া মণিকার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিলাম।

মণিকা বলিল—"সে ত গল্প এখন যখন দেখবেন সত্যই শৈবলিনী ডুবতে পারে তখন বুঝতে পারবেন।"

—"তুমি ত জান মণিকা প্রতাপ বা শৈবলিনী কেউ সুখী হ'তে পারে নাই—"

—"সেইজন্যই ত ডুবতে চাই, জানি বেঁচে আমার সুখ নাই।" মণিকার গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা মুক্তার মত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মণিকাকে তীরে উঠাইয়া কাছে বসাইয়া বলিলাম—"বল মণিকা তুমি কি চাও—আমার সাধ্য থাকিলে তাই ক'রব।" মণিকা অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"তুমিই বল আমি কি করিতে পারি।" মণিকার তুমি সম্বোধনে বিস্মিত হইয়া গেলাম। তাহার বামহাতখানি দুই হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া বলিলাম—"মণিকা আমি কি সাধ ক'রে রাজসাহী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি—যাচ্ছি শুধু তোমার জন্যই। অপর্ণা যা চিঠি লিখেছে তাতে ত একদিনও এখানে থাকা চলে না।"

—"সে কি লিখেছে তোমাকে—সে চ'লে যেতে লিখেছে?"

—"না তা লেখে নাই। তবে সে লিখেছে তুমি আমাকে ছেড়ে পাটনায় তার কাছে প'ড়তে যেতে চাও না। তাই যদি সত্যি হয় তবে কি আমার উচিত হবে না তোমার যাতে পাটনা যাওয়া হয় তাই করা?"

—"তুমি চ'লে গেলেই যে পাটনা যাব কি ক'রে মনে ক'রলে?"

—"আমি চ'লে গেলে যদি তুমি না যাও—তার জন্য ত অপর্ণা আমাকে দায়ী ক'রবে না।"

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"মাণিকদা তুমি লেখাপড়ায় খুব ভাল ছেলে—আমার জন্য পড়া ছেড়ে দেবে?"

মণিকাকে আর একটু কাছে টানিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম—"মণিকা আর ত লুকোবার কিছুই নাই। তোমাকেই যদি না পেলাম তবে আমার প'ড়ে লাভ কি?" আমার হৃদয় মণিকার কাছে উন্মুক্ত করিয়াছি মণিকার চোখের দিকে চাহিলাম। দুইখানি স্নিগ্ধ কালো চোখ আমার চোখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া আমার প্রশ্নের জবাব দিল।

—"আমি পাটনা গেলে তুমি রাজসাহীতে থাকবে?"

—"মণিকা তুমি পাটনা গেলেও আর আমি রাজসাহীতে একদিনও থাকতে পারব না"

—"কেন?"

—"আমার জন্য নয় মণিকা—তোমার জন্য। তোমার স্মৃতি থেকে আমাকে একবারে স'রে যেতে হবে। তাই সবদিক থেকে আমায় ঘিরে রাখতে চাই, যাতে তোমার দৃষ্টিপথে আর না পড়ি।"

—"ইস!" এই বলিয়া ত্রস্তে মণিকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জলে নামিয়া পড়িল। আমিও মণিকার উপর একপ্রকার ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম।

মণিকা যেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"ছাড়ুন আমার জলে ডুবতে ব'য়ে গেছে। রাজসাহী ছেড়ে গেলে যদি আপনি আমাকে ভুলতে পারেন সেই চেষ্টা করুনগে। মিথ্যে আমার জন্য ছেলেমানুষি ক'রে পড়া ছেড়ে দেবেন না। জলে আর আমি ডুবতে যাব কি নতুন ক'রে? ডুবতে ত বসেছি। তবে যে কটাদিন সাঁতার কেটে বেঁচে থাকতে পারি তাই চেষ্টা করে দেখব।"

মণিকা 'তুমি' ছাড়িয়া 'আপনি' ধরিয়াছে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলাম "আমি কি করব মণিকা ?"

মণিকা ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিল—"আপনি পুরুষ মানুষ আপনি কি ক'রবেন না ক'রবেন তা মেয়ে মানুষ হয়ে আমি কি ক'রে বলব ? আপনাদের অনেক পথ আছে—আমাদের কোন পথই নাই সব পথই বন্ধ ।"

মণিকা কি বলিতে চায় বুঝিতে পারিলাম না। মণিকার স্বভাব জানি। সে মেঘে জলও আছে যেমন বিদ্যুতও তেমন আছে। তাই চুপ করিয়া গেলাম। মণিকা স্নান করিয়া ধীর পদক্ষেপে কণিকাকে ডাকিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল।

মোহিত বাবু অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু আমি কলেজ ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা হইতে নিবৃত্ত হইলাম না। বাড়ী ফিরিবার সব ব্যবস্থা ঠিক করিলাম। অপর্ণাকে পত্র দিলাম—

কল্যানীয়াসু—

আপনার পত্র পেয়েছি। আপনার পত্রের মর্মানুযায়ী আমি রাজসাহী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। এরপর মণিকার পাটনা যাইয়া আপনার ওখানে থাকিয়া পড়িতে কোন বাধা থাকা উচিৎ নয়। মণিকার কথা লিখিয়া আপনি মণিকার ও আমার উভয়েরই কল্যাণ করিয়াছেন। সেই জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আপনাকে দুইটী গান রচনা করিয়া পাঠাইলাম যদি কখনও দেখা হয় তবে আপনার দেওয়া সুর শোনা যাইবে।

আমায় তুমি জয় করেছ রাণি,
তোমার কাছে মোর পরাজয়
নাইক, এতে গ্লানি।
এত মধুর এই পরাজয়
নাইক এতে লজ্জা কি ভয়,
সাধ করে তাই বারে বারে
সাধ করে' হার মানি।

জয়ের মুকুট নিয়ে শিরে
চাইবে না কি পিছু ফিরে
জয় করে কি ভাঙেনি ভয়
বিজয় গরবিনী।

অপর গানটী—

মম নাহি কোন সঞ্চয়।
শূন্য করিয়া দিয়াছি যে তোমা
হয়নি তা' অপচয়॥
রিক্ত করিয়া মোরে
তব অঞ্জলি দিছি ভোরে,
রাখি নাই কিছু দিবার আশায়
এ মোর ছলনা নয়॥
রাখিতাম যদি কিছু
তোমারে দিবার লাগি,
ফিরিতে না তুমি পিছু
ওগো প্রেমময় প্রেম মাগি;
ভিখারীর কাছে রাজার দুলাল
হাত পাতা কিছু নয়,
মোর নাহি আর সঞ্চয়॥

গান দুইটী পছন্দ হইল কিনা জানিবার ইচ্ছা রহিল। আশাকরি কুশলে আছেন। ইতি—

মাণিকদা।

প্রভাত হইতে তখনও বেশ একটু দেরী আছে। আজ রাজসাহী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। সারারাত্রি কি যেন একটা চাপা বেদনা অনুভব

করিয়াছি। যেন সব কিছু হারাইবার বেদনা। অভিভূত হইয়া না পড়িলেও সারারাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই। কেবলই মনে হইতে লাগিল মণিকার জন্য রাজসাহী ছাড়িতেছি—মণিকার জন্যই যেন আমি সব কিছু ছাড়িতেছি।

কে একজন দরজায় আঘাত করিল।

—"কে?"

—"আমি মণী—দরজা খুলুন।"

দরজা খুলিয়া দিলাম। মণিকা দ্রুত আমার শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"ছি ছি মাণিকদা আমার জন্য আপনি সব কিছু ছেড়ে দেবেন? এ হতে পারে না।"

মণিকার কথায় হাসিয়া জবাব দিলাম—"তোমাকেই যখন ছেড়ে যাচ্ছি মণিকা তখন অন্য সব কিছু ছেড়ে যাওয়া এমন কি কঠিন?"

মণিকা কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"সত্যই কি আপনি আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবেন?"

—"নিশ্চয়ই—আগে ভেবেছিলাম হয়ত পারব না। এখন ত তুমি আমার সে কাজ সোজা ক'রে দিলে মণিকা?"

মণিকা জিজ্ঞাসু নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনার কথা বুঝতে পারলুম না।"

"এখনও তুমি ছেলে মানুষ আছ মণিকা। রাজসাহী হ'তে ত আমি শুধু হাতে ফিরছি না, অনেকখানি পুঁজি নিয়েই আমি যাচ্ছি। আমার আর কোন আফশোষ নাই। এর চেয়ে বেশী আমি চাইও নাই, এই আমার যথেষ্ঠ।"

মণিকা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"কোন কিছুতেই কি তোমাকে আটকান যায় না?

—"না মণিকা—পথিক পান্থশালাকে কি কখনও সে আশ্রয় বলে

মনে করে ? পথে যে তাকে চলতেই হবে। পান্থশালা ত দু একদিনের বিরাম মাত্র।"

মণিকা ঝংকার দিয়া বলিল—"ও সব হেঁয়ালি ছাড়ুন—এরপর আমি কি করব বলুন ?" মণিকা আবার আপনি বলিতেছে। বলিলাম—"পড়া-শুনা করবে। বিয়ের সময় একটা খবর দেবে—আর কি ?"

—"আর আপনাকে উপদেশ দিতে হবে না। খুব হ'য়েছে—আমার সর্বনাশ ক'রে আপনি আজ চলে যেতে পারছেন—বেশ যান—আপনার ধর্মে যদি ভাল হয়।"

মণিকা রাগিয়া গিয়াছে। তাহার ক্রোধ নিবারণের জন্য বলিলাম—"বোকা মেয়ে এর মধ্যে আবার সর্বনাশ কোথায় দেখলে ? বরং তোমায় এবং আমার মঙ্গল হবে ব'লেই ত যাচ্ছি মণিকা।" মণিকা বেশ কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা যান আমি আর নিষেধ ক'রব না। তবে একটা কথা দেন যেখানেই থাকুন পত্র দেবেন।"

—"পত্র দিলে লোকে যে তোমার নিন্দে করবে মণিকা ?"

—"সেটুকু নিন্দে আমি আপনার জন্য সহ্য ক'রব।"—এই বলিয়া মণিকা আমার হাতে একটা ফাউণ্টেন পেন গুঁজিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

বাড়ী হইতে বেলা দুইটার সময় সকলের কাছে বিদায় লইয়া ষ্টীমার ঘাটের দিকে রওনা হইলাম। মণিকাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। ছোট মামিমা বলিলেন—"তার অমনই ধরণ ; ভদ্রতা শিখলে না এত বড় হ'তে গেল। আর তার জন্যে দেরী করলে ষ্টীমার ফেল হ'য়ে যাবে।" অশোক আমাকে ষ্টীমার ঘাটে তুলিয়া দিল।

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম ; মণিকাদের বাড়ীর পাশ দিয়াই ষ্টীমার যাইবে। অল্পকাল পরেই মণিকাদের বাড়ীর

নিকটে ষ্টীমার আসিয়া উপস্থিত হইতেই দেখিতে পাইলাম মণিকা, কণিকা ও খোকনের হাত ধরিয়া পদ্মার বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্তের জন্য মনে হইল ষ্টীমারখানা বালুচরে আটকাইয়া যাক। মণিকা রুমাল নাড়িয়া বিদায় দিল। ষ্টীমারখানা গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছে—যেন বিরাট একটা দৈত্য আমাকে লইয়া ছুটিতেছে। রাজসাহীর গাছ পাতা মাটির সহিত মণিকাও পদ্মার বেলাভূমে মিলাইয়া গেল। পিছনে ফেলিয়া আসা পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

২১

জীবন সায়াহ্নে বসিয়া যখন বিগত দিনের হিসাব মিলাইতে যাই তখন দেখি সব হিসাবই গরমিল হইয়া যায়। ছক কাটিয়া যাহার নির্দিষ্ট পথে চলিতে পারে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা হয়ত বড়াই করিয়া বলিতে পারে দেখ এইভাবে চলিয়াছি বলিয়া আজ আমি জীবনে সিদ্ধী লাভ করিয়াছি। তুমি আমার মত হিসাব করিয়া পদক্ষেপ করিতে পার নাই বলিয়া আজ তুমি পথ হারাইয়া বসিয়াছ অথবা ভুল পথে চলিয়া তোমার যাত্রাপথ ছাড়িয়া বহু দুরে চলিয়া গিয়াছ, এখন সেই পথে ফিরিতে চাহিলেও তাহা আর সম্ভব নহে। যাহারা এই সব কথা বলিয়া নিজেদের সার্থকতার কৃতীত্ব জাহির করিয়া ব্যর্থ মনোরথ ব্যক্তিকে তাহাদের ব্যর্থতার কারণ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, তখন আমি মনে মনে হাসি। তাহাদের এই উচ্চ দার্শনিক ইঙ্গিত আমাকে আঘাত করিতে পারে না। জীবনে অন্য কিছু শিক্ষালাভ না করিয়া থাকি অন্তর্যামি আমাকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যেন কোন কিছুর বার্থতায় ভাঙ্গিয়া না পড়ি বা বিধাতাকে অভিশাপ না দিই।

যাহারা আমার হিতৈষী বন্ধু যাহাদের কাছে আমার জীবনের গোপন

কিছুই নাই তাহারাও বলিয়াছে যদি আমি রাজসাহীতে মণিকার প্রেমে না পড়িতাম তবে আমি উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র হইয়া খুব বড় একটা সরকারি চাকরি লইয়া বাকি জীবন স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতাম। তাহাদের এই সব যুক্তির কোন উত্তরই আমি কোন দিন দিই নাই বা আমার জীবনের বিড়ম্বনা লইয়া আমি কোনদিন অদৃষ্টকে ধিক্কারও দিই না।

রাজসাহী গিয়াছিলাম পড়িতে; মণিকা আমার চলার পথের এমন করিয়া মোড় ঘুরাইয়া দিবে তাহা কে জানিত? ইহার জন্য কে দায়ী, আমি? না। মণিকা? না। তবে কে? অন্তর্যামি বলিতে পারেন, কে। কত জীবনই ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে কই তাহাদের চলার পথে ত মণিকা বা মণিকার মত কেউ বাধা ছিল না? তবে আমার বেলায় এ কথা আসে কেন? আসিবার কথা নহে। তবে আসে এইজন্য যাহার সব কিছু সঞ্চয় ফুরাইয়া গিয়াছে, তখন সে হিসাব করিতে বসে কি তাহার পুঁজী ছিল? কি করিলে সে তার সঞ্চিত ধন রক্ষা করিতে পারিত বা কি করিলে আরও পুঁজীর অঙ্ক বাড়িতে পারিত?

জীবনে যাহার হিসাব নিকাশ করে বা করিয়া চলিতে চায় আমি সেই দলের লোক নহি। জীবনে যাহা খোয়া গিয়াছে তাহা সত্যই খোয়া গিয়াছে এই ধারণা লইয়া চলিতে অভ্যস্ত। হা হুতাশ করিয়া বড় জোর হারাণ বস্তুর গুরুত্ব দেওয়া চলে কিন্তু যাহা সত্যই হারাইয়াছে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রাজসাহী হইতেই স্থির করিয়াছিলাম কলিকাতায় যাইব। ইতিপূর্বে কখনও কলিকাতা যাই নাই। কলিকাতা কেমন জায়গা কোথায় উঠিব কিছুই না ভাবিয়াই কলিকাতার টিকিট লইয়া ছিলাম। লালগোলা ঘাটে যখন ষ্টীমার ভিড়িল তখন দারুণ দুশ্চিন্তায় মুষড়াইয়া পড়িলাম।

পোটলা পুটলি বাঁধিয়া অগনীত নরনারী ষ্টীমার হইতে নামিতেছে। সকলেই ট্রেন ধরিবার জন্য ব্যস্ত। ট্রেনে ত চাপিব কিন্তু যাইব কোথায়? কলিকাতায় কোথায় উঠিব তাহার ঠিকানা না করিয়া কলিকাতায় গাড়ীতে চড়িয়া বসা ঠিক হইবে কি না ভাবিতেছি এমন সময় কে ডাকিল—ওরে ও মাণিক। 'মাণিক' বলিয়া আমাকে ষ্টীমারে ডাকিতে পারে এমন ত চেনা লোক কাহাকেও ষ্টীমারে দেখি নাই। মূহুর্ত্তের জন্য মনে হইল আমাকে যেন কেহ রাজসাহীতে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছে। চাহিয়া দেখি আমাদের পাশের গ্রামের কানাইদা। আমি যে বছর স্কুলে ভরতি হই সেই বছর কানাইদা স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার স্কুল ছাড়িবার ইতিহাস বড় মজার। কানাইদা সে বছর খুব সম্ভব ম্যাট্রিকুলেসনের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছে। সে স্বভাবত ছেলেবেলা হইতে ধর্ম পরায়ণ। স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শে সে চলিবার চেষ্টা করিত এবং কথাবার্তায় স্বামীজির উদাহরণ দিত। সেইজন্য তাহার বন্ধু বান্ধব এমন কি স্কুলের শিক্ষকরা পর্য্যন্ত তাহাকে স্বামীজি বলিয়া ডাকিত। একদিন কানাইদার ক্লাসে পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত পড়াইবার সময় পড়াইতে লাগিলেন—'স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে অস্য দগ্ধোদরোস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ' আপনা হতে বনে যে শাক জন্মায় তাহা খাইয়া যখন জীবন ধারণ করা চলে তখন পোড়া পেটের জন্য কে এমন মর্খ আছে যে মৃহৎ পাপকার্য্য করিবে? এই শ্লোক ব্যাখ্যাসমেত পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই শ্লোক শুনিয়া কানাইদার মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, সে স্কুল হইতে আর বাড়ী ফিরিল না'একেবারে নিরুদ্দেশ। কানাইদার পিতামাতা কেহ জীবিত ছিল না। বড় দাদা ও ভ্রাতৃজায়া দুই একদিন এখানে সেখানে খোঁজ খবর করিয়া কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া গেল।

দীর্ঘ দুই বৎসর পর কানাইদা গৃহে ফিরিল। 'স্বচ্ছন্দ বনজাতেন'

আহার করিয়া সাবেক চেহারার অর্ধেক লইয়া ফিরিল। আমরা সব কানাইদা সাধু হইয়াছে শুনিয়া দেখিতে গেলাম। কানাইদা বৈঠকখানা ঘরে একটি কম্বল পাতিয়া বসিয়া আছে। ঊর্ধদৃষ্টি যেন বাহ্যজ্ঞান রোহিত। মাঝে মাঝে আগন্তুকদের এক একবার দৃষ্টি নত করিয়া দেখিতেছে এবং ইঙ্গিতে বসিতে অনুরোধ করিতেছে। কেবলমাত্র বৈকালে কিছু তত্ত্বকথা শোনায়। একদিন বৈকালে কানাইদার তত্ত্বকথা শুনিতে গেলাম। আমাকে দেখিয়া কানাইদা বলিল "তোর হবে তোর হবে!" একজন বয়স্কা মহিলা বলিল "সাধু বাবা ও আশীর্বাদ আর ক'র না—ও মায়ের একটি ছেলে ওর আর সাধু সাধু হ'য়ে কাজ নাই।"

কানাইদা বলিল—"ওকি আমার কথায় হবে?—ওর যে সুকৃতি রয়েছে। ইড়া পীঙ্গলায় যে দিন ঘা পড়বে সহস্রারে সেদিন টান ধরবে সেদিন আর কে ঘরে রাখে ওকে? ওর পুরা সন্যাস যোগ রয়েছে।"

বৃদ্ধ দুই একজন মন্তব্য করিলেন—"বহুভাগ্য না হ'লে সন্যাস যোগ হয় না। আমরা নরকের কীট এই সংসারে পাঁক ঘাঁটবার জন্য বেঁচে রইলুম। তাঁর কৃপা আর আমাদের ভাগ্যে নাই।"

কানাইদা বলিল—"সবই তাঁর ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতেই সংসারে আপনাদের রতি। সবই তাঁর খেলা। যা তিনি করাচ্ছেন তাই হচ্ছে। তাঁকে নির্ভর করে থাকুন সংসার-বন্ধন তিনি ঘুচিয়ে দেবেন।"—এই বলিয়া কিছুক্ষণ ঊর্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস লইতে লাগিল। খুব সম্ভব ইড়া পীঙ্গলার খেলা দেখাইতে লাগিল। আমি ছেলে মানুষ অত তত্ত্ব বুঝি না। তবে এইটা সহজেই বুঝিলাম যাহারা বসিয়া আছেন তাহাদের মত নরকের কীট আমি নহি। 'আমার হবে'। কানাই দা বলিয়াছে 'আমার হবে।' তাই আগন্তুক নরকের কীটদের একবার উপেক্ষার সহিত দেখিয়া লইলাম। কানাইদার দাদা শম্ভু নিয়োগী বলিল—

"কানাই তুমি ত সংসারের মায়া ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে আমাদের কি ক'রে গেলে ?"

কানাইদা বলিল—"আমার উপর যদি তাঁর কৃপা হয় তোমাদেরও হবে।"

শম্ভু নিয়োগী বলিল—"তা ভাই তোমার উপর প্রভু কৃপা করলে কি আমরা বাকি থাকব। তবে যতদিন না কৃপা হয় ততদিন—"

একজন আগন্তুক বলিল—"ঠিক বলেছ শম্ভু—যতদিন না কৃপা হয় ততদিন ত অপেক্ষা ক'রে বসে থাকা যায় না। শম্ভু তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রেছে—তুমি সাধু হবে জানলে—"

শম্ভু বলিল—"তুমি ওকি বলছ বিপিনদা আমি আর কি খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলুম—ও ত বিষয়ের অংশীদার ও হক পাওনা থেকেই মানুষ হয়েছে—তবে কি না নিমাইয়ের উপর ত ভরসা করি না করি ওর ওপোর, ভাই ত নয় লক্ষণ।"

নিমাই শম্ভুর পুত্র। কানাইদা এই সকল কথায় কাণ দিল না। যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। আশু ভটচায্ বলিল—"ওর ভরসা আর মিছে। ও যে জিনিষ পেয়েছে ও আর তুচ্ছ বিষয় বৈভব নিয়ে থাকবে তুমিও যেমন শম্ভু ?"

শম্ভু অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিল—"আমার বুড়ো বয়সে কি হবে ?"

আশু ভটচায্ উত্তর করিল "কেন তোমার আর অভাব কি ? তোমার বাপের কি নাই ? তাছাড়া এখন কানাইয়ের ভাগ তুমি পাবে—এতে তোমার রাজার হালে চলে যাবে।"

—"ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলবেন না আশুদা—ওর অংশ যেন আমাকে না খেতে হয়—ও সংসারী হয়ে—"

কানাইদা হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া উঠিল—"প্রভু কি তোমার লীলা—এরা সংসার ছাড়া আর কিছু চিনলে না, প্রভু এদের তুমি উদ্ধার করার ভার না নিলে আর কে নেবে প্রভু।"

আশু বলিল—"সত্যই ত আমরা পাপীরও অধম—তবে কি জান ভাই তুমি ত সংসার ধর্ম করলে না—তা এর জ্বালা বুঝবে কি করে—আমরা যে জড়িয়ে মরেছি। যাই হোক ভাই তুমি ত উদ্ধার হয়ে গেলে—এখন শম্ভুকে—"

কানাইদা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"কি বলছেন—?" আশু আমতা আমতা করিয়া বলিল—"বলছিলুম বিষয় তোমার কাছে বিষের মত, তাই বলছিলুম মিথ্যে ও মায়ার বাঁধন রেখে কি হবে—শম্ভু মানুষ করেছে—"

কানাইদা বলিল—"আমাকে কি করতে হবে?"

"কিছু করতে হবে না। এই ভাইপোটার নামে লিখে দিলেই তুমি মুক্ত আর ছোঁড়াটারও আখের হয়।"

কানাইদা দ্বিরুক্তি না করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দিল। কানাইদা তারপর আবার কিছুদিনের জন্য উধাও। বছর চার পর কানাইদা পুনরায় ফিরিল কিন্তু এবার আর একা ফিরিল না। একেবারে সস্ত্রীক ফিরিল। কানাইদা অবশ্য অনিচ্ছা সত্বেও বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে—কি করিবে গুরুর আদেশ। কানাইদার গুরু তাহার কোন এক শিষ্যের কন্যাদায় লাঘব করিবার জন্য কানাইকে আদেশ করেন।

"আমি বলছি—ভগবানের ইচ্ছা তুই সংসারী হ; গৌরী তোর জন্য জন্ম জন্ম তপস্যা করেছে—তাকে তুই ছাড়লে কি হবে—সে যে ছাড়বে না"—গুরুদেবের আদেশে গৌরীর পিতা গৌরী দান করিয়া কানাইদাকে উদ্ধার করিলেন। কানাইদা সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিয়া দুই একদিন ভ্রাতৃজায়ার আদর আপ্যায়ন খাইয়া অবশেষে যখন শুনিতে পাইল—কদিন আর পরের বোঝা বওয়া যায়—একটা নয় দু দুটো মানুষ। কানাইদা এই কথা শুনিয়া গৌরীকে লইয়া অজানা পথে রওনা হইল যাইবার সময় শম্ভুজায়া

অবশ্য অনুরোধ করিল—"আর দু একদিন থাকলে হত না—আমরা কি পর হয়ে গেনু তোমার—"

কানাইদা কোথায় গেল কেহ আর সন্ধান লওয়া দরকার মনে করে নাই। কানাইদাকে ষ্টীমারে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"তুমি কানাইদা এখানে?"

কানাইদা বলিল—"তোর বৌদিকে ওর বাপের বাড়ী হ'তে আনতে গিয়েছিলুম প্রেমতলিতে আমার শ্বশুর বাড়ী কি না?—ওগো এই দেখ ভাবছিলে একা কি করে কি হবে, আমাদের মাণিক রয়েছে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।"

চাহিয়া দেখিলাম একটি অবগুণ্ঠনবতী মহিলা অদূরে বসিয়া।

—"ওকে ঘোমটা কেন? ও তোমার ঠাকুরপো হয়।" কানাইদার কথায় কানাইদার স্ত্রী ঘোমটা খুলিয়া সকৌতুকে আমার দিকে চাহিল। চমৎকার দুইটী চোখ একখানি সুন্দর মুখকে অধিকতর সুন্দর করিয়াছে। চোখ দুইটিকে একখানি সুন্দর বদনে বসাইবার জন্য বিধাতা যেন নিভৃতে আপনমনে ঐ বদনমণ্ডল নিজ হস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছে। কানাইদার চেহারা দেখিয়া মনে হইল ইড়া পিঙ্গলা বেশ ঢিলা হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র গুরুদেবের আশীর্বাদের জোরে জীবন রথের চাকাকে কোনরূপে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। গুরুর কৃপায় কানাইদার এই দশা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। কিন্তু কানাইদার স্ত্রীকে দেখিয়া মনে হইল গুরুদেব এই দিকে কানাইদাকে অকৃপণ-ভাবে আশীর্বাদ করিয়াছেন। বহুভাগ্যে এরূপ সুন্দরী স্ত্রী মেলে। অবাক হইয়া কানাইদার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। সেদিন কানাইদার বোঝা আমি বহিয়া লইয়া কোন প্রকারে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিলাম। মোট পুটলি যাহা ছিল সবই প্রায় আমার স্কন্ধে ভর করিল। কারণ কানাইদা কুলি করিতে নারাজ। আমার জিনিষ পত্র কুলির মাথায় তুলিয়া দিয়া কানাই-দার জিনিষপত্র নিজের মাথায় লইয়া সেদিন কলিকাতায় পৌছিয়াছিলাম। আমিও ভাগ্যবান বলিতে হইবে। কানাইদাকে সঙ্গে পাইয়া কলিকাতায় কোথায় উঠিব সে ভাবনা হইতে আপাততঃ রেহাই পাইলাম। শিয়ালদহ হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা গোয়াবাগান রওনা হইলাম। সেইখানেই কানাইদার বাসা। ইতিপূর্বে কলিকাতায় কখনও আসি নাই। বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর রাজপথে অসংখ্য সুসজ্জিত বিপণি শ্রেণী, বিচিত্র যানবাহন দেখিয়া আমি যেন বিভ্রান্ত হইয়া গেলাম। অসংখ্য নরনারী পথে চলিতেছে। এক সঙ্গে এত লোক কখনও কোথাও দেখি নাই। মানুষ বনে পথ হারাইয়া ফেলে এইরূপ গল্প শুনিয়াছি কিন্তু এই লোকারণ্যে যে মানুষ হারাইয়া যাইতে পারে তাহা জানিতাম না।

গোয়াবাগানে গাড়ী পৌছিল। যেখানে গাড়ী দাঁড়াইল সেখান হইতে কানাইদার বাসা একটু দূরে। বাসার নিকট পর্যন্ত গাড়ী যায় না। আমরা একটি এঁদো গলি দিয়া কানাইদার বাসায় পৌছিলাম। যে সব বৃহৎ অট্টালিকা দেখিয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম ঐরূপ কোন একটি অট্টালিকায় কানাইদার বাসা হইবে। কিন্তু একি! এমন স্থানে আসিয়া উঠিলাম সেখানে মানুষ বাস করিতে পারে নেহাৎ চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কানাইদার বাসা গোয়াবাগানের একটি বস্তির মধ্যে। যে বাড়ীটার মধ্যে কানাইদা থাকে সেটির টিনের দেয়াল এবং খোলার চাল। বাড়ীটার মধ্যে অন্যুন বিশটি পরিবার বাস করিতেছে। আমাদের

দেশে দরিদ্র বাগ্দি প্রভৃতির পল্লী এত নোংরা বা এরূপ একই বাড়ীতে বহুলোক বসবাস করিতে দেখি নাই। সেখানে পৌঁছিয়া কেমন যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। এই বাড়ীতে আমাকে আশ্রয় লইতে হইবে? রাজসাহীর বাড়ী, দেশের বাড়ীর কথা স্মরণ হইয়া চোখ ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম হইল। কলিকাতায় যে এত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলাম তবে ইহাতে বাস করে কাহারা? কানাইদা যে ঘরটীতে থাকে সে ঘরটীতে দেখি ডবল তালা লাগান। কানাইদা অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া পাশের একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল আমার তালার উপর তালা দিল কে? কানাইদার বাক্যস্ফূর্তি হইতে না হইতেই অদূরে একটি মহিলা বসিয়াছিল বলিল—"ছ মাসের ভাড়া বাকি—যাবার সময় বলে দিই নাই যে ভাড়া মিটিয়ে তবে ঘরে ঢুকতে পাবে?" কানাইদা বলিল—"তা আগে আমাদের জিনিষপত্র ঢুকিয়ে রাখতে দাও তারপর যা হয় ব্যবস্থা করছি।"

—"ব্যবস্থা কি আবার, ন'শ পঞ্চাশ টাকা নয়, মাসে আড়াইটা ক'রে টাকা তাও বাকি—ওসব চলবে না পনেরটা টাকা ফেলে দিয়ে কথা কও।"

—"আমি বাড়ীওয়ালার সঙ্গে যা হোক ব্যবস্থা ক'রব—এখন চাবিটা দাও লক্ষী"—কানাইদা উত্তর করিল।

মহিলাটি সরোষে জবাব দিল—"বাড়ীওয়ালা কি ব্যবস্থা করবে—তার দোষেই ত আজ এত বাড়ী ভাড়া পড়ে গেছে। তার মায়ার শরীর আমার অত মায়া দয়া নাই—ভাড়া মিটিয়ে দিলেই এখুনি চাবি খুলে দিচ্ছি।"

কানাইদা ও বাড়ীওয়ালির কথাবার্তায় অনেক লোক জড় হইয়া গেল। লোক অবশ্য কেহ রাস্তা হইতে আসে নাই সকলেই বাড়ীওয়ালির প্রজা। কানাইদার যে ভাড়া বাকি ফেলা অভ্যাস সকলে এই কথাই কানাইদাকে বোঝাইতে লাগিল—তাহারা পেটে না খাইয়া তবু মাস কাবার হইতে না

হইতে ভাড়া মিটাইয়া দেয়। কানাইদা অবশ্য তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিল না। অর্থাৎ সেই যেন বাড়ী ভাড়া বাকি রাখে অথচ একটু আগেই শুনিয়াছি বাড়ীওয়ালার বেকুবির ফলে সকলেরই প্রায় বাড়ী ভাড়া বাকি। প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন কানাইদা কোন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। তখন বৌদি বাড়ীওয়ালিকে হাত জোড় করিয়া বলিল—"দাও দিদি তালাটা খুলে দাও—এই ত্থাখ আমার ঠাকুরপো এসেছে—অনেক লেখাপড়া শিখেছে মস্ত বড় চাকরি ক'রবে এখানে থেকে তখন তোমার ভাড়া মিটুতে আর বেগ পেতে হবে না।" বৌদির উপস্থিত বুদ্ধির মনে মনে তারিফ করিতে লাগিলাম—মনে করিলাম বাড়ীওয়ালির আর ভাড়া না পাইবার কারণ নাই—অতঃপর চাবিটা খুলিয়া না দেওয়া অন্যায়।

বাড়ীওয়ালি নরম হইয়া উত্তর করিল "বেশ ত দিদি তোমার ঠাকুরপো ত আমার মান রেখে দু'মাসের ভাড়াটা জমা দিতে পারে—আমিই কি বলেছি ঘর খুলে দেব না।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাড়ীওয়ালিকে দিয়া দিলাম। বাড়ীওয়ালি হাসিয়া চাবি আনিয়া দিয়া বলিল—"দেখ বাবু বড় চাকরি হলে বড় বাড়ীতে যেন উঠে যেও না। আমার বাড়ীতেও বড় বড় চাকরে সব থাকে। নয় গো? ঐ যে হীরালাল বাবু যে পোষ্টাপিস থেকে সবাইকে চিঠি দিয়ে বেড়ায়—গভরমেণ্টোর চাকরে?"

বৌদি উত্তর করিল—"না ও আর যাবে কোথায়—ও ত আমাদের আপনার লোক ওকে কোথাও যেতে দেব না।" এই স্থানে প্রবেশ করিয়া অবধি মনটা কেমন যেন পালাই পালাই করিতেছিল কানাইদাও আমার আত্মীয় নয় এবং এই জঘন্য পল্লীতে একদণ্ডও থাকিতে পারিব এমন কথা মনেও স্থান দিই নাই। বৌদি হাসিয়া বলিল—"কি ঠাকুরপো আমাদিগকে ছেড়ে ভাল বাড়ীতে চলে যাবে?" মুখ দিয়া অজ্ঞাতে বাহির

হইয়া গেল—"না তা ছেড়ে চ'লে যাব না, তবে কিনা এখানেও থাকতে পারব না।"

বৌদি আহত স্বরে জবাব দিল "তা জানি—এখানে কি মানুষে থাকতে পারে—নেহাৎ অভাগ্য না হ'লে—"

আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম—"তা ঠিক নয় আমি শুু কলকাতায় বেড়াতে এসেছি। দু চারদিন বেড়িয়ে বাড়ী চলে যাব। তবে যতদিন আছি এখানেই থাকব।"

বাড়ীওয়ালা ঘর খুলিয়া দিল। একটী অপ্রশস্ত কক্ষ একদিকে একটি ছোট চৌকী কোন প্রকারে দুইজন লোক শুইতে পারে। চৌকির নীচে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রাখা এই স্থানটী ভাঁড়ার ঘররূপে ব্যবহৃত হয় সেইজন্য চৌকিটীকে ইট দিয়া বেশ একটু উঁচু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেঝের বাকি অংশে রান্নার সরঞ্জাম জলের কলসী ইত্যাদি রহিয়াছে। তোলা উনানে রান্না হয় রান্নার পর উনানটী উঠানে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কক্ষের সামনে কক্ষের মাপ অনুযায়ী একটী অপ্রশস্ত বারান্দা ততটুকু স্থান জুড়িয়া কাট ঘুঁটে কয়লা এবং অপ্রয়োজনীয় জঞ্জালে ভরতি। যদিও ঘরে একটী ছোট্ট জানালা আছে তথাপি ঘর বেশ অন্ধকার বাতাস কোনকালে প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। এই ঘরে কানাইদা তাহার ঘরণী লইয়া বাস করে। কি করিয়া বাস করে তাহা ভগবান জানেন; এই স্থানে তৃতীয় ব্যক্তির কি করিয়া স্থান হইতে পারে বুঝিতে পারিলাম না। অথচ বৌদির কি আকুল আগ্রহ যে আমি স্থায়ীভাবে তাহাদের গৃহে অতিথি হইয়া যাই।

বৌদি তাড়াতাড়ি চৌকির উপর বিছানা পাতিয়া দিয়া বলিল—"বোস ঠাকুরপো একটু জিরিয়ে নাও—তোমাকে অনেক কষ্ট দিলুম।" কানাইদাকে বলিল—"চট্‌ ক'রে বাজার ক'রে নিয়ে এস—আমি ততক্ষণ সব গুছিয়ে নিই—মাছ এন যেন—তোমারই ভাই—নয়ত নিন্দে হবে।"

কানাইদা বৌদির কথায় হাসিয়া বলিল—"সে আক্কেল আমার আছে। তোমাকে আর অত বলতে হবে না। তাছাড়া মাণিক ত আমাদের মত গরীবের ঘরের ছেলে নয়—যে শাক্ দিয়ে"—। 'স্বচ্ছন্দ বনজাতেন'—শাকের কথা মনে পড়িয়া গেল। ভগবান অন্তর্যামি, যে যা চায় তাহার সেই ইচ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন—খুব সম্ভব ভগবান সেইজন্য কানাইদার শাকাহারের ব্যবস্থাটা যাহাতে পাকাপাকি রকমে বরাবর চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কানাইদা বাজার করিতে চলিয়া গেল। বৌদি অতি তৎপরতার সহিত ঘর গোছাইতে লাগিল। বৌদি বলিল—"ঠাকুরপো তুমি ভাই লজ্জা করতে পাবে না। সারারাস্তা মুখ বুজে এসেছি—পেট ফেঁপে উঠছিল—তোমার মুখে একটা কথা নাই। মনে করলুম তুমি ত দাদার ভাই কি জানি মৌনি টৌনি গোছের সাধুও ত হ'তে পার?" এই বলিয়া একঝলক হাসিয়া লইল। অন্ধকার ঘরের একটা বিষাদময় আবহাওয়া আমার মনটাকে একরূপ অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। বৌদির হাসিতে মনটা অনেকটা হালকা হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম—যে ঘরে এতখানি অন্ধকার সেখানে যদি কোন রন্ধ্র পথে এতটুকু আনন্দের আলো না আসে তবে মানুষ বাঁচিবে কি করিয়া? মনটা হালকা হইলেও বৌদির কথার জবাব দিতে পারিলাম না। চুপ করিয়াই রহিলাম।

বৌদি বলিল—"কি উত্তর দিলে না যে—লজ্জা ক'রছে বুঝি"—এই বলিয়া আবার হাসিয়া উঠিল—

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এই পরিবেশে হাসি আসে কেমন করিয়া? আমাকে যদি এইখানে এমনিভাবে কাটাইতে হয় তবে হাসি ত দূরের কথা অশ্রুজলে এই বাড়ীখানা ভাসিয়া যাইবে। এখনই এখান হইতে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কানাইদাকে পৌছিয়া দিয়া এতক্ষণ পালাইয়া যাইতাম—কোথা হইতে এক পাতান বৌদি আসিয়া

আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। পালাইতেও পারিতেছি না এবং থাকিয়াও শান্তি পাইতেছি না।

বৌদি আবার হাসিয়া বলিল—"আমায় উপর রাগ ক'রেছ বোধ হয়। বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই পাঁচটা টাকা ধাপ্পা দিয়া দিয়ে নিলাম—।"

এরপর আর চুপ করিয়া থাকা চলে না পাঁচটী টাকা দিয়াছি একথা আমার মনেও হয় নাই। বলিলাম—"বৌদি বিয়ের সময় ত আমাকে কানাইদা নেমন্তন্ন করে নাই তা হ'লে তখন ত কিছু খরচ হতই। তাই না হয় আজ হ'ল।" কথাটা ঠিক মত বলা হইল না এই পরিবেশের এই কথাও নহে। তবুও একটা জবাব দিতে ত হইবে।

বৌদি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"তবে ওটা আমার মুখ দেখানি দিলে বল—তা কেমন বৌ দেখলে বলত?" আমার কেমন যেন লজ্জা হইতে লাগিল— কিছুতেই বৌদির সহজ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলাম না। বৌদি ভারি গলায় জবাব দিল—"যাই হোক টাকাটা যখন মুখ দেখানিই পেলুম তখন ধার শোধার দায় হ'তে রেহাই পেলুম।" আবার তখনই উচ্ছসিত হাসিতে প্রশ্ন করিল—"তা কেমন বৌ দেখলে বলত তোমার দাদার যোগ্য পাত্রি বলে মনে হ'চ্ছে?"

আমি বলিলাম—"সে কথা এখন ত আসে না দাদা আমার সাধু মানুষ, বৌ যখন জুটেছে তখন তার, পছন্দ অপছন্দর কথা ওঠে না। তার উপর তুমি ত দেখতে ভালই।"

—"শুধু ভালই—এর বেশী আর কিছু প্রশংসার নাই?"

—"প্রশংসার হয়ত অনেক'কিছু আছে—শুনে লাভ?"

—"শুনে লাভ নাই বলছ কি ঠাকুরপো? ঐটুকুই ত আমাদের প্রাপ্য কেমন বৌ হল পাঁচ জনা কি বলছে এই শুনেই ত আমাদের বাঁচতে হয়। তোমার দাদা অবশ্য তার বৌ পছন্দ হয়েছে কিনা জানায়

নাই। তাই তার ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করা তোমার দাদা ঠকেন নাই ত?”

বৌদির কথায় যেন কোথায় মস্ত বড় একটা জ্বালা আছে। কি যেন সে বলিতে চায়। কানাইদা আমার কেহ নহে। তাহার ঠকা জেতা আমার কাছে সমান বস্তু। কিন্তু বৌদির কথায় মনে হইল যেন কানাইদার অপরাধের কৈফিয়ত সে আমার কাছে চায়। এ যেন তাহার পূর্বাভাষ।

আমি বলিলাম—“তোমার মত বৌ আর কার না পছন্দ হয় বল?” কথাটা বলিয়া লজ্জা হইল—অন্য ভাবে এই কথা বলিলে চলিতে পারিত।

বৌদি ঠোঁট টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—“সত্যিই সকলেই বলে এমন রূপ কারও হয় না। অথচ ঠাকুরপো এমন রূপ কোন রাজপুত্রের ভাগ্যে জুটলো না সেই তোমার দাদার গলায় ঝুলতে হল—যে না জানে সংসার করতে, না জানে সুন্দরী বৌয়ের কদর করতে—দেড় দিন ধরে গরুর মত ষ্টীমারে ট্রেণে এসে কি কর্মভোগেই পড়েছি বল ত? সুন্দরী হ’লেই রাজপুত্র আসে না কি বল ঠাকুরপো?”

কথাটার মোড় ঘুরাইবার জন্য বলিলাম—“বৌদি কলিকাতায় না হয় একটা চাকরি জোগাড় ক’রে নেব তখন কি দাদা ভাইয়ে দুজনে মিলে একটা রাঙ্গা বৌয়ের যত্ন করতে পারব না—আপাততঃ আমার খিদে পেয়েছে তার ব্যবস্থা কর।”

বৌদি বলিল—“এখানে সব হবে কিন্তু যখন তখন খাওয়াটা হবে না—ওটা আমরা পছন্দও করি না। এখানে থাকতে হ’লে অনেক দুঃখ কপালে আছে—শুধু আমার মুখ দেখলে পেট ভরবে না। আমি আর তোমাকে এখানে আটকে রাখতে চাই না। আমাদের দুঃখের অংশীদার ক’রে তোমার জীবনকে বিষিয়ে দিতে চাই না। ষ্টীমারে দেখে মনে

হ'য়েছিল বেশ ছেলেটা যদি আমার কাছে থাকে অন্ততঃ কষ্টের মাঝেও খানিকটা আনন্দে কাটাতে পারব। কিন্তু বিধাতার তা ইচ্ছা নয়। তুমি কোন দুঃখে আমাদের দুঃখের বোঝা বইতে যাবে ঠাকুরপো ?"

এ কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না—তবুও একটা জোর করিয়া উত্তর দিতে গেলাম এই ভাবিয়া অন্ততঃ বৌদির কথা বন্ধ করিতে পারিব—বলিলাম—"একখানা সুন্দর মুখের ত অনেক দাম তা যদি খুব কম মূল্যেই পাওয়া যায় তবে আমিই বা ছেড়ে দেব কেন ? আমিও এখানে মৌরসীপত্তন হ'য়ে থেকে গেলাম।" বৌদি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিল—"পারবে ঠাকুরপো এতখানি সইতে পারবে— ?

—"তোমরা পার আর আমি পারব না ?"

দুই বিন্দু অশ্রু বৌদির কপোল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। আমার চোখেও অশ্রু বাধা থামিল না। বৌদি চোখ মুছিয়া বলিল—"পাগল ছেলে এতটুকুতেই কেঁদে ফেল্লে—এখন উঠে মুখ হাত ধুয়ে ঐ মোড়ের কাছে চায়ের দোকান আছে যেয়ে চা খেয়ে এস—কেমন ?"—এই বলিয়া বৌদি কলে জল আনিতে বালতি লইয়া রওনা হইল।

বৌদি জল লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—"কি এখনও বসে রয়েছ যে নাও মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে এস।" আমি বলিলাম—"আমি স্নান এবং পূজা না করে কিছু খাই না।"

বৌদি চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল কি যেন ভাবিতেছে। একটু পরে অত্যন্ত বিষাদমাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর পূজো কেন কর ঠাকুরপো ? কে তোমায় এ সব ক'রতে ব'লে ?" তিন বৎসর পূর্বে একটা দিনের কথা ক্ষণেকের জন্য মনে পড়িয়া গেল। মণিকাকে উপলক্ষ করিয়া সেদিন হইতে নিতান্ত ছেলেমানুষী করিয়া এই ঠাকুর পূজার ভাণ করিয়া আসিতেছি। দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া দুইটা সেবাপরায়ণা

হস্ত আমার পূজার আয়োজন করিত। সেই হস্ত দুইটী আজ আর পূজার আয়োজন করিতে ব্যস্ত নাই। যে বিধাতাকে কোন দিন ডাকি নাই কেবল ডাকার ভাণ করিয়াছিলাম সেই বিধাতাই এখন নিষ্ঠুর প্রতিশোধ লইয়াছে। বিধাতাকে চাহি নাই, মণিকাকে চাহিয়াছিলাম তাই বুঝি অন্তর্যামি মণিকাকে সরাইয়া নিজে আসন পাতিয়া পূজা চাহিতেছেন। মনে মনে বিধাতার উদ্দেশ্যে বলিলাম—'অন্তর্যামি এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তাই হোক মণিকাকে আমি আর চাহিব না এখন হইতে তুমিই আমার নিত্য সাথী হইয়া থাক।' অলক্ষ্যে কখন দুই বিন্দু অশ্রু চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল জানিনা বৌদি লক্ষ করিয়া বলিল "ঠাকুরপো কার জন্য কাঁদছ তুমি? কি তোমার দুঃখ— ?" ইচ্ছা থাকিলেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না চোখ ফাটিয়া বন্যার প্লাবনের মত বুক ভাসাইয়া দিল। আমার কান্না দেখিয়া বৌদিরও চোখে জল আসিল। কান্নার কারণ সে জানে না, বৌদি মনে করিল আমি পূজা করার প্রশ্নে দুঃখ পাইয়া কাঁদিতেছি—তাই শুষ্ক মুখে বলিল—"ঠাকুর পূজা করতে আর কাউকে দিতে ইচ্ছে নাই। তোমার দাদা ত দিবারাত্র ভগবানের নাম নিয়ে আছে কই ভগবান ত তার দুঃখের কথা শোনেন না। তুমি ত জান না ঠাকুরপো কি আকুল আগ্রহ নিয়েই ভগবানকে সে ডাকে, ভগবান যদি থাকতেন তবে সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারতেন না। তুমি যদি তার করুণ ডাক শোন তবে তোমার বুক ফেটে যাবে ঠাকুরপো, কই ভগবান ত—না ঠাকুরপো—ভগবান নেই, নিশ্চয়ই নেই। তুমি আমার নিজের ঠাকুরপো নও, পরিচয়ও সবে এই হল—তা হোক আমি তোমাকে ঠাকুর পূজা ক'রতে দেব না অন্ততঃ আমার এখানে যতদিন আছ ততদিন দেব না। এ সব পাগলামি আমি থাকতে হ'তে দেব না। একজন পাগলকে নিয়ে আমার জীবন ছারখার হ'য়ে গেল—আর কোন হতভাগীর ভাগ্যে যেন এ যন্ত্রণা না জোটে তাই আমাকে দেখতে হবে।"

বৌদির সহিত পরিচয় মাত্র বলিতে গেলে একটি রাত ও প্রাতঃকাল মিলিয়া বড় জোর চৌদ্দঘণ্টার। ইহার মধ্যে তাহার আমার উপর এতখানি দাবী সত্যই বিস্ময়জনক। তাহার জীবন একজন পাগলকে লইয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে তাই সে অন্য কোন হতভাগিনীর জীবন আর ছারখার হইতে দিতে রাজী নয়। তা না হোক আমার পূজা আহ্নিক বন্ধ করিবার অধিকার এত অল্প সময়ে সে পাইল কোথায়? যেখানেই পাক অতি অল্প সময়েই অনেকখানি দাবী আমার কাছে সে করিয়াছিল। ইহা অস্বাভাবিক হইলেও সত্য। মানুষের জীবনে দেখা যায় একজনের সহিত প্রথম আলাপেই যেন মনে হয় চিরপরিচিত, অনেকদিনের আপনজন —আবার এও দেখা যায় একজনের সহিত দীর্ঘ দিনের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তাহার সহিত পরিচয় হয় নাই এমনই যেন মনের ব্যবধান। অল্পক্ষণ হইলেও বৌদি আমাকে তাহার পরমাত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার কারণও ছিল। কানাইদার ধর্মপরায়ণতা তাহাকে সাংসারিক মাধুর্য হইতে অনেকখানি দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই যেন কোন নূতন অবলম্বন কাছে পাইতেই হাত পাতিয়া লুফিয়া লইতে সে চাহিয়াছিল। দরিদ্র ব্যক্তির আপনজনও তাহাকে ত্যাগ করে। কানাইদার সেইজন্য কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না। ষ্টীমার হইতে কলিকাতা পৌছান পর্যন্ত আমাকে সাথী পাইয়া, শুধু সাথী কেন ঠিক নিজের লোকের মত ব্যবহার পাইয়া বৌদি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের আপনজন ভাবিয়াছিল। তাই অল্প সময়ের পরিচয়ের জড়তা তাহাকে আড়ষ্ট করে নাই। সে তাহার দুঃখের একজন অংশীদার জুটিয়াছে এইরূপ মনে করিয়াই অতি সহজেই তাহার দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ বেদনা প্রকাশ করিয়া

হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া যেন সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে তাই ভালবাসার সহজ দাবী লইয়াই সে বলিয়াছিল—"একজন পাগলকে নিয়ে আমার জীবন ছারখার হ'য়ে গেল—আর কোন হতভাগীর ভাগ্যে যেন এ যন্ত্রণা না জোটে তাই আমাকে দেখতে হবে।"

বৌদির মুখের দিকে চাহিলাম—ভগবানের উপর কতখানি বিশ্বাস হারাইলে এইরূপ হয় সেদিন বৌদির মুখে যে প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি আজও তাহা স্মরণ আছে। কানাইদার দেবতা আছে। দেবতা থাকুক বা না থাকুক কল্পিত অন্তর্যামিকে অবলম্বন করিয়া কোনরূপে সংসার সমুদ্রে সে পাড়ি জমাইয়াছে। কিন্তু বৌদি কি করিয়া এই তরঙ্গসঙ্কুল ভীষণ সমুদ্র পার হইবে? সে ভগবান মানে না। কানাইদাকে অবলম্বন করিয়া সে সংসার সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু ভাগ্যদোষে সে যে তরণীতে আশ্রয় লইয়াছিল তাহা ফুটা।

বৌদিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম—"বৌদি বামুনের ছেলে পূজো আহ্নিক করা আমাদের পেশা। ভগবান থাকুক বা না থাকুক ওগুলো আমাদের চালিয়ে যেতে হয়।"—

"না ঠাকুরপো পূজো আমি ক'রতে দেব না। তোমার ভগবানের নামে চোখে জল দেখছি। কোন হতভাগীকে আবার চিরজীবন কাঁদাবে তার ঠিক নাই। আমি তা হতে দেব না। যাও মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে এস।"

বৌদির কথায় হাসিয়া উঠিলাম। "বেশ ত মজা এক দিনের পরিচয় এখনও হয় নাই—এরই মধ্যে আমার এত বছরের পুরাণ বন্ধুকে ছেড়ে দিতে বল?—জান ত শাস্ত্রে মেয়েদের সম্বন্ধে কি বলেছ—'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী'—এখন দেখছি সত্যই কানাইদা এক বাঘিনী পুষেছে।"

বৌদি হাসিয়া বলিল—"শাস্ত্রের মুখে আগুন, সব মিছে—বাঘিনী হলে এতক্ষণে তোমার দাদার ঘাড় মুটকে—"

—'তাই দাদাকে কায়দা না করতে পেরে ভাইয়ের ঘাড়টা নরম কি না দেখছ? তা যাই বল বৌদি দাদার মত আমার শক্ত ঘাড় নয়। পূজো ফুজো আমার ভালও লাগে না। যার জন্যে করা সে ত একরকম বিসর্জন দিয়ে এসেছি—"

বৌদি বিষাদমাখা কণ্ঠে বলিল—"কি হবে ঠাকুর পূজো ক'রে যেটি তুমি চাইবে সেটি তোমার কাছ হতে আগে সরিয়ে নেবে।"

—"ঠিক বলেছ বৌদি—এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। ঠিক যা তাঁর কাছে চাওয়া যাবে তাই তিনি লুকিয়ে রেখে দেবেন। আমি আর ও ঝকমারিতে নাই। আজ হ'তে তুমিই আমার গুরু হলে। যতদিন থাকব তোমার কথা মত চলব।"

—"আর চলে গেলে গুরুর কথা ভুলে যাবে বুঝি?"

—"রাম বল তা কখনও ভুলতে পারি—এক ঘণ্টার মধ্যে তুমি আমার সব ওলট পালট ক'রে দিলে আর তোমাকে ভুলব?"

কানাইদা বাজার করিয়া ফিরিয়া বলিল—"তাইত মাণিক খেতে পারবি কি? কাটা মাছের যে দর বললে যে আর হাত দিতে পারলুম না। আর একজনের জন্য গোটা মাছ এনে কি ক'রব?"

উত্তর করিলাম—"কেন বৌদি কি মাছ খায় না?" বৌদি উত্তর করল—"সে কি আমি কি বিধবা যে মাছ খাব না? একাদশীর দিন এক টুকরো খাই।"

অভাব অনটনের সহিত পরিচয় ছিল না। বড় লোক না হইলেও নিতান্ত দরিদ্র লোকও নহি। সাদাসিদে প্রয়োজনীয় জিনিষ অক্লেশে জুটিয়া যায়, ইহার জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। তাই এমন একটা অভাবের পরিচয় পাইয়া একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেলাম। কেমন করিয়া ইহারা এই অভাবের বোঝা মাথায় লইয়া চলে তাহা কল্পনাও করিতে পারিলাম না। অভাবকে এমন মুখোমুখি ভাবে কখনও দেখি নাই। একঘণ্টা

কথাবার্তায় বৌদির সহিত অনেকটা আত্মীয়তা হইয়া গিয়াছিল তাই বলিলাম—"নাই বা মাছ হল বৌদি মাছ না হলে কি ভাত খাওয়া যায় না? আমাকে যদি পর মনে কর তবে এখানে থাকতে পারব না। এখানে থাকলে তোমাদের আপনজন হ'য়ে যাতে থাকতে পারি তাই কর। মিথ্যে এক টুকরো মাছ দিয়ে তোমাদের স্নেহের মধ্যে প্রাচীর তুলে দিও না। যখন যেমন জুটবে তখন তেমনি খাব।"

বৌদি সজল নয়নে বলিল—"অগত্যা তাই খেতে হবে বই কি ভাই। সময় মত হয়ত উপোসও দিতে হবে। তা হোক আর আমার দুঃখ নাই। তুমি সত্যিকারের মাণিক—ঝুটো নয়।"

কানাইদা পরিহাস করিয়া বৌদিকে বলিল—"আর তুমি সত্যিকারের জহুরী তাই আসল মাণিক চিনতে পেরেছ।" কানাইদার পরিহাসে যে অস্বস্তিকর পরিবেশ ছিল তাহা কাটিয়া গেল।

বৌদি বলিল—"অন্তত তোমার চেয়ে যে আমি পাকা জহুরী সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। মাণিক তোমার ছাই চাপা ছিল। আমি তাকে ঝেড়ে মুছে বার করলুম। তবে দুঃখ এই যে মাণিক ত গরীবের ঘরে রাখার জিনিষ নয় তাই ভয় হয় কদিন এই জিনিষকে ঘরে ধ'রে রাখতে পারব?

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—"বৌদি কোন চিন্তা নাই এ মাণিক কেউ ঘরে তুলে নেবে না। তোমার মত কাঁচা জহুরী আর কেউ নাই দুনিয়ায় যে, কাচকে মাণিক বলে ঘরে তুলে নেবে। কানাইদা কেবল তোমার মান বাড়াবার জন্য তোমাকে জহুরী বলেছে—"

বৌদি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিল—"হলেই বা তুমি কাচ আমি ত বিক্রী করতে যাচ্ছি না। যারা কেনা বেচা করে তারাই কাচ কি মাণিক যাচাই করে। তুমি আমাদের কাছে অমূল্য। হারিয়ে না গেলে কেউ আমাদের কাছ হ'তে কিনে নিয়ে চলে যেতে পারবে না।" বৌদির

মুখের দিকে চাহিলাম। একজোড়া পদ্মের পাঁপড়ির উপর দুইবিন্দু শিশির ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলাম না। চৌকির উপর অপরিসর শয্যায় আমি ও কানাইদা, নীচে মেঝের সামান্য একটু জায়গায় বৌদি কোনরূপে হাত পা গুটাইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। ঠিক আমাদের পাশের ঘরে একজন বৃদ্ধ সারারাত্রি কাসিয়াছে। কাসির শব্দ এবং মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা-সূচক তীব্র চীৎকার শুধু নিদ্রা হরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। ইহাদের বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথা ভাবিয়া মনটাকে খুবই ভারাক্রান্ত করিয়াছিল। কানাইদা রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় উঠিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়া গেল। বৌদি যেমন শুইয়াছিল তেমনি শুইয়া রহিল। অনেক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বৌদি ডাকিল—"ঘুম ভাঙ্গল ঠাকুরপো?" আমি নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিলাম—"না এখনও ঠিক ভাঙ্গে নাই সারারাত ভাল ঘুম হয়নি কি না, তাই ভোরের বেলায় চোখ চাইতে পারছি না।"

বৌদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এ ভেড়ার গোয়ালে কি ঘুম হয় ঠাকুরপো? আমাদের সয়ে গেছে তাই!"

আমি বলিলাম—"না অসুবিধা আর হয় নাই তবে ঐ পাশের ঘরের কাসি—"

বৌদি ভারি গলায় জবাব দিল—"গ্যাখ ঠাকুরপো গরীবের প্রাণ বড় কঠোর—ঐ যে কবরেজ মশায় বছরের দু তিন বার হাঁপ আটকে মরমর হ'য়ে যায় আবার বেঁচেও ওঠে, মরে গেলে যে নিশ্চিন্ত হয় তা হবার জো নাই। তোমাদের ভগবানের সেটুকু দয়াও নাই।"

কবিরাজ মহাশয় মরিয়া গেলে নিস্তার পান কি না তাঁহার সংসারের ততখানি পরিচয় পাই নাই—তাই বলিলাম—"হ্যাঁ হাঁপানি বড় কষ্টকর রোগ।"

বৌদি হাসিয়া বলিল—"হাঁপানি কষ্টকর রোগ কি না সে কথা বলছি না। অভাবের চেয়ে কষ্ট আর কিছুই নাই। বুড়ো যখন ভাল থাকে তখন মকরধ্বজ ফিরি ক'রে তবু দু চার আনা নিয়ে আসে আর যখন অসুখে পড়ে তখন কি করে চলে বলত?"

—"ওর সংসারে আর কে আছে বৌদি?"

—"ঐ যে মেয়েটা যে সারারাত পাখা করছিল।" একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে শোনা যাইতে ছিল। বৌদি বলিয়া যাইতে লাগিল—"মকরধ্বজ বেচে দু চার আনা যা হয় তাতেই দিন চলা দায়, এর ওপর আবার কন্যাদায়। অমন মেয়ে আর হয় না ঠাকুরপো—মুখবুজে অভাবের সঙ্গে লড়ছে কোনদিন হাসি মুখ ছাড়া মুখ গোমড়া করতে দেখলুম না—আমাদেরও অভাব খুব ঠাকুরপো তবে ওদের মত নয়। ও রকম হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হত আমাকে।" কানাইদার চেয়েও অভাবী লোক তা হলে আছে?

অল্প সময়েই কানাইদার অভাবের আভাষ পাইয়াছিলাম কবিরাজ মহাশয়ের অভাব কিরূপ হইতে পারে ভাবিয়া পাইলাম না। বৌদি বলিয়া যাইতে লাগিল—"কতদিন ওদের হাঁড়ি চড়ে না। তা মেয়েটা কাউকে বলবে না যে একমুঠো চাল ধার দাও। যদি তুমি আমি জানতে পারলুম তবে যা হোক ব্যবস্থা করলুম, না পারলুম তবে সেদিন উপোষ দিয়ে কাটিয়ে দিলে।" বৌদি উচ্চস্বরে ডাকিল—"ওরে রাধা—কবিরাজ মশায় এখন কেমন? দেওয়ালের অপর প্রান্ত হইতে উত্তর আসিল—"ঠিক তেমনই আছে বৌদি—সারা রাত ঘুমুতে পারেন নাই। অফিং খাওয়া অভ্যাস আছে কি না, তা কাল অফিং ছিল না সেজন্য আরও ঘুমুতে পারেন নাই।" দিনের বেলায় রাধাকে দেখিয়াছি মনে হইল সতের আঠার বছর বয়সের বালিকা। কলের জল তুলিয়া দুই একটি ঘরে দিতেছিল।

আমি বলিলাম—"যে মেয়েটী সেই জল দিচ্ছিল— ?"

—হ্যাঁ হ্যাঁ সেইটী—ও তিন চার ঘরে জল তুলে মশলা পিসে দেয়—তাতেও কিছু হয়। নয়ত শুধু মকরধ্বজ বেচে পেট ভরে ঠাকুরপো ?"

—"ওর বাবা ছাড়া আর কে আছে বৌদি ?"

—"আর সাতকুলে কেউ নেই—ছেলে বেলায় মা মারা গেছে এখন বাপ আর বেটী—।"

—"ওর বাপ মারা গেলে তখন কি হবে ?"

—"ঐ যে তোমাদের ভগবান আছে সে যা গতি করবে তাই হবে। ভগবান যে কেমন গতি করে তাত দেখতেই পাচ্ছ। তুমি ভাবছ বাপ মরে গেলে মেয়েটার কি হবে ? তুমি ত ওদের অভাব দেখ নাই ঠাকুরপো—রাধাই কতবার বলেছে তার বাপ মরে গেলে সে পরিত্রাণ পায় আর তার বাপও বলে রাধা মরে গেলে সে পরিত্রাণ পায়। বাপ মরে গেলে রাধার কি করে চলবে একথা ভাববার আগেই ভাবতে হয় যে, এত বড় দুঃসাধ্য ব্যাধি সারবে না কোন দিন। তার রোগের সেবা না হয় করা গেল ওষুধ বা পথ্য জুটবে কোথা হতে ?"

—"তা ঔষুধ কিছু খাচ্ছে না—"

—"আমরা বলি মকরধ্বজ যখন রয়েছে তখন একটু দাও না মেড়ে তোমার বাবাকে রাধা—তা বুড়ো কি ছাই খাবে ? বলে আমার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে—ও মকরধ্বজে যেন কেউ হাত না দেয়।'

তখনও প্রভাত হইতে দেরী আছে। মনে করিয়াছিলাম সকাল-বেলাটা অন্ততঃ একটা আনন্দময় পরিবেশে কাটিবে। কিন্তু মানুষের দুঃখের কথা শুনিয়া কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া গেলাম। সারারাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই। দিনে যে একটু ঘুমাইব সেরূপ নিরালা স্থানও কোথাও নাই। মনে হইল কোথাও পলাইয়া যাই। কিন্তু পলাইবার পথ খুঁজিয়া পাইলাম না। বৌদি, কানাইদা, রাধা, কবিরাজ

মহাশয় যেন আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেন বলিতেছে তুমি ত পলাইবে আমরা কোথায় যাইব? কে যেন আমার বুকটা চাপিয়া ধরিল—"বলিলাম বৌদি অন্য কথা বল—"

বৌদি হাসিয়া বলিল—"শুনে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? আমাদের ভাই ঐ সবই কথা। তার চেয়ে তোমার কথা বল বরং শোনা যাক্। আমাদের কথা ত অনেক শুনলে।"

ভাল আসর না হইলে গান জমে না। এই দুঃখের পরিবেশে সব কিছু যেন খেই হারা হইয়া গিয়াছে। নিজের যেন কোন কথা নাই। থাকিলেও যেন এখানে প্রকাশ করা চলে না। তাই চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

বৌদি বলিল—"কি ঘুমিয়ে গেলে না কি?"

উত্তর করিলাম—"না।"

বৌদি বলিল—"মণিকা কে ঠাকুরপো?"

মণিকার কথা বৌদি জিজ্ঞাসা করায় আশ্চর্য হইয়া গেলাম। অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু মণিকার কথা বলিয়াছি বলিয়া ত মনে হইতেছে না। আমি মণিকা বলিয়া কাহাকেও জানি একথা প্রকাশ না করিয়া বলিলাম—"মণিকা! কই বৌদি মণিকা বলে ত কাউকে জানি না।"

অন্ধকারে মনে হইল বৌদি হাসিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বলিল—"মণিকাকে তুমি শুধু চেন তা নয় সে, তোমার একান্ত আপন জন কেউ হবে।"

—"কি ক'রে জানলে?" বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৌদি উচ্ছসিত হাসিতে জবাব দিল—"আমি হাত গুণতে জানি।"

—"হাত গুণতে তুমি জান না বৌদি, এ কথা বলে আমাকে ভোলাবে আমি তত ছেলেমানুষ নই—কিন্তু মণিকা না কি নাম বললে সে রকম নাম আমি কখনও শুনেছি বলে ত মনে হয় না।"

—"না তা শুনবে কেন—নামটি ত তোমার জপমালা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি যে কতবার মণিকার নাম করেছ তার আর ইয়ত্তা নাই। কে এই মণিকা ঠাকুরপো? বড় শুনতে ইচ্ছে করছে।"

ঘুমের ঘোরে মণিকার নাম করিয়া থাকিব। বৌদি বলিল—"স্বপ্নে তুমি মণিকার সাথে কথা বলছিলে।"

তাই উত্তর করিলাম—"বৌদি যা স্বপ্ন তা আর বাস্তব জগতে কোথায় পাব? স্বপ্নের মণিকা স্বপ্নেই মিলিয়ে গেছে।" স্বপ্নকে সত্য মনে করে যারা জাগ্রত জগতে খুঁজে মরে আমি সে দলের লোক নহি। "স্বপ্নের মণিকা ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে, তোমার যদি গরজ থাকে তুমি তাহাকে খুঁজে দেখতে পার। আমি স্বপ্নের মণিকাকে ভুলে গেছি।"

বৌদি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না তাই দেখতে পাচ্ছি না স্বপ্নের মণিকার জন্য ক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। যাক্ মণিকা না থাকাই ভাল। যদি থাকে সে হতভাগী মাণিক হারা হ'য়ে যে কি ক'রে দিন কাটাচ্ছে তাই ভাবছি।"

মণিকার কথা চাপা দিবার জন্য বলিলাম—"বৌদি সকাল হ'লে একবার কাজের চেষ্টায় ঘুরতে হবে, বসে থাকলে ত আর চ'লবে না।"

বৌদি বলিল—"কেন তুমি রাজসাহী ফিরে যাবে না—? তুমি যে তোমার দাদাকে বললে বি, এ, পরীক্ষা দাও নাই?"—"না রাজসাহী আর যাব না। বি, এ পরীক্ষাও আর দেব না"—উত্তর করিলাম।

—"কেন মণিকা বুঝি পড়া শুনার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াল ঠাকুরপো—?"

বৌদির কথায় হাসি পাইল, বলিলাম—"কথার ছলে তুমি মণিকার পরিচয় নিচ্ছ। তোমরা দেখছি বড় হুঁসিয়ার জাত।"

—"আমরা যদি হুঁসিয়ারের জাতই হব তবে কি আর মণিকা

মাণিক হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয়? আর আমি আজ মাণিক পেয়েছি বলে গরব ক'রে মরছি একদিন দেখব আমিও মাণিকহারা হ'য়ে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি।"—বৌদি উত্তর করিল।

আমি বলিলাম—"কথাটা ঠিক নয় বৌদি—মাণিক বলে যারা মনে করেছিল তারাই দেখলে তা আসল মাণিক নয়। তাই ঝুটো জিনিষ রাখতে চাইলে না, ফেলে দিলে। তুমিও একদিন তাই ক'রবে। তখন আর যাই হোক মাণিক হারাণোর দুঃখ তোমার হবে না বরং ঝুটো জিনিষ জেনে ফেলে দিয়ে তৃপ্তিই পাবে।"

—"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো—এত কথা এই বয়সে শিখলে কি ক'রে বলত?"

—"তুমিই আর কোন আমার চেয়ে বয়সে বড় হবে, তুমিই অত কথার ছাঁদুনি শিখলে কোথা হ'তে?"

—"আমরা মেয়েরা অল্প বয়সেই বেশী পাকা হই কিনা? তাই শিখেছি।"

—"আমরা ছেলেরা যখন শিখি তখন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শিখি বৌদি। এই যে পাশ করি তাই কম মেহনত করতে হয়? আর এই কথার ছাঁদুনি দেখছ এর জন্য জীবনে কত ক্ষেত্রে যে ফেল করেছি তার আর ইয়ত্তা নাই। এখন যে কথা বলছি সে কথা বহুদিন ধরে বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিখতে হ'য়েছে।"

বৌদি কোন উত্তর করিল না। পাশের বাড়ী কবিরাজ মহাশয় জোরে কাসিয়া উঠিল। রাধারাণী চিৎকার করিয়া উঠিল—'বাবা'—'বাবা', কি কাতর কণ্ঠস্বর? বৌদি ডাকিল—রাধা কি হ'ল রে কবিরাজ মশায় একটু সামলিয়েছে। রাধারাণী জবাব করিল—"না তেমনিই সারা রাত কাসছেন—এক একবার দম বন্ধ হ'য়ে যাবার মত হচ্ছে।"

বৌদি উঠিয়া বসিল, বলিল—"না ঘুম আর হবে না। যাই কাজ কর্ম সেরে নিই গে।" বৌদি উঠিয়া গেল। কবিরাজ মহাশয়ের কাসি তখনও থামে নাই। রাধার পাখার শব্দ শোনা যাইতেছে। কানাইদার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অবধি নানাবিধ অভাবের পরিচয় পাইয়াছি। দারিদ্র্যের রূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। জীবন সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে কি কঠিন সংগ্রামই না করিতে হইতেছে। শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তাই নহে, তার উপর আছে রোগ। রাধারাণীকে ভাল করিয়া দেখি নাই। খুব সম্ভব মণিকার বয়সেরই হইবে। মণিকার বিরহ আমাকে কাতর করিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম আমার মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই, মণিকাকে পাইয়া হারাইতে হইল। এখন মনে হইতেছে মণিকার আর আমার প্রেম যেন নিছক বিলাসিতা। দুঃখের মূল্যে উহাকে কিনিতে হয় নাই—আপনা হইতে কুড়াইয়া পাওয়া বস্তু। রাধারাণী সেও ত কাহাকেও মণিকার মত ভালবাসিতে পারে? না না—পারে না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত নিত্য অভাব অনটন রোগের সহিত তাহাকে লড়িতে হয়। কাহাকেও ভালবাসিবার অবকাশ কোথায়? এই জগতে মণিকাও আছে, রাধারাণীও আছে। একজন হাসি, গানে, গল্পে দিন কাটাইতেছে অপরজন এরই মধ্যে জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৌদি বাহির হইতে ডাকিল—"ঠাকুরপো বেশ বেলা হ'য়ে গেছে উঠে পড়।"

শয্যাত্যাগ করিয়া কলের নিকট মুখ ধুইতে গেলাম—দেখিলাম অন্ততঃ বিশজন বিভিন্ন বয়সের নরনারী কলের কাছে অপেক্ষা করিতেছে। অধিকাংশই সল্পবাস পরিহিত কোনরূপে দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই বেশ নির্বিকার পোষাকের শালিনতার যেন ইহাদের প্রয়োজন নাই। আমি

বাহির হইয়াই আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। বৌদি বলিল—"আবার ঘর ঢুকলে যে—?"

আমি বলিলাম—"কলতলায় আমি যেতে পারব না।"

—"কে যেতে বলেছে—বারান্দায় বসে মুখ ধুয়ে নাও।"

—"বারান্দায় বসেও মুখ ধুতে পারব না এখান হ'তে কলতলা দেখা যাচ্ছে।"

বৌদি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"তোমার বুঝি ওদের দেখে লজ্জা হচ্ছে—ও কিছু না প্রথম প্রথম আমারও হয়েছিল তাছাড়া কলে যতক্ষণ জল থাকবে ততক্ষণ ঐ ভাবেই লোক দাঁড়িয়ে থাকবে। বেলা দশটা অবধি তুমি অমন করে ভেতরে বন্দী থাকতে পার না?"

—"কাকে কি বলছো বৌদি?" রাধারাণীর কণ্ঠস্বর।

—"ছাখ না ঠাকুরপো এসেছে তা কলতলায় মুখ ধুতে যাবে না, বাবুর লজ্জা হয়েছে ওদের সব কাপড় পরা দেখে।" বারান্দার দিকে চাহিলাম রাধারাণী বৌদির নিকট দাঁড়াইয়া আছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুন্দর স্বাস্থ্য। অনেক আগাছা যেমন বিনা যত্নে বাড়ে, রাধা যেন সেইরূপ পরিপূর্ণ ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঘষামাজা করিয়া সৌন্দর্য প্রকাশের প্রয়াস নাই। নিটোল স্বাস্থ্যই তাহাকে যেন সকল বিষয় মানান সই করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। সুন্দরী নহে তবুও তাহার নিকট হইতে চক্ষু ফিরাইতে মন চাহে না। একটি আধময়লা খাট লালপেড়ে শাড়ীতে শরীরের সকল অংশ ভালভাবে আবৃত করা যায় না। তবুও এমন সুন্দর করিয়া সেই শাড়ীটি পরিয়াছে যে দেখিলেই তাহার শালিনতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। রাধার মুখের দিকে চাহিলাম দেখিলাম একখানা কচি মুখ জীবন যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত হইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে।

রাধা বলিল—"তা বৌদি সবাই কি আমাদের মত পারে? ওঁর ত অভ্যাস নাই। আমি জল দিচ্ছি উনি ঘরের মুরির কাছে মুখ ধুয়ে

নিন।” রাধা মুখ ধুইবার জল দিয়া গেল। রাধার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। রাধারা যা পারে আমি তা পারি না।

২৪

বিচিত্র রকমের অধিবাসী কানাইদার বস্তিতে বাস করে। কানাইদার পাশের ঘর কবিরাজ মহাশয়ের, ঠিক তাহার পাশের ঘরে কয়েকজন চানাচুরওয়ালা সপরিবারে বাস করে। একই ঘরে দুই তিনটী পরিবার ছেলেপুলে লইয়া কি করিয়া বাস করে তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। শুধু বাস করে না, চানাচুর জাতীয় পণ্যদ্রব্যের সেটী একটী ছোট কারখানা বলিলেও চলে। তাহার পাশের দুইখানি ঘর লইয়া একটী ছোট টীনের সুটকেস তৈরীর কারখানা। ঐ কারখানার খানিকটা অংশ ঘেরিয়া কারখানার মালিক সপরিবারে বাস করে। তাহার পাশের ঘরে একজন প্রৌঢ়া রমণী বাস করে। আর একটি ঘরে একজন পোষ্টাপিসের পিওন সপরিবারে বাস করে। ঠিক তাহার পাশের ঘরে কয়েকজন হিন্দস্থানী মুটীয়া বাস করে। তাহার পাশের ঘরে কয়েকজন উড়িয়া পাচক বাসকরে। তাহার পাশের ঘরে একজন হিন্দুস্থানী নাম ভিখন সর্দার বাস করে। ভিখন সর্দার ছোট বেঁটে মত লোক। সে কি করে কেহ বলিতে পারে না। তাহার স্ত্রী লছিয়া ভিখনের অপেক্ষা অন্ততঃ চতুর্গুণ লম্বা চওড়া হইবে। লছিয়ার নিকট ভিখন যেন পাহাড়ের নিকট নুড়ি সদৃশ। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় এই ভিখনের প্রতাপে স্ত্রী লছিয়া একবারে সকল সময়েই তটস্থ। ভিখনের পাশের ঘরে কয়েকজন বিড়িওয়ালা দিবারাত্র বিড়ি বাঁধিতেছে। তাহার পাশের দুইখানা ঘর জুড়িয়া কানাইদার বাড়ীওয়ালা। বাড়ীওয়ালার পাশের ঘরটী তালাবদ্ধ। একজন ক্যানভাসার সেই ঘরে থাকে। মাসের

অধিকাংশ দিন সে কলিকাতার বাহিরে থাকে ; এইরূপ আরও কয়েকটী পরিবারও ঐ বস্তিতে স্থান পাইয়াছে। অন্যূন কুড়িটী পরিবার সেই বস্তিতে বাস করে। বস্তির মধ্যে মাত্র একটী কল ও একটী পায়খানা। ঐ বস্তির সকল অধিবাসীই যে কানাইদার মত দরিদ্র তাহা নহে বরং এমন অনেক লোক রহিয়াছে যাহারা রীতিমত পয়সাওয়ালা। তথাপি তাহারা ঐ বস্তিতে বাস করিতেছে কেন তাহা বলা কঠিন। তবে তাহাদের আচার ব্যবহার সবই দরিদ্র বস্তিবাসীর উপযোগী। যাহার পয়সা আছে তাহার পয়সার অহমিকা নাই এমন কি বেশভূষার এমন কোন তফাৎ নাই যে দরিদ্র অধিবাসীদের সহিত মেলে না। যদি কেহ সাজ পোষাক করে, তাহা কোন বিশেষ দিনে বিশেষ কারণে করে, নতুবা অন্যদিনে সবাই সমান। এতগুলি লোক একসঙ্গে বাস করে কি করিয়া না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যে একবারে হয় না তা নয়। কিন্তু বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পেশার লোক হইলেও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সুন্দর প্রীতির সম্পর্ক আছে। যাহার পয়সা আছে সে গরীব প্রতিবেশীর নিকট মাথা উঁচু করিয়া কথা বলে না বা যাহার পয়সা নাই তাহাকে কাহারও কাছে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয় না। ইহারা পরস্পর এমন একটা আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা যে বস্তি বাসের দুঃখ ইহাদের আদৌ স্পর্শ করে না।

সারা সকালটা কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে ঘুরিয়া আসিয়া বেশ একটু বেলা করিয়া ঘরে ফিরিলাম। বস্তির অধিকাংশ অধিবাসী তখন যে যার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। কেবল মহিলারা এবং সুটকেশের মিস্ত্রীরা রহিয়াছে। বস্তিটা অনেকটা ফাঁকা দেখিয়া একটু আরাম বোধ করিলাম। আমাকে আসিতে দেখিয়াই বৌদি বলিল—"বেলা বারটা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ঠাকুরপো ? আমি ত ভেবে অস্থির, মনে করলুম রাস্তা ভুলে

হারিয়ে গেলে নাকি ? নাও স্নান ক'রে নাও—কখন রান্না হ'য়ে গেছে—ভাত ঠাণ্ডা জল হ'য়ে গেছে ।"

স্নান করিয়া ভাত খাইতে বসিলাম। বৌদি পাখার বাতাস করিতে লাগিল। একটু আগেই বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। ফাঁকা জায়গা হইতে ঘিঞ্জী বস্তিতে মন ফিরিতে চায় নাই। কিন্তু বৌদির মধুর ব্যবহারে মনের বিরূপতা অনেকখানি কাটিয়া গেল। বৌদি জিজ্ঞাসা করিল—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে ঠাকুরপো ?

—"এমনি ঘুরছিলাম—।"

—"সেই সকাল থেকে বেলা বারটা পর্যন্ত এমনি ঘুরছিলে—আচ্ছা বোকা ছেলে ত, নাওয়া খাওয়া ভুলে এমনি ঘুরছিলে ?"

বৌদির প্রশ্নের জবাব করিলাম না। বৌদি পুনরায় বলিল—"হ্যাঁ ঠাকুরপো এখানে তোমার কষ্ট হ'চ্ছে খুব—নয় ?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করিলাম—"তোমাদেরও খুব কষ্ট হয়, নয় বৌদি ?"

বৌদি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কষ্ট, তা কষ্ট হ'লে কি আর উপায় আছে ঠাকুরপো ? তোমার দাদা ছাপাখানায় কাজ ক'রে কুড়িটাকা মাইনে পায় আর ওপরটাইম কাজ ক'রে আরও সাত আট টাকা পায়, এতে কেমন ক'রে চলে বলত ঠাকুরপো ? আর ওপরটাইম ত রোজ হয় না তাছাড়া মানুষের শরীরে সুখ অসুখ ত আছে। যদি অসুখ বিসুখে কামাই না হয় আর রোজ ওপরটাইম থাকে তবে একরকম কায়ক্লেশে কেটে যায় ।"

বৌদির সংসারের আর্থিক আয়ের খবর শুনিয়া কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না তবু বলিলাম—"এত কম আয়ে তোমাদের কি ক'রে চলে তাই ভাবা যায় না এর উপর আবার আমাকে ডেকে এনে অভাব বাড়ান কেন বৌদি ?"

—"অভাব ত আমাদের নিত্যসাথী—তোমার জন্য কি এমন

অভাব বেশী হবে। তাছাড়া তুমি পুরুষ মানুষ বসেই কি আর থাবে চিরকাল—?”

—“যদি বসেই খাই—তখন ত তাড়িয়ে দেবে বৌদি ?”

—“তাড়িয়ে দোব না ঠাকুরপো কখনও, খুদ কুঁড়ো যা জুটবে তাই ভাগ ক’রে খাব। তবে তুমি অত দুঃখ সইতে পারবে না, নিজেই আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।”

রাধা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাধা কখন আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখি নাই। রাধার হাসির মর্ম বুঝিতে দেরী হইল না। আমি দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না, আমি দুঃখের ভয়ে কাপুরুষের মত তাহাদের ফেলিয়া যাইব ইহাই রাধা ভাবিয়া থাকিবে। রাধার করুণামিশ্রিত হাসি যেন আমার দুর্বলতাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাই জোর করিয়া বলিলাম—“বৌদি এ আর এমন কি কষ্ট, এর চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি।” গোবর্ধনের কথা মনে হইয়া গেল। বিমাতার উপেক্ষা দরিদ্র সংসারের অভাব অনটনে তাহাকে কোনদিন অভিভূত হইতে দেখি নাই। বরং তাহা এমন সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছিল যে নিয়মিত আহার্য বা বস্ত্র পাইলে আমরা যেন ব্যতিক্রম মনে করিতাম। কই গোবর্ধনকে ত ইহার জন্য দুঃখ করিতে দেখি নাই বা তাহার দুঃখে আমরাও ত কষ্ট অনুভব করি নাই! তবে ইহাদের দুঃখ এমন করিয়া বাজিতেছে কেন? কোথায় যেন ইহার ব্যতিক্রম আছে। গোবর্ধনের দুঃখ ও রাধার দুঃখ যেন এক নহে। গোবর্ধনকে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু রাধাদের দুঃখ স্পর্শ করে।

আমি আহার সমাধা করিয়া হাত মুখ ধুইয়া ক্ষুদ্র চৌকিটীতে আশ্রয় লইলাম। বৌদি ও রাধা আমার পাতে ভাত বাড়িয়া একত্রে আহার করিতে বসিল। রাধার রান্না করিবার সময় নাই।

তাহার পিতার সেবা করিতে ও কয়েক ঘরের কাজ করার জন্য আর রাঁধিবার অবকাশ পায় নাই। দেখিলাম বৌদি নিজের ভাত ভাগ করিয়া রাধার সহিত খাইতেছে। সেইদিন প্রথম উপলব্ধি করিলাম ক্ষুধার অন্ন তাহারাই ভাগ করিয়া খাইতে পারে যাহাদের অন্নের সংস্থান নাই। যাহাদের আছে—তাহাদের কাঙ্গালপনা দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। খোকার পিসিমা দুইসের মণ্ডা হইতে একটি মণ্ডার ভগ্নাংশ আমাকে পরিবেশন করায় যে অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহা মনে পড়িয়া গেল। খোকাদের কোন অভাব নাই। সবই তাহাদের প্রচুর, কিন্তু সেদিন তাহাদের মধ্যে যে কাঙ্গালপনা দেখিয়াছি—তাহাতে ইহাদের ব্যবহার সত্যই বিস্ময়জনক। ক্ষুধার অন্ন যাহারা ভাগ করিয়া খাইতে পারে তাহারা গরীব হইলেও অন্তরে দীন নহে। খাওয়া শেষ করিয়া বৌদি চৌকির এক প্রান্তে আসিয়া বসিল। রাধা উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে লাগিল।

বৌদি বলিল—"কি ঘুম আসছে নাকি ?"

—"না। আমার দিনে ঘুমনো অভ্যাস নাই।"

—"তবে চুপ ক'রে শুয়ে রয়েছে যে"

—"কি করব তবে ?

—"কথা বল— ."

—"কি কথা বলব ;"

—"যা খুশী ."

আমি হাসিয়া বলিলাম—"অনেক কথা বলা হ'য়েছে—এখন কাজের কথা হোক।"

—"কি এমন কাজের কথা ঠাকুরপো ?"

—"আমি রাজসাহী হ'তে পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। এবার ত কিছু ক'রতে হবে ?"

—"পড়া ছেড়ে দিলে কেন ?

—"সেখানে খালি গোলামি শেখান হয়। কি হবে প'ড়ে সেখানে ?"

—বৌদি আমার কথায় আশ্চর্য হইয়া বলিল "বল কি ঠাকুরপো প'ড়ে কি হবে! পড়াশুনা না ক'রলে ভাল চাকরি হবে কি ক'রে।"

—"চাকরিই ত গোলামি—ও আমি আর ক'রব না। গান্ধীজি বলেছেন—ঐ সব গোলামখানা ভেঙ্গে দিতে হবে।"

বৌদি আমার কথার মর্ম বুঝিতে পারিল না। রাধ অদূরে দাঁড়াইয়াছিল—বলিল—"গান্ধী বেরিয়েছে বটে কলকাতায় তুমুল কাণ্ড ক'রছে—কত লোক দেখতে যাচ্ছে।"

বৌদি বলিল—"কোন সাধু মহাজন হবে না কি ঠাকুরপো ?"

বৌদির অপেক্ষা গান্ধী সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু জানা নাই। রাধা বলিল—"সাধূ হ'তে যাবে কেন ? এমনি মাথায় খোট্টাদের মত পাগড়ি তবে মস্ত বড় লোক বলে মনে হ'ল। আমি ঘোষেদের বাড়ীর ছাদ হ'তে দেখেছি—দেখলে বড়লোক বলে মনে হয় না। তবে তার কথায় বড় বড় ব্যলিষ্টাররা চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে।"

বৌদি উত্তর করিল—"কি জানি ভাই তার নাম শুনবো কোথা থেকে, তিনমাস কলকাতা ছাড়া। রাধা বলিয়া চলিল—বৌদি তাকে দেখবার জন্য ছাদে জানালায়, রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। কত মেয়ে মানুষ যারা কখনও ঘর ছেড়ে বেরুত না তারাও গান্ধীর শিষ্য হয়েছে।"

বৌদি আশ্চর্য হইয়া বলিল—"কিছু রোগ টোগ সারাতে পারে জানিস্?"

রাধা বলিল—দূর—রোগ সারাতে জানবে কি ক'রে। এ ত তেমন সাধু নয়। এ স্বদেশী হ'য়েছে, আর সবাইকে স্বদেশী হ'তে বলছে। তার কথায় কত লোক যে স্বদেশী হ'য়েছে তার ঠিক নাই।"

বৌদি আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"স্বদেশী হ'লে কি কি করতে হয় ঠাকুরপো—?"

স্বদেশী হইলে কি করিতে হয় তাহা আমার জানা নাই। এমন কি স্বদেশী কি বস্তু তাহাও জানি না। কলেজ ছাড়িয়াছি কোন কিছু না ভাবিয়া না বুঝিয়া। কলেজ ছাড়িবাত্র কেন জানি না—রাজসাহীতে যে শুনিয়াছে সেই উপদেশ দিয়াছে কলেজ ছাড়া ঠিক হয় নাই। কিন্তু কেহই বলিতে পারে নাই যে কলেজ ছাড়িয়া অন্যায় করিয়াছি। বরং আমরা যাহারা কলেজ ছাড়িয়াছিলাম তাহাদের সকলে বেশ শ্রদ্ধা করিত। যাহারা কখনও বসিতে বলিত না, তাহারাও আপ্যায়িত করিয়া ডাকিয়া লইয়া যাইয়া চা জলখাবার খাওয়াইয়াছে। গান্ধীজির আহ্বানে কলেজ ছাড়িয়াছি। উদ্দেশ্য না জানিয়া সৎ উদ্দেশ্য মনে করিয়াই কলেজ ছাড়িয়াছি। ইহার পর আবার কিছু করিবার আছে বা ভাবিবার আছে তাহা ভাবি নাই। বৌদির প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলাম না। কলেজে পড়িতাম, পড়াশুনায় সুনামও ছিল কিন্তু স্বদেশী বলিয়া কোন পদার্থ আছে এমন কথা কোন কেতাবে লেখা আছে কি না তাহা দেখি নাই। বৌদির কথায় কি জবাব দিব ভাবিতেছি, রাধা জবাব করিল স্বদেশী কী জান না বুঝি বৌদি?—"স্বদেশী হচ্ছে বিলিতি কাপড় পোড়ান"।

বৌদি বলিল—"সে কি রকম?"

রাধা বলিল—"সে কি ধুম! যে যেখানে পাচ্ছে বিলিতি কাপড় পোড়াচ্ছে। আমাদের গলিতেই কত কাপড় পোড়ান হল সেদিন। আমাদের বাড়ী হ'তে কত কাপড় দিলে পোড়াতে। যারা সব লুকিয়ে রেখেছে এরপর যেদিন স্বদেশীরা আসবে সেদিন আর বাকী রাখবে না, সব টেনে পুড়িয়ে দেবে।"

—"কি অনাছিষ্টীর স্বদেশী বাবা—গরীবের কাপড় পোড়ান কেন?" বৌদি উত্তর করিল।

রাধা হাসিয়া বলিল—"গরীব বড়লোক নাই, যার পাচ্ছে তার পোড়াচ্ছে। আর কাপড় কি কেউ জোর ক'রে নিচ্ছে একটা পোড়ালেই

সেই আগুনে গাদা গাদা কাপড় সব নিজে এনে ফেলে দিচ্ছে। এই যে পাশের বাড়ীর বাবুরা এরা সেদিন তিন তোড়ঙ্গ কাপড় পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের গলিতে।”

রাধার কথা অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলাম। রাধা বলিয়া চলিতেছে—“সেই যে বৌদি সেই হাতি পেড়ে কাপড়টা আমার, সেটা আমি পুড়িয়ে দিয়েছি। সেদিন লছিয়া কাপড় পোড়াতে কিছুতেই দেবে না, ভীখন রেগে কি মারই দিলে লছিয়াকে বৌদি, তারপর টেনে সব কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। আর লছিয়ার কাপড়ের শোকে কি কান্না, সবাই বোঝাতে লাগল তা কাপড় পোড়ালে যদি লোকের উপকার হয় তবে কাপড়ের মায়া ক'রে লাভ কি? তা কিছুতেই যখন বুঝলো না তখন ভিখণ এমন মার দিলে—”

লোকের উপকারের জন্য রাধা তাহার হাতিপেড়ে সাড়ীখানি আগুনে ফেলিয়া দিয়াছে। কত দুঃখে কত কষ্টে সেই বস্ত্রখানি জোগাড় হইয়াছিল তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হইল না। অথচ রাধা হাসিমুখে সেই বস্ত্রখানিকে অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া কোন দুঃখ বোধ করিতেছে না। যাহার আহ্বানে এই অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশে মাথা নত করিলাম। কলেজ ছাড়ার ত্যাগ রাধার ত্যাগের কাছে ম্লান হইয়া গেল।

বৌদি বলিল—“কাপড় পুড়িয়ে লোকের কি উপকার হবে ঠাকুর পো?”

রাধা বলিল—“উপকার হবে না? অনেক উপকার হবে। এই যে আমরা পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি না—পাব কোথা হতে? সব পয়সা যে বিলেতে লুটে নিয়ে যাচ্ছে। এই গ্যাখ না বিলিতি জিনিষ সব ঘুচিয়ে দিয়েছি।”—এই বলিয়া রাধা তাহার হাত দেখাইল। রাধার হাত দেখিয়া বৌদি বলিল—“হাতে কি?

রাধা হাসিয়া বলিল—"দেখছ না চুড়ি নাই।"

"কি হ'ল শুনি?"—

"সব সেদিন ভেঙ্গে দিয়েছে। ভিখনের বৌয়ের এক হাত চুড়ি ঠেঙ্গিয়ে ভিখন ভেঙ্গে দিয়েছে।

রাধার হাতে কোন চুড়ি নাই। আমি বা বৌদি ভাবিয়াছিলাম পয়সা অভাবে চুড়ি পরে নাই। কিন্তু তাহার একমাত্র অলঙ্কার দশের কল্যাণার্থ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে তাহা ভাবি নাই দেশের জন্য বস্তির মধ্যে একটি দরিদ্রতম বালিকা যে ত্যাগ করিয়াছে তাহা কেহ জানে না। লোকচক্ষুর অন্তরালে কত লোক যে তাহাদের প্রিয়তম বস্তুকে দেশের এবং দশের কল্যাণে ত্যাগ করিয়াছে কে তাহা খবর রাখে?

সেদিনের সেই মধ্যাহ্নে অশিক্ষিতা দরিদ্র বালিকার কাছে স্বদেশী মন্ত্রের প্রথম পাঠ লইয়াছিলাম। মণিকার মোহ হইতে দূরে থাকিবার জন্য কলেজ ছাড়িয়াছিলাম। তাহাতে বেদনা বা দুঃখ যতই থাকুক মহত্ব বা ত্যাগ কিছুই ছিল না। রাধার ত্যাগের কাছে কলেজ ছাড়ার ত্যাগ আমার নিকট অত্যন্ত অকিঞ্চন এবং তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল তাছাড়া আমি কিছু না বুঝিয়া না ভাবিয়া কলেজ ছাড়িয়াছি। আর রাধা তাহার একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র এবং অলঙ্কার বেশ বুঝিয়া সুঝিয়া দেশের কল্যনার্থ ত্যাগ করিয়াছে। দুঃখ যাহাদের আছে দুঃখ মোচনের ডাক তাহাদের অন্তঃকরণে যেমন সাড়া দেয় তেমন আর কাহারও দেয় না। ভবিষ্যত জীবনে বহু অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। স্বদেশী কি বস্তু এত লেখা পড়া শিখিয়াও জানি না। রাধারাণী যেটুকু জানে আমি সেটুকুও জানি না। তাই আনাড়ির মত বলিলাম—"বৌদি আমি স্বদেশী করব বলে পড়া ছেড়ে দিয়েছি।"

বৌদির কথাটা বেশ মনঃপূত হইল না বলিল—"তুই কি জানিস

রাধা ?—গান্ধী নিশ্চয় একজন বড় গোছের সাধু হবে। এরপর একদিন বলবে সব গেরুয়া কাপড় পরতে হবে—তখন ?"

সাধু সন্তকে বৌদির খুবই ভয়। কিন্তু রাধা দৃঢ়তার সহিত জবাব করিল—"তাই যদি বলে তবে দশের ভালর জন্যেই বলবে। তুমি ওঁকে স্বদেশী করতে বারণ ক'র না।"

বৌদি পরিহাস করিয়া বলিল—"তবে যা না দুজনে গেরুয়া প'রে স্বদেশী করতে। বেশ মানাবে এখন—।"

রাধা লজ্জা পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। বৌদির পরিহাসে আমার লজ্জা এবং রাগ দুইই হইল তাই বলিলাম—"ছিঃ বৌদি কি যা তা বলছ ;"

বৌদি কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া বলিল—"আমার ঐ রকমই কথার ছিরি—মেয়েটার সবই গুণ—কিন্তু বড্ড গায়ে পড়া। দুদিনের পরিচয় নাই—কে কোথাকার কে তার সঙ্গে অত ঢলাঢলি কেনরে বাপু—তাই চেতন করবার জন্য বললুম।"

ফস্ করিয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল—"অপরকে চৈতন্য দান করিবার আগে নিজের চৈতন্য ঠিক করা দরকার। আমার সঙ্গেও তোমার পরিচয় সবে দুদিনের বেশী নয়।"

বৌদি আহত কণ্ঠে জবাব দিল—"ঠিক বলেছ ঠাকুরপো বড্ড বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে। ভবিষ্যতে এমন আর যাতে না হয় তাই চেষ্টা ক'রব।"—এই বলিয়া বৌদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বৌদি সারা দুপুরটা রাধাদের ঘরে কাটাইয়া দিল। সামান্য কথা বলিতে বলিতে কথার মোড় ঘুরিয়া যাইয়া এমন একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিবে তাহা ভাবি নাই। বৌদির পরিহাসে এমন কিছু ছিল না যে আমি তাহাকে কটুক্তি করিতে পারি। কিন্তু ঘটিয়াছে তাই। সেইজন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হইতে লাগিল। ঠিক করিলাম ক্ষমা চাহিয়া এরপর এখান হইতে বিদায় লইব। সত্য কথা বলিতে কি বৌদি না থাকিলে আমি এই নোংরা বস্তিতে একটি দিনও কাটাইতে পারিতাম না। সকল সময়েই ইচ্ছা হইত ছুটিয়া পলাইয়া যাই। পালাইতে ইচ্ছা থাকিলেও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম বৌদিকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া সহজ নহে। তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। শুধু মুগ্ধ হই নাই তাহাকে দেখিয়া মণিকাকে ভুলিতে পারিয়াছিলাম। শুধু মণিকা নয় এই দুইদিনে সব কিছু ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল আমার যেন অতীত নাই আমার যেন ভবিষ্যৎ নাই। ঠিক কেন যে আমার মনের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। বৌদির ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল কিন্তু শুধু কি তাহার মনোরম ব্যবহার আমাকে সেদিন বস্তি বাসের দুঃখ হইতে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল এ বলিলে ঠিক হয় না। বৌদির অপরূপ রূপলাবণ্যই সেদিন আমার সমগ্র সত্বাকে যেন কুহকাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম মণিকাকে ছাড়িয়া আসা যত সহজ বৌদিকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া তত সহজ নহে। মণিকাকে ভালবাসিয়াছি, শুধু ভালবাসি নাই, মনে হইয়াছিল মণিকা ছাড়া আর কোন নারী সে যত সুন্দরী বা যত গুণবতীই হোক আমার মনে স্থান হইবে না বা হইতে পারে না। মণিকাকে শুধু ভালবাসিয়া ক্ষান্ত হই নাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম মণিকা ছাড়া জীবনে আর কোন নারীকে আমার হৃদয়ে স্থান দিব না। জীবনে সব কিছু যদি বিস্মৃতির

অতল তলে ডুবিয়া যায় তবে মণিকাকে কোনদিন ভুলিতে পারিব না। কিন্তু বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র দুইটা দিন যাইতে না যাইতে বৌদি এমন করিয়া মণিকাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল যে আর আমি মণিকাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। যে হৃদয়ে মণিকার স্থান ছিল দেখি তাহার প্রায় সব জায়গাটা জুড়িয়া বৌদি বসিয়া আছে। তবে কি আমি মণিকাকে ভুলিয়া বৌদিকে ভালবাসিয়াছিলাম ? না ঠিক তাহা নহে। বৌদিকে আমি ভালবাসিতে চাই নাই, শপথ করিয়া বলিতে পারি বৌদিকে আমি মণিকার মত করিয়াও দেখি নাই। এমন কি মণিকাকে ভালবাসিয়া যে ভুল করিয়াছি সেই ভুল আর ভবিষ্যতে কখনও হইবে না এ অহংকার আমার হইয়াছিল কারণ আমার ধারণা ছিল ভালবাসা একটা স্বর্গীয় জিনিষ অর্থাৎ অমৃত স্বরূপ যে একবার সে অমৃৎ পান করিয়াছে সে কি আবার গরল ভক্ষণ করিতে পারে ? মণিকাক ভালবাসিয়া ভাবিয়াছিলাম এই প্রেম স্বর্গীয় এখানে কোন কলুষতা প্রবেশ করিতে পারে না মণিকাকে জীবনে আর না পাই মণিকা আমার জীবন জুড়িয়া যতদিন বাঁচিব ততদিন থাকিবে।

আদর্শ প্রেমের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিরা উপন্যাস পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া জানিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি একজনকে হৃদয় দান করিয়া বাকী জীবন তাহার স্মৃতিকে লইয়া আদর্শ প্রেমিক কাটাইয়াছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আজ জোর করিয়া বলিতে পারি তাহা কতবড় ভুল কত বড় মিথ্যা। এ কথা যদি বলা হয় তোমার জীবন আদর্শ জীবন নয় তাই তুমি এই কথা বলিতেছ। আদর্শ জীবন আমার এ কথা আমি দাবী করি না কিন্তু এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা সত্যের অভিজ্ঞতা, এখানে কোন মিথ্যাচার নাই। তাই আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি ভালবাসা এমন একটা বস্তু সে কখনও স্থান কাল বা পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে

পারে না। যদি কেহ বলে পারে তবে বলিব সেটা ভালবাসা নহে আর কিছু। আমার এই উক্তি শুনিয়া কত বন্ধু আমাকে উপহাস করিয়াছে কতলোক বলিয়াছে আমি একজন ভণ্ড প্রতারক, এমনি কত কি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি এইসব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। শুধু তাই নহে আমার মতবাদ হইতে আজ পর্য্যন্ত বিচ্যুত হই নাই।

বৌদির মনে আঘাত করিয়া যে খুব অন্যায় করিয়াছি তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। কিন্তু কি অজুহাতে আবার কথা বলা যায় তাহারও পথ খুঁজিয়া পাইলাম না। চুপ করিয়া ছোট চৌকীতে বসিয়া আছি এমন সময় ভিখন আসিয়া বলিল "বাবুজী এই লিফাফাটায় একটা পাত্তা লিখে দিন ত?" এই বলিয়া আমায় একটী সাদা খাম বাড়াইয়া দিল। আমি ভিখনের কথা মত খামে ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। ভিখন অনুরোধ করিল—"বাবু পাত্তা তে এ ভি লিখে দেন যে রামেশ্বর তিবারি ছোড়কে আর কিসিকে নাহি দেয়।" আমি বলিলাম—"রামেশ্বর তেওয়ারী ছাড়া আর কাউকে দিতে যাবে কেন?"

এ সরকার বিলাইতি সরকার আছে বড় হারামী আছে এ কারও ভাল ক'রছে না। ওকে বিশ্বাস করা যায় না।" ভিখন উত্তর করিল।

ভিখনের মুখের দিকে চাহিলাম—এর কণ্ঠেও রাধার সুর। কিন্তু বস্তি শুদ্ধ এতগুলি লোক এমন করিয়া বিলাতি সরকারের উপর চটিল কেমন করিয়া? বলিলাম—"না ভিখন চিঠি রামেশ্বর তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিবে এর জন্য তোমার ভাবতে হবে না।"

ভিখন ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব দিল—"হ্যাঁ হামি ভাবতে যাচ্ছি হামি বিলাতি সরকারকে আর একঠো ভি পয়সা দেব না ঠিক ক'রেছি, হামি লিফাফায় টিকিট সাঁটছি না।"

—"সেকি ভিখন তাহ'লে চিঠিটা বিয়ারীং হ'য়ে যাবে সেখানে রামেশ্বর

তেওয়ারীকে ডবল দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এতে সরকারের ডবল লাভ হবে?"

ভিখন জবাব করিল—"তা হোক রামেশ্বর ত লিফাফা হাতে পেয়ে তবে পয়সা দিবে—কি মালুম আছে যে লিফাফাটা পিওন ছিঁড়ে বিগ্‌ না দেবে। ও বাবু একহাতে পয়সা দিব আর হাতে কামটি বুঝে নেব। এ সরকার বড় সয়তান আছে বাবুজী একে একটু পরসান করা দরকার আছে।"

ভিখনের সরকারকে জব্দ করিবার অভিনব ফন্দী দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কেনই বা সরকারের বিরুদ্ধে ভিখনের মন এতখানি বিরূপ হইয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভিখন বলিয়া যাইতে লাগিল—"এ সরকার যে এত খারাবী আছে বাবু তা কি আমি জানছি—গান্ধী মহারাজ ব'লেছে বাবু এ সরকার ভারি বেইমান আছে। তামাম লেড়কা লোক আংরেজী শিখিয়ে বড় বড় নকরি দিচ্ছে আর হামাদের মত গরীব লোকের হাড্ডি পিষছে।" গরীব লোকের কিরূপ হাড় পিষিতেছে এই সব ইংরেজী শিক্ষিত চাকুরিয়ার দল তাহা জানি না তবে ভিখনের দৌলতে তাহা পরের দিনই উপলব্ধি করিলাম।

খুব ভোরে বৌদি আমাকে ঠেলিয়া আস্তে আস্তে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতেছে—"ঠাকুরপো ও ঠাকুরপো ওঠ। খুব মুস্কিল হ'য়েছে বাড়ীর চারীদিকে পুলিশে ঘেরে ফেলেছে! তোমার দাদা গঙ্গাস্নান ক'রতে যাচ্ছিল তাকে ধ'রে আটকে রেখেছে একি বিপদ ঠাকুরপো, কি হবে?"

পুলিশের নামে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে কেন কিছুই জানি না, কানাইদাকেই বা তাহারা আটক করিয়াছে কেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। ইতিপূর্ব্বে কখনও পুলিশের অভিজ্ঞতা নাই। পুলিশের নামে রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেলাম। পুলিশ আসিয়াছে আমাকে কি করিতে হইবে

বুঝিতে পারিলাম না। যে বৌদিকে আশ্রয় করিয়া এই বস্তিতে আশ্রয় লইয়াছি দেখিলাম সে কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "ঠাকুরপো তোমার দাদা সাধু মানুষ কখনও কাহারও কুটাতে হাত দেয় নাই তাকে চোর বলে ধ'রেছে—কি হবে ঠাকুরপো ?" পাশের ঘর হইতে রাধা বলিল—"উঁ চোর বলে ধ'রলেই হ'ল—তুমি কেঁদ না বৌদি—ও ভিখনকে ধ'রতে এসেছে ! দাদাকে ধ'রতে আসবে কেন ? ভিখনটা চোর, ওকে গেল মাসেও পুলিশে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল এমনি ক'রে বাড়ী ঘেরাও ক'রে।" রাধার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হইলাম। বস্তি বাসির দুঃখ দেখিয়াছি কিন্তু এইরূপ বিপদ হইতে পারে ভাবি নাই। বৌদি পূর্ব্ববৎ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে—"ও ঠাকুরপো কি হবে গো—এমন বিপদ ত কখনও দেখিনি গো।"

মিনিট দশ পরে পুলিশ গৃহে ঢুকিল। এবং আসিয়াই ভিখন সর্দারের খোঁজ লইল। বাড়ীওয়ালা ভিখনের ঘর দেখাইয়া দিল কিন্তু হায় পাখী শিকল কাটিয়াছে। ভিখন সর্দার সস্ত্রীক রাত্রের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছে। ভিঘনের ঘর তালাবদ্ধ। পুলিশ ভিখনের ঘরের তালা ভাঙ্গিল। ঘরের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিয়া চোরাই মাল কিছুই পাইল না। অবশেষে পুলিশ একে একে প্রত্যেকটী ঘর খানাতল্লাস করিতে লাগিল এবং যাহাকে খুশী গ্রেপ্তার করিতে লাগিল। শুধু গ্রেপ্তার করিয়া খান্ত হইল না প্রত্যেকটী ঘরের জিনিষপত্র তছ্-নছ্ করিয়া দিতে লাগিল এবং যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইল তাহাদের এরূপ গালাগালি করিতে লাগিল যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মানুষের এত বড় অপমান ইতিপূর্বে আমি আর দেখি নাই। পুলিশকে সকলে ভয় করে জানি কিন্তু কেন করে জানিতাম না, সেদিন পুলিশের রূদ্রমূর্ত্তী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম পুলিশকে যে লোকে ভয় করে তাহা এমনি করে না, ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এরপর পুলিশ আমাদের ঘরে ঢুকিল। ঘরের প্রত্যেকটী জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। চাল ডাল বা অন্যান্য জিনিষ সমস্ত মেঝেতে ছড়াইয়া দিল। তাহাদের এইরূপ ব্যবহারে বৌদি কাঁদিয়া উঠিতেই একজন কনেষ্টবল এমন অশ্লীল ভাষায় গাল দিল যে নেহাৎ কানে না শুনিলে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের ঘর খানা তল্লাস করিয়া পুলিশ দুইটী জিনিষ লইল তাহা হইতেছে আমার ঘড়ি এবং ফাউণ্টেন পেন। একজন কনেষ্টবল অফিসারকে বলিল—"দো ঠো সমন হিঁয়াসে মিলা।" অফিসার পুঙ্গব বামাল দুইটী দেখিবার জন্য আগাইয়া আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল "কার পকেট মেরে এনেছ?" আমি ভীত কণ্ঠে জবাব দিলাম—"ও আমার জিনিষ।" অফিসারটী মুখ ভেংচাইয়া বলিল—"ওঃ নবাব তেজচন্দ্র, তাই ঘড়ি আর ফাউণ্টেন পেন পরা হয়—এই রাম অবতার ইসকো পাকড়ো"—রাম অবতার বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরিল—বৌদি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"দারোগা মশায়—ও খুব ভাল ছেলে—ও চোর ডাকাত নয়—ও বড়লোকের ছেলে দারোগা মশায়—ওর কোন অভাব নাই—ও নিজের পয়সায় ঘড়ি কলম কিনেছে।" রামঅবতার বৌদিকে আর একবার অশ্রাব্য গালিগালাজ করিল। রাধা পাশের ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া আসিয়া সরোষে পুলিশ সাবইনিস-পেকটারকে লক্ষ করিয়া বলিল—"আপনাদের কি ঘরে মা বোন নাই যে মেয়েমানুষকে অমন ক'রে গালাগালি দিচ্ছে আর তাই শুনছেন? মাণিকবাবুকে কেন ধ'রেছেন ওকি চোর—ও আপনার মত দারোগা হবে"—রাধার তেজস্বীতায় পুলিশ অফিসার কথঞ্চিৎ দমিয়া গিয়া বলিল—"এই রামঅবতার জনানি লোককো গালি মাত বকো।" রামঅবতার গালি বন্ধ করিলেও আমরা তাহার রোষ হইতে রেহাই পাইলাম না। আমাদের থানায় ধরিয়া লইয়া গিয়া নানা এজাহার লইয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ঘড়িটি ও ফাউণ্টেন পেনটি ফেরৎ পাইলাম না।

ঘড়ি ও পেন ফেরৎ চাওয়ায় পুলিশ অফিসার বলিলে—"হাজতে ঢোকাই নাই এই ভাগ্য আবার বাবুকে ঘড়ি কলম ফেরৎ দাও, কার পকেট মেরে এনেছ তার ঠিক নাই—যাও মানে মানে ঘরে ফিরে যাও!" ঘড়িটি আমার পিতৃদেবের ছিল সেই ঘড়িটী এমন ভাবে খোয়া যাওয়ায় সেদিন যে কিরূপ আঘাত পাইয়াছিলাম তাহা ভগবান জানেন। আর মণিকার দেওয়া ফাউন্টেন পেনটীর এমন পরিণতি হওয়ায় অত্যন্ত বেদনা বোধ করিলাম। তবে নেহাৎ পৈতৃক পুণ্যে আমি যে রেহাই পাইয়াছিলাম ইহাই ভাগ্য মনে করিয়া সেদিন সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলাম।

সকাল হইতে বেলা দুইটা পর্যন্ত অভুক্ত থাকিয়া এবং নানা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। কানাইদা পথে বলিলেন—"মাণিক সবই প্রাক্তন—পূর্ব জন্মের ফল।" কানাইদা পুলিশকে বা সরকারকে অভিযোগ করিল না, করিল প্রাক্তন কর্মফলকে। ইহজন্মে আমি বা কানাইদা যে চুরি করি নাই ইহা সত্য তবে চোরের সাজা কেন পাইলাম তাহা যদি বিচার করিতে হয় তবে প্রাক্তন ছাড়া আর কি সান্ত্বনা আছে? অন্য যাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহারা অবশ্য প্রাক্তন বা ইহকাল কাহাকেও অভিযোগ করে নাই—তাহারা বলিয়াছিল—এ সরকার বড় বেইমান।

বাড়ী ফিরিলাম দেখিলাম বৌদি কাঁদিতেছে এবং রাধা তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া বৌদি উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল।

পুলিশের ব্যবহার দেখিবার সৌভাগ্য ভবিষ্যৎ জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। মানুষ মানুষের উপর কিরূপ পশুজনচিত ব্যবহার করে তাহার নিদর্শন বহুবার পাইয়াছি কিন্তু সেদিন বস্তিবাসীদের উপর বিনা কারণে যেরূপ দুর্ব্যবহার দেখিয়াছি তাহা আজও মনে পড়িলে পুলিশের নামে ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয়। সেদিন চোর ধরিতে আসিয়া

নির্দোষী বস্তিবাসীদের শুধু লাঞ্ছনা করিয়াই খান্ত হয় নাই তাহাদের মূল্যবান জিনিষপত্র ও টাকা কড়ি হস্তগত করিয়া লইয়া যাইতে তাহারা লজ্জা বোধ করে নাই। সেদিন সে রাত্রি আমাদের বিনা আহারে এবং নিদ্রায় কাটিয়া গেল। চোরের সাজা পাইয়া মনে হইতে লাগিল কেমন করিয়া মুখ দেখাইব। যদিও আমি দোষ করি নাই তবুও মনে হইতে লাগিল পুলিশের খাতায় যখন আমার নাম উঠিয়াছে তখন আর রেহাই নাই। কানাইদা সেদিন দিবারাত্র দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল—খুব সম্ভব ভবিষ্যৎ আপৎ হইতে রেহাই পাইবার আশায়।

পরের দিন ভোরে কানাইদা যথারীতি গঙ্গাস্নান করিতে গেল—বৌদি সাবধান করিয়া বলিল—"এত ভোরে গঙ্গাস্নান কেন? মুখপোড়ারা যদি আবার আজ এসে থাকে।" কানাইদা বলিল—"পুনরায় যদি তারা আসে তবে লীলাময়ের ইচ্ছাতেই আসবে তাই ব'লে আমি আমার ইষ্ট, গুরু বিসর্জন দিতে পারি না"—এই বলিয়া কানাইদা ইষ্ট নাম করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

বৌদি বলিল—"ঠাকুরপো তোমার দাদার কীর্তী দেখলে—কাল যখন পুলিশে ধরলো তখন ইষ্ট কোথায় ছিল। রক্ষা ক'রতে পারলে না ইষ্টদেব?"

উত্তর করিলাম—"বৌদি হয়ত ইষ্টদেব রক্ষাই ক'রেছে নয়ত চোর ব'লে চালান দিতে পারত ত?"

বৌদি অসহিষ্ণু ভাবে জবাব করিল—"খুব হ'য়েছে—রক্ষে ক'রেছে—মানুষগুলোর সারাদিন হাড়ির হাল ক'রে ছেড়ে দিলে আর বলা হ'চ্ছে—ইষ্টদেবের ইচ্ছায় রক্ষা পেয়েছে—"

বৌদির যুক্তি উড়াইয়া দেওয়া যায় না তাই চুপ করিয়া রহিলাম—

বৌদি বলিল—"ঠাকুরপো—তুমি কেন আমাদের জন্য কষ্ট পাও—

তুমি মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যাও। আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে আর দুঃখ পেতে যাবে কেন বলত!"

আমি উত্তর করিলাম—"বৌদি বাড়ী যেতে ইচ্ছে হলেও আমাকে থাকতে হবে। তোমাদের আমি এই দুঃখের মধ্যে ফেলে স্বার্থপরের মত পালাতে পারব না।"

বৌদি সজল চক্ষে উত্তর করিল—"কেন আমাদের মত হতভাগীদের জন্য দুঃখ সইতে যাবে বলত? তুমি এখানে না এলে ত তোমাকে আজ এ সাজা পেতে হ'ত না।"

বৌদির কথা সত্য, ভাগ্যচক্রে এখানে আসিয়াই ত এই বিপদে পড়িতে হইয়াছে। তবু বলিলাম—"তা তোমরা সহ্য ক'রতে পারবে আর আমি পারব না।" পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বলিলাম—"বৌদি যদি যেতেই হয় তবে তোমাদের ফেলে যাব কেন এক সঙ্গেই যাব।"

রাধারাণী পাশের ঘর হইতে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল—"মাণিকবাবু শুধু বৌদিকে নিয়েই যাবেন না বস্তির সকল লোককেই নিয়ে যাবেন?"

বৌদি উত্তর করিল—"কি যা তা বলছিস রাধা—তোর কথার কোন আঁট নাই।"

রাধা পাশের ঘর হইতে জবাব দিল—"আমি কিছু অন্যায় বলিনি বৌদি—শুধু, তোমার দুঃখ দেখলেই ত হবে না দুঃখ আমরাও ত কম পাই নাই। দুঃখ হ'তে রেহাই পাবার জন্য যদি যেতে হয় তবে বস্তি শুদ্ধ লোক নিয়ে যেতে হবে, আর শুধু তোমার দুঃখে যদি ওঁর মন ভিজে থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা।"

রাধা ঠিক বলিয়াছে বস্তিবাসীর দুঃখ আমাকে বাজে নাই। কেবল বৌদির দুঃখই আমাকে বাজিয়াছে। মনের অগোচরে আমার যে দুর্বলতা তাহা রাধার চোখে ধরা পড়িয়াছে। রাধা আমার চেয়ে বয়সে ছোট

হইলেও কিন্তু অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি যে কথা দেরীতে বুঝি রাধা নিমেষে তাহা বুঝিয়া লয়।

রাধাকে বলিলাম—"রাধা আমার ক্ষমতা কতটুকু যে সকলের দুঃখ মোচন ক'রব?"

রাধা আবার খানিক হাসিয়া বলিল—"সে আমি জানি মাণিক বাবু সকলের কেন কারও দুঃখ মোচন ক'রতে পারবেন না। এমন কি বৌদিরও নয়। দুঃখ যাদের ভাগ্যলিপি তাদের দুঃখ বিধাতা ছাড়া আর কে ঘোচাবে বলুন? আপনার সাধ্যি কি যে আমাদের দুঃখ ঘোচান। তার চেয়ে আপনি বরং এখান হ'তে চলে যান্ অন্ততঃ আপনি দুঃখু হ'তে রেহাই পাবেন।"

রাধার কথায় অবাক হইয়া গেলাম উত্তর দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না।

বৌদি বলিল—"ঠিক ব'লেছিস রাধা আমাদের দুঃখ বিধাতা মোচন ক'রতে পারবে না ত মানুষ কোন ছার। তার চেয়ে ঠাকুরপো তুমি বরং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।" রাধা ও বৌদির কথায় ক্ষুব্ধ হইলাম—বলিলাম "বৌদি—তোমরা যদি দুঃখ সইতে পার আমিও পারব। প্রতিজ্ঞা করছি দুঃখের ভয়ে আমি তোমাদের ছেড়ে যাব না, তা যত দুঃখই আমাকে সইতে হোক। শুধু তোমাদের দুঃখের ভাগ নেব এমন কথা নয় আজ হ'তে যেখানে যত দুঃখী আছে তাদের যাতে আপনার লোক হ'তে পারি সেই আশীর্বাদ কর বৌদি।"

কানাইদার বাড়ীতে থাকিতে হইলে কিছু রোজগার করিতে হইবে, তাই চাকুরীর সন্ধানে অফিসে অফিসে ঘোরা নিত্যকর্মের মধ্যে দাঁড়াইল। যাঁহাদের লোকের দরকার তাহারা আমি বি এ পাশ নহি বলিয়া মুখ বাঁকাইয়া ফিরাইয়া দিল। কেহবা বলিল আমাদের অতদূর লেখা পড়া জানা লোকের দরকার নাই। বি এ পড়া পর্যন্ত লোকের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত। অল্প বিদ্যার লোক যেখানে প্রয়োজন সেখানে ইহাদের স্থান নাই এবং বেশী বিদ্যার যেখানে প্রয়োজন সেখানেও ইহাদের স্থান নাই, তাই আমার চাকুরী মেলা একপ্রকার দুষ্কর হইয়া উঠিল। আমি যখন চাকুরী সম্বন্ধে একপ্রকার হতাশ হইয়া উঠিলাম তখন কানাই দা বলিল তাহাদের প্রেসে একটী প্রুফরীডার লইবে অতএব সেইখানে সে অনায়াসে চাকুরী করিয়া দিতে পারিবে। কানাইদার প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেলাম। কানাইদা যে প্রেসে কাজ করে সেটী একটী ছোট্ট প্রেস মাত্র ৩।৪ জন লোক সেই প্রেসে কাজ করে সেইজন্য একজন প্রুফরীডারের তাহার প্রয়োজন নাই, তাই প্রেসের সত্বাধীকারী প্রস্তাব করিল সকালে তাহার মেয়েদিগকে পড়াইতে হইবে এবং বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্যন্ত প্রুফ দেখার কাজ করিতে হইবে। ইহার বিনিময়ে একবেলার খোরাক এবং ২০৲ টাকা বেতন মিলিবে। কানাইদা ইহাতে রাজী হইতে বলিল। চাকুরী ইহার পূর্বে করি নাই অতএব এই চাকুরী ভাল কি মন্দ বিচার না করিয়া আমিও সম্মত হইলাম। বৌদি চাকুরী প্রাপ্তি শুনিয়া খুসী হইয়া কালীঘাটে মানত শোধ করিতে গেল।

কালীঘাটে মানত শোধ করিতে যাওয়ায় বৌদিকে বলিলাম—"বৌদি তুমি ত ঠাকুর দেবতা মাননা তোমার আবার একি কাণ্ড বলত?" বৌদি এ কথার জবাব দিতে পারে নাই। রাধা জবাব দিয়াছিল—"মাণিক বাবু

আপনি যাতে এখানে থাকেন বৌদির তাই ইচ্ছে কিন্তু কি করে থাকবেন তার কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে অবশেষে মা কালীর কাছে প্রার্থনা করছে—যাতে আপনার থাকা হয়। কি করবে ওর ধারণা হল সবাই যখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে, তখন কি এমনি ক'রে তাই আপনার জন্য একবার বৌদি মানসিক ক'রে দেখল। এখন সত্যিই ত মা কালী বৌদির কথা সকানে শুনেছেন।" বৌদি চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া গিয়াছে দেখিলাম—বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল—"সত্যি ঠাকুরপো ঠাকুর দেবতায় আমার বিশ্বাস নাই। আমার বাবা দিবারাত্র ঠাকুর ঠাকুর করে আমাদের পথে বসিয়ে গেছেন, তোমাব দাদার অবস্থা ত চোখে দেখতে পাচ্ছ কিন্তু কেন জানি না ঠাকুরপো তোমাকে ধ'রে রাখবার কোন পথ খুঁজে না পেয়ে সেই ঠাকুরের কাছেই আমাকে ভিক্ষে চাইতে হয়েছিল।"

অতিবড় অবিশ্বাসীকেও দুর্বল মূহুর্তে ঠাকুর দেবতা মানিতে দেখিয়াছি। আমাকে রাখা এবং রাখিয়া সংসারে চালান একপ্রকার অসম্ভব ছিল তাই অবশেষে বৌদি কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া ঠাকুরের স্মরণাপন্ন হইল। চাকুরী পাইয়া আমিও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। কারণ দুই একশো যা পুঁজির টাকা আছে তাহা ফুরাইয়া যাইতে কয়দিন বিশেষতঃ এইরূপ অভাবের সংসারে।

চাকুরীতে যোগদান করিলাম। কানাইদার প্রেসের নাম "শিবদুর্গা" প্রেস। শিবদুর্গা প্রেসের সত্বাধিকারীর নাম শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ। নাগ মহাশয় সাদাসিধা মানুষ হইলেও ব্যবসা বুদ্ধি মন্দ নয়। সকল কার্যে লাভ লোকসান খতাইয়া চলেন।

পরের দিন সকালে রাখাল বাবুর বাটীতে গেলাম। রাখালবাবু আমাকে দেখিয়া উচ্চৈস্বরে ডাক দিলেন 'ও শিবু ও দুর্গা ও তারা ও মহামায়া।' একসঙ্গে এতগুলি দেব দেবীর ডাক শুনিয়া কৌতুহল বোধ হইল। রাখাল

বাবুর ডাকে কন্যা চতুষ্টয় আসিয়া উপস্থিত হইল। সব চেয়ে বড় শিবানি তাহার বয়স বার তের হইবে তারপর দেড় বছর ফাঁক ধরিয়া বাকি কন্যাদের বয়স হিসাব করিয়া লওয়া চলে। রাখালবাবু হাসিয়া বলিলেন— "মণীবাবু আমার ছয় কন্যা। পুত্র সন্তান নাই। তাই এরাই আমার ছেলে। এদিকে ছেলের মত করেই মানুষ করব ঠিক ক'রেছি। স্কুলে অবশ্য পাঠাই না কারণ শিবুর মা পছন্দ করেন না। বলেন 'মেয়েদিকে আমি ঘরের বার হতে দেব না' উনি একটু অবরোধ প্রথা পছন্দ করেন কিনা?"— এই বলিয়া ডাক দিলেন "ওগো ও শিবানির মা শুনছ—এদিকে দেখ কেমন মাষ্টার এনেছি এবারে—আর তোমার অপছন্দ হবে না—কানাই বাবুর ভাই—কানাইবাবু বলেছেন ঠিক তাঁরই মত সাধু ব্যক্তি। কাজে ফঁকি দেবার লোক নয়।" রাখালবাবুর স্ত্রী জানালার মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইলেন। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা থাকিলেও মানুষ যেমন করিয়া দুর্বীণ সহযোগ লক্ষ্য করে তেমনি করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখা হইলে জানালার শব্দ করিয়া রাখাল বাবুকে মতামত জানাইবার জন্য ডাকিলেন। রাখালবাবু ত্রস্তে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাখালবাবু ফিরিবার পূর্বেই আমি তাহার কন্যা চতুষ্টয়কে লইয়া পড়াইতে বসিলাম। একটু পরেই রাখালবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন —"কিছু মনে করবেন না স্যার আমাদের উনি—মানে একটু খুঁতে লোক কিনা—তাই আপনার মত ছেলে মানুষ মাষ্টারকে—মানে এই মেয়েদের পড়াতে হবে কিনা? তাই উনি একটু বলছিলেন মানে বয়সটা বড় কাঁচা— তাই উনি একটু অপছন্দ করছেন আপনাকে।"

আমি বলিলাম—"তা বেশ ত এতে আর আপনার লজ্জা পাবার কি আছে খুলেই বলুন না না হয় অন্য মাষ্টার রাখবেন। আমি তখন কেবল প্রুফ্ দেখব।"

—"না না আপনি পড়াবেন—সে আমি ওঁকে এক সময় বুঝিয়ে দেব।

আবার আলাদা মাষ্টার রাখলে খরচ লাগবে বেশী। এমনি এখন বাজার মন্দা যাচ্ছে প্রেসের আয় কমে গেছে—"

—"তা আমাকে যদি ওঁর পছন্দ না হয়?"

—"না মশায় না সে ভার আমার, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তবে নিশ্চয়ই পছন্দ হবে আপনাকে।"

—"কি ক'রতে হবে বলুন?"

—"মানে আপনার চুল কাটাটা বড় খারাপ বললেন উনি—মানে উনি ছেলে মেয়েদের অত মানে—"

—"তা আমি ত ঐ রকম চুলই এতদিন কেটে আসছি।"

—"দেখুন মশায় আমার অনুরোধে আপনার চুলগুলো একটু ছোট ক'রে কেটে নিন। মানে চরিত্র ভাল রাখতে গেলে একটু ছোট ছোট চুলই ভাল। দেখেন নাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ছবি—কেউ মানে তেড়ি টেড়ি কেটেছে—? আপনার কানাইদার চুলও ত দেখেছেন?"

—"তা চুল না হয় কেটে দেওয়া যাবে—কিন্তু বয়সটাকে ত বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না ঐ যে বলছিলেন বয়সটা বড় কাঁচা।"

—"না বয়স আর বাড়াব কি ক'রে সে জন্য ভাবতে হবে না। এক সঙ্গে সব সুবিধা হয় না। সে আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।"

—"তা আগে চুল কেটে তবে কি আমি কাজে আসব—"

—"না না সে দু একদিন পরে হলেও চলবে। ও শিবু ও কালি মাষ্টার মশায়ের কাছে ভাল করে পড়বি মা হাড় ফুটো পয়সা লাগবে মা। মাষ্টার মশায় একটু মন দিয়ে পড়াবেন—ওরা বড় ফাঁকিবাজ যদি নজর না দিয়েছেন অমনি অন্য দিকে মন দেবে।"

কিরূপ পড়াইতে হইবে কতক্ষণ পড়াইতে হইবে এই সব রাখালবাবু বুঝাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

মাথা মুড়াইয়া চাকরী গ্রহণ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কানাইদার

অভাবের জন্য স্বীকার করিলাম। দর্প করিয়া রাধা ও বৌদির নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাদের দুঃখ দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া যাইব না। কিন্তু দুঃখ ভার লাঘব করিতে যে প্রথমেই মাথা মুড়াইতে হইবে এমন কথা জানিতাম না। সকাল হইতে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যাহাতে একটু সময়ও ফাঁকি না দিতে পারি নাগ এবং নাগিনী উভয়েই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। অন্তঃপুরে নাগিনী বাহিরে নাগ। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাদের বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। একদিন কি কারণে জানি না আমি পড়াইবার সময় হাসিয়াছিলাম অমনি অন্তঃপূর হইতে রাখাল বাবুর পঞ্চমাকন্যা আসিয়া জানাইল—"মা হাসতে বারণ করেছেন—বলেছেন ওসব রঙ্গরস মেয়েদের কাছে চলবে না।" রস যাহা ছিল নাগ-নাগিনীর কৃপায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা শুখাইয়া গিয়াছিল—রঙ্গ ত দূরের কথা।

একদিন রাখাল বাবুর কোন প্রয়োজনে আমাকে বাহিরে যাইতে হইবে তাই মহামায়াকে বলিলাম "দেখ ত মায়া ভাত হল কিনা?" মহামায়া বাড়ী হইতে খবর জানিয়া আসিয়া বলিল "এখনও চাকরদের ভাত চড়ে নাই মা বললে।" চাকরদের ভাত না হওয়ায় সেদিন অভুক্তই রাখাল বাবুর কাজে বাহির হইলাম। চাকুরী অল্প দিনের কিন্তু এই কয়দিনে চাকুরীতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তাহা চিরকাল মনে থাকিবে। কিন্তু কি করিব চাকুরী ছাড়া ত আর কোন পথ নাই তাই বাধ্য হইয়া এই চাকুরীকেই পরমবস্তু বলিয়া সেদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার অসুবিধার কথা কাহাকেও সেদিন জানাই নাই। কয়েকটা দিন এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। বস্তি বাঁসের জীবন অনেকটা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া বৌদির স্নেহ যত্নে চাকুরী ছাড়া অন্য কিছু অসুবিধা পাইতে হয় নাই। কেবলমাত্র একটি পৃথক ঘরের প্রয়োজন আমি বড় বেশী করিয়া অনুভব করিতেছিলাম। বৌদিকে বলিলাম—"বৌদি ভিখন ত

ফিরল না, ফেরার হয়েছে, আর ফিরবে বলে মনে হয় না। দেখনা ঐ ঘরটা পাওয়া যায় কি না ?"

বৌদি বলিল—"আমাদিকে কি আর ঘর দিতে চাইবে এই ঘরেরই নিয়মিত ভাড়া দিতে পারি না তার উপর আবার আর একটা ঘর।"

—"আমার জন্য নাও না, আমার ত চাকরি হ'য়েছে।"

—"আচ্ছা বলে দেখব'খন।"

—"এখুনি বলে দেখ না।"

বৌদি যেন একটু রাগিয়া জবাব দিল—"এখন দু'একমাস মাইনে পাও তারপর দেখলেই হবে।"

—"কিন্তু এমন ক'রে কি থাকা যায় ? তোমাদের কি রকম কষ্ট হচ্ছে বল ত ?"

—"কি আবার কষ্ট ঠাকুর পো—তোমার কষ্ট হচ্ছে তাই বল।"

"—না আমার কষ্ট হ'লে কিছু এসে যেত না।"

বৌদি মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। একটু পরে জবাব করিল—"তা তোমার মনে হতে পারে আমাদের কষ্ট হচ্ছে—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার দাদা ব্রহ্মচারী মানুষ তার কোন কষ্ট নাই—আর আমার কথা বলছ যখন তোমার দাদার গলায় ঝুলেছি তখন বাকী জীবনটা এমনি করে কাটাতে হবে। আমিত আর পার্ব্বতী নই যে শিবের ধ্যান ভাঙ্গাতে পারব ?"

বৌদি কি বলিতে চায় বুঝিতে দেরী হইল না। তবু বলিলাম—"তোমার কথার মানে বুঝতে পারলাম না বৌদি।"

বৌদি ক্ষুব্ধ অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল—"তা যদি বুঝবে তোমরা তবে আর আমাদের এত দুঃখ ঠাকুরপো। গৃহী হব গৃহধর্ম্ম পালন ক'রব না এ কোন শাস্ত্রে আছে ঠাকুরপো ?"

কথার মোড় ঘুরাইবার জন্য বলিলাম—"শাস্ত্র টাস্ত্র আমি অত

জানি না—আর জানতে চাইও না সেটা হ'ল দাদার বিষয়বস্তু। আমি বৌদিকে গুরু পাকড়েছি তার শাস্ত্রই আমার সব।"

বৌদি হাসিয়া ববিল—"আমার শাস্ত্র মত যদি চল তবে তোমায় জাহান্নামে যেতে হবে।"

কথার সুর ভাল ঠেকিল না, বৌদি কি বলিতে চায়? কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তবু উত্তর ত একটা দিতে হইবে তাই বলিলাম—"আমার প্রেসের চাকরীটি যদি জাহান্নামে যায় অনেক ভাল হয় বৌদি"—আমার কথায় জবাব না দিয়া বৌদি ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। আমিও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সকাল হইতে শরীরটা বেশ ভাল যাইতেছিল না প্রেস হইতে ফিরিয়া বলিলাম—"বৌদি আজ আর আমি কিছু খাব না। বিছানাটা পেতে দাও আমি শোব।"

বৌদি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিল—"কি হ'ল ঠাকুরপো—জ্বর টর হয়নি ত?" এই বলিয়া আমার কপালে হাত দিয়া পরীক্ষা করিল।—"জ্বর সামান্য এসে থাকবে তবে মাথাটা ধরেছে বড়।"—আমি বলিলাম।

বৌদি শয্যা পাতিয়া দিল। আমি শুইয়া পড়িলাম বৌদি পাখা লইয়া একহস্তে বাতাস করিতে লাগিল অপর হস্তে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়ায় কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল—বলিলাম "কিছু করতে হবে না, আমার তত কষ্ট হয় নাই।"

বৌদি বলিল—"কেন দিলুম বা—অসুখ ক'রলে বুঝি সেবা নিতেও বাধে।—এ যে দেখচি ঠিক দাদার ভাই।" ঠিক দাদার ভাই আমি নই—তাই আর আপত্তি করিলাম না। চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। বৌদির সেবা সেদিন আমার মনে এক অপরূপ মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৌদিকে বলিলাম—"বৌদি আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তবে আমাকে আর জাগিও না।" অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কানাইদা

কখন আসিয়াছে কখন খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই। সেদিন ঘুমে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভোর হইয়াছে। কানাইদা যথারীতি গঙ্গাস্নানে গিয়াছে। নিশাবসান হইতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম—মা যেন বলিতেছেন "হ্যাঁরে মাণিক তোকে পড়তে পাঠালুম আর তুই কিনা পড়া ছেড়ে দিলি এ কাজ কি ভাল হ'ল তোর।" স্বপ্নের ঘোরে মাকে উত্তর দিতে গেলাম দেখিলাম মা যেন মিলাইয়া গিয়াছে দাঁড়াইয়া আছে মণিকা। মণিকা আমাকে তীব্র ভৎ'সনা করিয়া বলিতেছে—ছিঃ মাণিকদা তুমি—তুমি আমাকে ভুলে যেয়ে শেষে একটা কুহকিনীর পাল্লায় পড়লে ?

কাতর কণ্ঠে বলিলাম—মণিকা তা কি হয় আমি কি তোমাকে ভুলতে পারি ? মণিকা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া বলিল—তুমিও মিথ্যা কথা বলবে আমার কাছে—মিথ্যা কথা বলবার কি সাজা জান ?

কি সাজা মণিকা ?

মণিকা যেন ছায়ায় মিলাইয়া গেল কিন্তু একি এ যে ভীষণ অজগর সর্প। আমি ভয় পাইয়া গেলাম। মণিকা—মণিকা তুমি কোথায় আমাকে রক্ষা কর। দেখি মণিকা বহু দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে—তাহার হাসি যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন ছিটাইয়া দিতেছে—কি তার দাহ—চিৎকার করিয়া উঠিলাম বলিলাম মণিকা মিথ্যা কথা বলি নি, মণিকা তোমাকে ভুলিনি তোমাকে ভুলিতে পারি না—মণিকা আমার নিকটে আগাইয়া আসিল—সেই ভীষণ অজগর কোঁথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি যেন প্রাণ ফিরাইয়া পাইলাম, বলিলাম—মণিকা তুমি কাছে এস তুমি না থাকলে ঐ ভীষণ অজগর আমাকে গ্রাস করে ফেলবে। মণিকা কাছে আসিল আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া আমাকে বলিল—বল আমাকে মনে রাখবে ?—

হ্যাঁ মণিকা যতদিন বাঁচব ততদিন তোমাকে মনে রাখব—কখনও ভুলব না তা যেখানেই থাকি।

মণিকার মন খুশীতে ভরিয়া গেল—আমার কপালে সর্বাঙ্গে হস্ত বুলাইয়া বলিল—তা আমি জানি তুমি আমাকে ভুলতে পার না। মণিকা আমার কণ্ঠ তাহার বাহুদ্বারা দৃঢ় করিয়া ধরিল আমি যেন তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইতে না পারি। আমি মণিকার বক্ষে আত্মসমর্পণ করিলাম। একখানি সুন্দর মুখ আমার ওষ্ঠের উপর নামিয়া আসিল অপূর্ব পুলকে আমার দেহ মন ভরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম—ছিঃ মনিকা ছেড়ে দাও লোকে দেখলে কি বলবে বলত।

"বলুক গে—যা খুসী"।

আমি বলিলাম—তা কি হয়—তা হ'তে পারে না তুমি আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও ঐ দেখ সেই অজগরটা আবার আসছে, আমাকে পালিয়ে যেতে দাও—মণিকা আরও দৃঢ়ভাবে কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আসুক অজগর আমি তোমাকে ছাড়ব না। ঘামে সর্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া গেল—আমি আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলাম—আমাকে ছেড়ে দাও মণিকা আমাকে বাঁচতে দাও মণিকা। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল চাহিয়া দেখিলাম বৌদি আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া আমার ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

২৭

আমি বিচারক নহি তাই বৌদির সেদিনের ব্যবহার আমি ন্যায় নীতির তুলাদণ্ডে ফেলিয়া সে ন্যায় করিয়াছিল কি অন্যায় করিয়াছিল অত চুলচেরা বিচার করিয়া দেখি নাই। পথিক যেমন পথ চলিতে চলিতে পথের পার্শ্ববর্তী দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে যায় আমিও ঠিক সেই দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া সকল ঘটনাকে দেখিয়া আসিয়াছি। পথিপার্শ্বস্থ দৃশ্য সে যত মনোরম হউক না কেন কোন মুগ্ধ পথিক

তাই বলিয়া যেমন সেখানে বাসা বাঁধে না তেমনি সেদিনের ঘটনায় আমি যেন দর্শক মাত্র আমাকে মুগ্ধ করিলেও বাঁধিতে পারে নাই। মানুষ যখন অন্যায় করে তখন সে যুক্তি তর্কের দ্বারা অন্যায়ের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করে, এমন কি সে অপরকে সেই অন্যায়ের জন্য দায়ী করে। সেদিন বৌদি অন্যায় করিয়াছিল কি না এইরূপ অভিযোগ তাহার উপর করি নাই বরং নিজের অন্তর্যামী দেবতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম কেন এমন ঘটিল। অন্তর্যামি সেদিনও আমার প্রশ্নের যে জবাব দিয়াছিল আজও ঠিক সেই জবাবই পাইয়া থাকি। বৌদির কার্যের বিচার করিতে যাইয়া দেখি মনের অগোচরে ঠিক যেন ঐ জিনিষটাই আমার একান্ত কাম্য ছিল। তাই বৌদির মধ্যে কোন অন্যায় আজও আমি দেখিতে পাই না কারণ আমি যাহা চাহিয়াছিলাম বৌদি তাহার রূপ দিয়াছিল বইত নয়? সেই জন্যই বৌদিকে অভিযোগ না করিয়া করিয়াছিলাম আমার মনকে "তুমি যে পরোপকার করিতে এখানে থাকিয়া গেলে তাহা কি নিছক এমনিই থাকিয়া গেলে। তোমার মনে কি এতটুকুও কামনা কোথাও ছিল না?" অন্তর্যামির নিকটত কোন কিছু অগোচর নাই তাই সেদিন উত্তর পাইয়াছিলাম—লোকের দুঃখে তোমার অন্তর যত না গলিয়া থাকুক একখানা সুন্দর মুখ না থাকিলে তুমি এই বস্তিতে কোনদিন বাস করিতে না বা করিতে পারিতে না। তবে কি অন্যায় আমার? না তাও নয় সেদিন বৌদির সৌন্দর্য আমাকে শুধু আকৃষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই হাত ধরিয়া মানুষের দুঃখের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। মানুষের দুঃখের ভাগ লইতে শিখাইয়াছিল। আজ পর্যন্ত মানুষের সেবা করিয়া জীবনে কতই না বাহবা পাইয়া আসিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই কিন্তু যাহার দৌলতে এই বাহবা পাইয়াছি কই সে ত কোনদিন দাবী করে নাই যে ইহাতে তাহারও কিছু পাওনা থাকিতে পারে। আজ জীবন সায়াহ্নে যখন বিগতদিনের ঘটনাবলী

বিচার করিতে বসিয়াছি তখন কি শুধু বৌদির অপরাধটাকেই বড় করিয়া দেখিব না আর কিছু তাহার মধ্যে আছে তাহাও দেখিব? বাহবা কি শুধু আমাদের প্রাপ্য আর বৌদিরাই কেবল অপরাধের বোঝা বহিয়া বেড়াইবে? তাই সেদিনের ঘটনাকে যে যেভাবেই বিচার করুক আমি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি না বরং সেদিনের ঘটনাই আমার জীবনের পরমবস্তু হইয়া থাকিবে।

বৌদির বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। বৌদিরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি মুখ হাত ধুইয়া জামা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছি এমন সময় বৌদি বলিল—"ঠাকুরপো কিছু না খেয়েই বেরিয়ে প'ড়ছ?" আমি জবাব দিলাম না। বৌদি দরজার সামনে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তুমি সত্যিই কিছু খাবে না ঠাকুরপো. এমনিই কাজে চলে যাবে?"

উত্তর করিলাম—"কাজে আর আমি যাব না।" লক্ষ্য করিলাম বৌদির মুখে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। অপরাধীর কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কোথায় যাচ্ছ?"

—"জানি না।"

—"কখন ফিরবে?"

—"তাও জানি না।"

কাজে যাইব না—কোথায় যাইব তাহাও জানিনা বলা সত্বেও বৌদি যেন আর কোন প্রশ্ন খুঁজিয়া পাইল না তাই চুপ করিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি করিয়াই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি বলিলাম—"পথ ছাড় বৌদি আমাকে বাইরে যেতে হবে।"

বৌদি হাত জোড় করিয়া অনুরোধ করিল "তুমি ফিরবে এই কথা দাও তবে আমি দোর ছাড়ব।" বৌদির মুখের দিকে চাহিলাম একজোড়া কাল চোখে ভাদ্রমাসের বান ডাকিয়াছে। কি জবাব দিব খুঁজিয়া পাইলাম

না, তাহাকে একটা জবাব দিবার জন্যই বলিলাম—"বৌদি তুমিই বলত আর কি আমার এখানে থাকা চলে ?" কালবৈশাখীর ঝড়ের পর যেমন গাছের অবস্থা হয় দেখিলাম বৌদির অবস্থাও যেন ঠিক তেমনি হইয়াছে। মুহূর্তের মধ্যে কে যেন তাহার সমস্ত শ্রী হরণ করিয়া লইয়াছে। বৌদি অনুতপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল—"আমি ভুল করেছি ঠাকুরপো—ধ'রে রাখবার অন্য কোন পথ না পেয়ে আমি ঐ পথই বেছে নিয়েছি। এ অপরাধ আমারই ঠাকুরপো—তোমাকে সব কিছু জেনে শুনেই আমি এমন ক'রেছি। তুমি এর অপরাধ নিও না, এমন করে শাস্তি দিয়ে তুমি চলে যেও না।" এ কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না চুপ করিয়া রহিলাম।

বৌদি কাতর কণ্ঠে বলিল—"বল ঠাকুরপো অপরাধ নেবে না—আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না ? আমি শপথ করে বলছি তোমার কোন অসুবিধাই আর এখানে হবে না। আমাকে বিশ্বাস কর ঠাকুরপো, আমাকে বিশ্বাস কর।"

—"আচ্ছা তুমি পথ ছাড় এখন, এখুনি আমি চলে যাচ্ছি না, থাকা না থাকা পরে ভেবে ঠিক করলেই হবে! আমার এখন কাজ আছে আমায় পথ ছেড়ে দাও।"

বৌদি পথ ছাড়িয়া দিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"ভুল ত সবাই করে ঠাকুরপো আমিও করেছি কিন্তু ভুল শোধরাবার সময় না দিয়ে যদি চলে যাও ঠাকুরপো তবে আমি কেমন করে বাঁচি বলত ? শাস্তিই যদি দিতে হয় এইখানে থেকেই দাও চলে যেয়ে আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে দেবে না তা আমি হতে দেব না।"

বৌদির দাবী শুনিয়া হাসি পাইল—বলিলাম—"ভুল যে তুমি কি করেছ তা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয়েছে আর আমার এখানে থাকা ঠিক নয়। তবে আমি এখুনি চলে যাচ্ছি না—যখন যাব

তখন তোমাকে রাজী করেই যাব। আমার মনে হয় তখন তুমি আর আমাকে আটকাতে পারবে না। যাক্ এখন আমার কাজ আছে আমি চল্লুম।”

বৌদি যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল—আমি পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। কাজ কিছুই ছিল না। কাজ ত রাখালবাবুর বাড়ীতে ছাত্রী পড়ান তাহার জন্য এত ভোর বাহির হইবার প্রয়োজন নাই। কি করিব কোথায় যাইব কিছুই না ভাবিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। বৌদি যেন সেদিন আমার সমগ্র সত্বাকে তাল্ গোল পাকাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছিল; আমার বোধশক্তি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছিল।

হ্যারিস্তান রোডে আসিয়া পড়িলাম। প্রভাতের সোনালী সূর্য্যের কিরণ বড় বড় বাড়ীগুলার উপর পড়িয়া ঝক্ মক্ করিতেছে। মনে হইতেছে আমি যেন কোন এক মায়াপুরির মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিতেছি। সোনার পাতে মোড়া পথ, সোনার পাতে মোড় বাড়ী। যেন সব কিছু সুবর্ণময় হইয়া গিয়াছে। এ যেন কোন অজানা পথে একা যাত্রা করিয়াছি—আর কেহ নাই কেবল আমি একা সুবর্ণ পথের যাত্রি। চলিয়াছি—কোথায় চলিয়াছি—কেন চলিয়াছি জানি না। কেহ যেন বাধা দিবার নাই—কেবল মাত্র একখানা সুবর্ণময় মুখ আমার দৃষ্টি পথকে বার বার ঝাপসা করিয়া দিতেছে।

“বন্দেমাতরম, গান্ধীজীকী জয়—মুহম্মদ আলি কী জয়—চিত্তরঞ্জন কী জয়।” পশ্চাতে চাহিয়া দেখি একদল যুবক ঐ সকল ধ্বনি করিতে করিতে এবং গান করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছে। সুর স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, মা যে আমার দীন দুখিনী তার বেশী আর সাধ্য নাই।” ক্রমে গায়কবৃন্দ নিকটে আসিয়া পৌছিল—আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইলাম।

সামনে রামলাল সীতারামের বিরাট কাপড়ের দোকান। সবেমাত্র দোকান খুলিয়া ধুনা গঙ্গাজল দিতেছে।

রামলাল সীতারামের দোকানের সম্মুখে একে একে যুবকবৃন্দ ধ্বনি করিতে করিতে জড় হইল। একটী যুবক আগাইয়া যাইয়া দোকানের একজন লোককে বলিল "কি ভাই বিলাতি কাপড় এখনও বিক্রী ক'রতে লজ্জা হচ্ছে না? এতো ছেলে যে জেলে গেল তা'তেও তোমাদের চোখ খু'লল না"— ?

ভিতর হইতে কে জবাব করিল—"আলবাৎ আঁখ খুলেছে বাবুজী— তবে দেশী কাপড় মিলছে কোথায়—আপনারা কি বলতে চান দোকান বন্ধ ক'রে দিয়ে এত লোককে ভূখা মারব?" কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল বলিয়া মনে হইল না—কয়েকজন যুবক 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিতে করিতে দোকানে প্রবেশ করিল—এবং গাদা গাদা কাপড় রাস্তায় আনিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। যুবকদের সহিত অপেক্ষমান জনতা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে শত শত লোক জড় হইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে কে একজন কাপড়ের গাদায় আগুন ধরাইয়া দিল—দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জনতা বিদ্যুৎ গতিতে পাশের দোকান সকল হইতে কাপড় আনিয়া ঐ অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কয়েকজন যুবকের মধ্যেই আর এই কার্য সীমাবদ্ধ রহিল না, যেন সমস্ত নগরী বিলাতি বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ করিবার জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বিমূঢ় চিত্তে এই দৃশ্য দেখিতেছি এমন সময় ঢং ঢং করিয়া দমকল এবং খপা খপ্ খপা খপ্ করিয়া অশ্বারোহী পুলিশ ছুটিয়া আসিল। মুহূর্তের মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া কে কোথায় অদৃশ্য হইল বোঝা গেল না। কেবল দোকানের সামনে তিন চারিটী যুবক এবং অদূরে আমি। চাহিয়া দেখিলাম একজন পুলিশ অফিসার ও কয়েকজন কনেষ্টবল ঐ কয়েকজন

যুবককে গ্রেপ্তার করিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিত্তে আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। জনতার সহিত পলাইয়া গেলাম না বা যুবকদের নিকট ও আগাইয়া গেলাম না। হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে একটা বৃহদাকার মোটর গাড়ীর হর্ণ বাজিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি গাড়ীর মধ্যে সৌম্য শান্ত এক বিরাট পুরুষ বসিয়া আছেন। দেখিলেই শ্রদ্ধায় আপনা হইতেই মাথা নত হইয়া যায়—বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইলাম একটী বালিকা ত্রস্তে নামিয়া আসিয়া আমাকে বলিল— "দাঁড়িয়ে দেখছেন কী লজ্জা করে না দাঁড়িয়ে থাকতে? পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার ক'রছে—যান্ ছুটে যান ওদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করুণ—" আরও যেন কি বলিল তাহা আমার কানে প্রবেশ করিল না। বালিকা বিদ্যুৎ গতিতে আমার হাত ধরিয়া কাপড়ের দোকানে ছুটিয়া চলিল— কণ্ঠে তাহার 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি, চোখে তাহার বিদ্যুৎ বহ্নি-দীপ্তি চরণে তাহার ঝঞ্ঝার গতি। আমি কোন কিছুই না ভাবিয়া কোন কিছুই না বুঝিয়া ঐ অগ্নিময়ী বালিকার অনুসরণ করিলাম—তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া একসঙ্গে বলিলাম "বন্দেমাতরম, গান্ধীজীকি জয়, চিত্তরঞ্জন কী জয়।"

কোথা হইতে কী হইল কিছুই জানি না। কী শক্তিতে আমি ঐ বিরাট পুলিশ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করিয়া রামলাল সীতারামের দোকান হইতে রাশী রাশী বিলাতি বস্ত্র লইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম জানি না। আমার সমস্ত চৈতন্য যেন সেই বিরাট পুরুষ এবং সেই অগ্নিময়ী বালিকা হরণ করিয়া লইয়া আমাকে নবচেতনায় নূতন পথে যাত্রা করিবার জন্য নির্দেশ দিতেছেন—ভাবনা ভয় সব কিছু যেন আমার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। একজন পুলিশ অফিসার বজ্রমুষ্টিতে আমাকে ধরিয়া লইয়া পুলিশ ভ্যানে উঠাইল—দেখিলাম সেই বিরাট পুরুষ ভ্যানের মধ্যে বসিয়া আছেন। আরও রহিয়াছে সেই যুবকদের মধ্যে কয়েকজন। বিরাট পুরুষ

উদ্দপ্ত কণ্ঠে পুলিশ অফিসারকে বলিলেন—"বড্ড ছেলে মানুষ এ, মিষ্টার—একে না ধরলে কি চলছিল না ?" আমি সেই বিরাট পুরুষের পদ প্রান্তে বসিয়া পড়িলাম—পুলিশের গাড়ী চলিতে সুরু করিল—যুবকবৃন্দ বন্দেমাতরম ধ্বনি করিতে লাগিল—দূর হইতে বিদ্যুৎময়ী বালিকার কণ্ঠ হইতে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কানে বাজিতে লাগিল—

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)